এক দুই

বাংলাবুক.অর্গ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এক-দুই

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৭

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

দাম : পঁচিশ টাকা

The Online Library of Bangla Books

এক - নগরনটী

দুই - নীল সমুদ্র

পুস্তকের সর্বস্বত্ব :—শ্রীমতী কেয়া সেনগুপ্ত

The Online Library of Bangla Books

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কিরীটীর তিন কিরীটী
সামনে সমুদ্র নীল
যুগলবন্দী
সন্ধ্যা মালতী
পোড়া মাটি ভাঙা ঘর
সবুজ পাতা লাল ধুলো
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

মৃত্যুবাণ
মানসী তুমি
কুসুমের দিন
তোমাকে নমস্কার
বেলাভূমি
তুয়া অনুরাগে
ত্রি-রহস্য

মারীচ সংহার
এক ডজন রহস্য
তিনকন্যা
কঙ্কাল নাম তার
পলাশের রঙ
রক্তজবা
বকুল গন্ধে বন্যা এলো

পথের বাঁকে বাঁকে (স্মৃতিকথা)

নগরনটী

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

॥ এক ॥

আজকাল আর সুরজিৎ সন্ধ্যার কিছু পরেই ঠিক বাঁধা টাইমে আসছে না। আগে তো নয়ই—বরং আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার কখনো কখনো এক ঘণ্টা পরেও আসে। তবে আসে ঠিকই।

একদিনও আসা তার বাদ যায় না।

আর সেই কারণেই সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মালঞ্চকে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়—এই সময়টা কোথাও সে বেরুতে পারে না।

মালঞ্চ শোবার ঘরে বড় আয়নাটার সামনে একটা ছোট টুলের উপর বসে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুনিটা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল।

দীর্ঘ কেশ মালঞ্চর। এত দীর্ঘ যে কোমর ছাড়িয়ে যায়। এক সময় কেশের দৈর্ঘ্য তার আরো বেশী ছিল— এখন অনেকটা কম। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অন্যমনস্কভাবে সামনের মসৃণ আর্শীর গায়ে প্রতিফলিত তার নিজের চেহারাটার দিকে তাকাচ্ছিল।

নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে ভাল লাগে বেশ মালঞ্চর, বয়স তার যা-ই হোক—দেহের বাঁধুনী আজো তার বেশ আঁট-সাঁটই আছে। গালে ও কপালে অবিশ্যি দু'চারটে বক্র রেখা পড়েছে তা সেগুলো ফেস্ ক্রিমের প্রলেপ পড়লে চট্ করে তেমন ধরা যায় না। মালঞ্চ অবিশ্যি বুঝতে পারে তার বয়স হচ্ছে—আর সেই কারণেই বোধহয় নিজের দেহ-চর্চা সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ থাকে।

কিছুক্ষণ আগে শহরের বুকে সন্ধ্যা নেমেছে তার ধূসর আঁচলখানি বিছিয়ে। জুন মাস শেষ হতে চলল এখনও বৃষ্টির চিহ্নই নেই।

সারাটা দিন ভ্যাপসা গরম। দুপুরে এখানে ওখানে খানিকটা মেঘ জমেছিল, মনে হয়েছিল বুঝি বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামতে পারে, কিন্তু নামল না।

সুরজিতের আজকাল আসার কোন সঠিক নির্দিষ্ট সময় নেই, তাহলেও সে আসবেই একবার, আর সেই কারণেই প্রতি সন্ধ্যায়

মালঞ্চকে সেজে গুজে প্রসাধন করে প্রস্তুত থাকতে হয়।

অনেক সময় মালঞ্চর নিজেকে যেন কেমন ক্লান্ত লাগে।

আজকাল কিছুদিন ধরে মালঞ্চ যেন লক্ষ্য করছে সুরজিতের মধ্যে একটা পরিবর্তন। কেমন যেন একটু গম্ভীর গম্ভীর মনে হচ্ছে— বালীগঞ্জের বনেদী পাড়ায় দোতলার একটা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুলের মধ্যে সাদা হাতীর দাঁতের চিরুনীটা চালাতে চালাতে ভাবছিল মালঞ্চ। এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল মালঞ্চর। তার বুঝতে কষ্ট হয় না। ওটা বেলফুলের গন্ধ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভীরু গলার ডাক ভেসে এলো পশ্চাৎ থেকে—মালা!

মালঞ্চ গলা শুনেই বুঝতে পেরেছে কার গলা। মালঞ্চ ফিরেও তাকাল না। যেমন চিরুনীটা দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল তেমনি আপন মনে আঁচড়াতেই লাগল।

মালা! আবার সেই ভীরু ডাক।

এবারও মালঞ্চ ফিরে তাকাল না। এবং আগের মতই আর্শীর সামনে চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে সাড়া দিল, কি চাই?

যে লোকটি একটু আগে হাতে একটা বেলফুলের মালা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সে এবার কুণ্ঠিত ভাবে বললে, খুব ব্যস্ত, না?

না বল কি বলবে? মালঞ্চ বললে।

তোমার জন্যে একটা বেলফুলের মালা এনেছি, গলায় পরবে!

পিছন ফিরে না তাকিয়েই মালঞ্চ নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, রেখে যাও।

কোন সাড়া এলো না অন্যদিক থেকে।

দরজার ওপরেই দাঁড়িয়ে লোকটি, বয়স ৫৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে। সমস্ত শরীরটাই মানুষটার কেমন বুড়িয়ে গিয়েছে। চুলে পাক ধরেছে ভাঙা গাল, সরু চোয়াল, কোটরাগত দুটি চক্ষু।

পরিধানে একটা ময়লা পায়জামা, গায়ে একটা হাফ হাতা সস্তা দামের শার্ট, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দু'তিনদিন বোধহয় লোকটা ক্ষৌরকর্ম করে নি। লোকটা নিঃশব্দে অল্প দূরে দাঁড়িয়েই আছে।

কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মালঞ্চ বলল, বললাম তো মালাটা ঘরে রেখে যাও।

দাও না গলায় মালাটা—মোড় থেকে দু'টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এলাম।

কে বলেছিল তোমাকে বেলফুলের মালা আনতে—

কেউ বলেনি, আমারও তো ইচ্ছা যায়—

তাই নাকি ! ফিরে তাকাল মালঞ্চ এতক্ষণে।

হ্যাঁ, তাছাড়া সে সব দিনগুলো ভুলতে পারি কই, রোজ অফিস থেকে ফেরার পথে তোমার জন্যে এমন দিনে মালা নিয়ে আসতাম, তুমি খোঁপায় জড়াতে।

দেখ সুশান্ত, বাজে কথা রেখে তোমার আসল কথাটা খুলে বল তো এবার।

আসল কথা আবার কি—সুশান্ত মৃদু গলায় বলল।

তুমি ভাবো সুশান্ত যে, আমি এতই বোকা, কিছু বুঝি না ?

নির্লজ্জর মত হাসতে থাকে সুশান্ত।

বোকার মত হেসো না, তোমার ঐ হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়—ঘেন্না করে—ভনিতা রেখে আসল কথাটা বলে ফেল।

সুশান্ত কোন জবাব দেয় না।

আমি জানি তুমি কেন এসেছে, কেন ঐ মালা এনেছ ?

কেন ?

টাকা চাই, তাই না ?

পরশু চল্লিশ টাকা দিলাম এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ! আমার আজ স্পষ্ট কথা, টাকা তুমি পাবে না।

পাবো না ! কেমন যেন একটা করুণ আর্তি সুশান্তর কণ্ঠে বেজে উঠল। হাসিটা নিভে গেল।

না, তোমার মদের খরচা রোজ রোজ আমি দিতে পারব না। লজ্জা করে না তোমার, এ বাড়িতে নীচের তলায় চাকরের মত পড়ে আছো, আর একজনের দু'মুঠো কৃপার অন্নে ক্ষুন্নবৃত্তি করছ, গলায় দড়ি জোটে না তোমার—

দড়ি জুটলেও সে দড়ি গলায় দেবার সাহস হত না—তা না হলে সুরজিতের রক্ষিতার কাছে আমি হাত পাতি—

ঘেন্না পিত্তি বলে একটা সাধারণ বস্তু, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকে, তাও কি তোমার নেই ?

সব—সবই ছিল মালা, ঐ যে তোমার ঘেন্না, পিত্তি, লজ্জা, সবই ছিল—কিন্তু তুমিই আমার বস্ত্রহরণ করেছ—

আমি !

হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কে ?

থাম ! ঘৃণা মিশ্রিত একটা গর্জন করে ওঠে মালঞ্চ।

একটু আগে গলায় দড়ি দেবার কথা বলছিলে না মালা—অন্য কেউ হলে হয়তো এতদিনে দিত, কিন্তু আমি—

তুমি দিতে পারলে না। তাই না ?

প্রশ্নটা যে নিজেকেও নিজে অনেকবার করিনি তা নয়। জানি সব দোষ আমারই--

সেটা বোঝ ?

হয়তো বুঝি বা বোঝাবার চেষ্টা করি, ভাবি—

আর বুঝবার চেষ্টা করো না। বুঝেছ ?

একটা কথা বলব মালা ?

জানি কি বলবে— আমি শুনতে চাই না।

আচ্ছা—আবার কি আমরা পূর্বের জীবনে ফিরে যেতে পারি না ?

কি বললে ?

জানি তা আর কোনদিনও সম্ভব নয়—আজকের মালঞ্চ আর মালা হতে পারে না। অনেক পথ হেঁটে আমরা দুজনা দুজনার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। আজ তোমায় দেওয়া সুরজিৎবাবুর এই বাড়িটা, এর সব দামী দামী আসবাবপত্র, এই প্রাচুর্য—জানি আমার ঘরে থাকলে এসব কিছুই তোমার হত না, কিন্তু—

বল। থামলে কেন !

সেদিনও বোধহয় আমি তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই যথাসাধ্য রাখবার চেষ্টা করেছি—

কি বললে—স্বাচ্ছন্দ্য ! একটা ভাল কাপড়—একটা গহনা কখনো তুমি দিতে পেরেছ ?

তবু তুমি আমার সবকিছু জেনে শুনেই আমার ঘরে এসে উঠেছিল—

ভুল—ভুল করেছিলাম। নিত্য ভাত ডাল আর চচ্চড়ি—মাসান্তে একটা মিলের শাড়ি--

তুমি তো জানতে আমার মাইনে কি ছিল--কিছুই তো তোমার অজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু তাহলেও বোধহয় তোমার সম্মান ছিল, ইজ্জত ছিল। সেদিন কারো রক্ষিতা হতে হয়নি তোমাকে।

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল, আর কোন কথা বলতে পারে না মালঞ্চ।

তুমি বুঝবে না মালা, মানুষ কত বড় অপদার্থ হলে তার নিজের স্ত্রীকে অন্য এক পুরুষের রক্ষিতা হয়ে থাকতে দেয়—কথাগুলো বলে মালাটা সামনের টেবিলের ওপর রেখে সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যায়—

দাঁড়াও, কত টাকার দরকার তোমার—শ'দুই হলে চলবে?

সুশান্ত থমকে তাকায় স্ত্রীর মুখের দিকে—হাত পেতে চাইলেও যে কখনো চল্লিশ-পঞ্চাশটার বেশী টাকা দেয় না, সে কিনা আজ দুশো টাকা দিতে চায়!

শোন, আমি তোমাকে আরো বেশী টাকা দিতে পারি, তবে একটি শর্তে—

শর্তে?

হ্যাঁ এ বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাবে, আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। লেখাপড়া তো শিখেছ, একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারো না আবার—

একবার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, তাও আজ পাঁচ বছর, তাছাড়া বয়সও হয়েছে, এ বয়সে আর কে চাকরি দেবে।

বল তো আমি সুরজিতকে বলে দেখতে পারি। সে অত বড় অফিসের ম্যানেজার—

জানি মালা, সুরজিতবাবু হয়তো চেষ্টা করলেই তার রক্ষিতার প্রাক্তন স্বামীকে যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু না, থাক মালা, তোমাকে আমার জন্যে কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি চললাম।

টাকা নেবে না—এই যে টাকা চাইছিলে?

না মালা, আচ্ছা চলি। সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বারান্দা পার হয়ে মোজেইক করা সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে নিঃশব্দে নেমে এলো। কোনদিকেই আর তাকাল না, সোজা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে, পথের দু'পাশে আলোগুলো যেন সেই অন্ধকারকে যতটা তরল করা উচিৎ ততটা পারছে না। তবে কি আকাশে মেঘ নামছে? সত্যিই কি মেঘ জমছে, এবার বৃষ্টি নামবে—বাতাসে একটা ঠাণ্ডা ভাব, ভিজে ভিজে ভাব।

নামে—নামুক বৃষ্টি!

হঠাৎ যেন যে ঘেন্না বা লজ্জা এতদিন তার মনের মধ্যে জাগেনি সেটাই যেন তার সারা মনকে এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

সত্যিই তো—সে কি মারা গেছে? একটা মৃত মানুষ সে?

নিজের স্ত্রী আর একজনের রক্ষিতা হয়ে সেখানে আছে নচেৎ সেখানে সে কেন পড়ে আছে? শুধু পড়ে থাকাই নয়—ছ'বেলা আহার করছে আর নেশার টাকা হাত পেতে নিচ্ছে। হ্যাঁ, মালঞ্চ ঠিকই বলেছে—তার গলায় দড়ি দেওয়াই উচিৎ ছিল।

বৃষ্টিটা বোধহয় সত্যি সত্যিই নামবে। নামলে ভিজতে হবে—যে বাড়ি থেকে এই মাত্র সে বের হয়ে এলো সেখানে বোধহয় আর সে ফিরতে পারবে না। একটু মদ হলে বোধহয় সে অনেকটা সুস্থবোধ করতে পারত।

আগে কোন দিন মদ স্পর্শও করেনি সুশান্ত, কিন্তু ঐ মালঞ্চই একদিন তার হাতে মদের গ্লাস তুলে দিয়েছিল।

না। সুশান্ত বলেছিল।

খাও, দেখ তোমার মাথার ভূতটা নেমে যাবে। নিজেকে অনেকটা হালকা মনে করতে পারবে।

তোমার ইচ্ছা আমি খাই?

হ্যাঁ, খাও।

সেই শুরু—তারপর চলেছে—এখন আর না হলে চলে না।

আবার ভাবে সুশান্ত, আর সে হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে ফিরে যাবে না। এই পাঁচ পাঁচটা বছর সে কেমন করে ছিল হিন্দুস্থান রোডের ঐ বাড়িটায়? সত্যিই তার মনে কোন ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই।

সুরজিতের রক্ষিতার বাড়িতে একতলার একটা ঘরে কেমন করে কাটাল সুশান্ত এত দীর্ঘ দিন ও রাত্রিগুলো? মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যা হলে মালঞ্চর কাছ থেকে পঁচিশ তিরিশটা টাকা নিয়ে বের হয়ে পড়ত; তারপর ঢাকুরিয়া ব্রীজের নিচে যে লিকার শপটা খুলেছে সেখান থেকে একটা রামের বোতল কিনে এনে লেকের কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে বসত।

বোতলটা শেষ হলে অনেক রাত্রে টলতে টলতে সুরজিতের রক্ষিতার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত। নীচের তলার জানালাটার সামনে মৃদু কণ্ঠে ডাকত—রতন, এই রতন, দরজাটা খোল বাবা।

দাঁড়াও খুলছি। বলে রতন দরজাটা খুলে দিত। তারপর প্রতি

রাতের মতন বলত, বাবু, মানদা তোমার খাবার তোমার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে। বলেই রতন তার ঘরে চলে যেত। আর সেও তার ঘরে গিয়ে ঢুকত।

বেশীর ভাগ রাত্রেই খেত না সুশান্ত, কেন যেন গলা দিয়ে ভাত, ডাল, মাছ, দুধ, মিষ্টি নামতে চাইত না।

প্রথম প্রথম রতনের কেমন যেন কৌতূহল হত সুশান্ত সম্পর্কে—কে লোকটা? কিন্তু না পারত গিন্নীমাকে শুধাতে না পারত বাড়ির অন্য কাউকে শুধাতে।

বাবু আসেন রোজ বিকেলে, রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবার তার গাড়িতে চেপে চলে যান। ঝকঝকে গাড়িটা ঠিক সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। উর্দি পরা ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে দেয়। সুরজিৎ ঘোষাল গাড়ি থেকে নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান। জুতোর শব্দটা সিঁড়ির মাথায় মিলিয়ে যায়।

আবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ জুতোর শব্দ শোনা যায়। রতন বুঝতে পারে সুরজিৎ ঘোষাল বের হয়ে যাচ্ছেন। ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দেয়। সুরজিৎ ঘোষাল গাড়িতে উঠে বসলে গাড়িটা হুস করে বের হয়ে যায়।

তার প্রশ্নের জবাব একদিন গিন্নীমার ঝি মানদাই দিয়েছিল। রতন প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁ গা মানদা, রোজ রাত্রে বাবু চলে যান কেন বলতে পারো?

ফিক্ করে হেসে ফেলেছিল মানদা। বলেছিল, ওসব লোকেরা তাদের মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটায় নাকি! আসে চলে যায়।

কি বলছ! মেয়েমানুষ! উনি তো বাবুর স্ত্রী, গিন্নীমা—

মৃদু হেসে মানদা বলেছিল, এ পাড়ার সকলে তাই জানে বটে, তবে উনি তো কর্তার বিয়ে করা ইস্ত্রী নন—

রতন কল্পনাও করতে পারেনি—যে গিন্নীমা সুরজিৎ ঘোষালের বিয়ে করা স্ত্রী নয়। তাই সত্যিই অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল মানদার মুখের দিকে।

সত্যি?

তবে কি মিথ্যে!

কি করে জানলে? কে বললেন?

কে আবার বলবে, আমি জানি। উনি বাবুর রক্ষিতা, রক্ষিতাকেই বাবু এ বাড়ি করে দিয়েছেন।

বল কি! ভদ্রপাড়ায় বাবু তার রক্ষিতাকে রেখেছেন! পাড়ার লোকেরা কেউ কিছু বলে না?

এই কলকাতা শহরে পাশের বাড়ির লোকও পাশের বাড়ির খোঁজ রাখে না। আর রাখলেই বা কি, জানলেও কেউ উচ্চবাচ্য করে না। এনারা সব সভ্য ভদ্রলোক যে গো। তাছাড়া কে কার রক্ষিতা জানাটা এত সহজ নাকি! এ কি, সেই সব পাড়ার মেয়েছেলে, একেবারে চিহ্নিত করা—

সত্যি! রতনের যেন কথাটা শুনে বিস্ময়ের অবধি ছিল না প্রথম দিন।

মানদা তখনো বলে চলেছে, এ শহরে কত ভদ্রলোকের মেয়েদেরকেই তো দেখলাম, কত যে অমন দেহ ব্যবসা চালাচ্ছে তা জানবারও উপায় নেই—

মানদার কথাগুলো শুনলেও কিন্তু সেদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি রতন। তবে তা নিয়ে আর বেশী মাথাও ঘামায়নি। ঘামাতেই বা যাবে কেন, চাকরি করতে এসেছে সে, চাকরিই করবে। কর্ত্তা-গিন্নীর হাঁড়ির খবর দিয়ে তার প্রয়োজন কি।

কিন্তু যেদিন রতন জানতে পেরেছিল নীচের তলার ঐ বাবুটিই গিন্নীমার স্বামী, রতন যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল সেদিন। ঐ সংবাদটিও মানদাই পেশ করেছিল তার কাছে।

আচ্ছা মানদা, নীচের তলায় যে বাবুটি থাকেন উনি কে? মধ্যে মধ্যে দেখি গিন্নীমার ঘরে যান—

মুচকি হেসে মানদা বলেছিল, উনিই তো গিন্নীমার স্বামী—

উনিই গিন্নীমার স্বামী!

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, সুরজিৎ ঘোষালই এ বাড়ির আসল মালিক হলেও গিন্নীমার স্বামী হচ্ছে ঐ নিচের তলার বাবুটি। এ পাড়ার সবাই জানে ওটা সুশান্ত মল্লিকের বাড়ি। সুশান্ত মল্লিক ব্যবসা করেন। পাড়ার লোকেরা মধ্যে মধ্যে আসে, গল্পগুজবও করে। সুশান্ত মল্লিক হেসে হেসে তাদের সঙ্গে কথাও বলে। কিন্তু তারা কেউই অনুমান করতে পারে না ভিতরের ব্যাপারটা।

।। দুই ।।

সুশান্ত হাঁটতে হাঁটতে এসে লেকে ঢুকল। এখন আর লেকে অত মানুষজনের ভিড় নেই, জলের ধার ঘেঁসে গাছতলার নীচে অন্ধকার একটা বেঞ্চে বসল সুশান্ত।

বুকের ভেতরটা আজ এত বছর পরে যেন কি এক জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে নিরুপায় আক্রোশে যেন নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে চায় এতবড় লজ্জাটা সে এই সাত বছর ধরে, হ্যাঁ সাত বছরই হবে—বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে আসার আগে যখন তারা হেদুয়ার কাছে একটা গলিতে ছোট দোতলা একটা বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকত, তখন থেকেই তো মালঞ্চর অফিসের ম্যানেজার সুরজিৎ ঘোষাল সেখানে যাতায়াত শুরু করেছিল।

মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালের অফিসে তার পার্সোন্যাল স্টেনো টাইপিস্ট ছিল। সেখান থেকেই দুজনের আলাপ।

বালীগঞ্জের বাড়িতে উঠে আসবার মাস দুই আগেই মালঞ্চ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। না, বাধা দেয়নি সুশান্ত। সুরজিৎ ঘোষাল এলেই সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেত। আর বাধা দিয়েই বা সে কি করত, মালঞ্চ কি শুনত তার কথা।

স্বামী স্ত্রী, সুশান্ত আর মালঞ্চ দুজনেই দুটো অফিসে চাকরি করত, হঠাৎ কেন যেন চাকরিটা ছেড়ে দিল সুশান্ত। মালঞ্চ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি যে তার স্বামী চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

আর বুঝবেই বা কি করে, সুশান্তর সঙ্গে তখন তার সম্পর্কই বা কতটুকু। সুরজিৎ ঘোষালের অনুগ্রহে তখন তার নিত্য নতুন দামী দামী শাড়ি আসছে, দু-একটা অলংকারও সেই সঙ্গে গায়ে শোভা পেতে শুরু করেছে।

সুশান্ত নীরেট বোকা, তাই প্রথমটায় ধরতে পারেনি, ধরতে পেরেছিল অনেক দেরীতে, যখন সুরজিৎ ঘোষাল তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছিল, তার আগে মধ্যে মধ্যে অফিস থেকে তার ফিরতে দেরী হলে মালঞ্চ সুশান্তকে বলেছে অফিসের কাজের চাপ।

নীরেট বোকা সুশান্ত সরল মনেই কথাটা বিশ্বাস করেছে। চোখ থেকে পর্দাটা না সরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের অন্তরঙ্গতা বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝল তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল একদিন।

মালা, আমি অন্ধ নই, বলেছিল সুশান্ত।

অন্ধ হবার তো কোন প্রয়োজন নেই, আর দু'জোড়া চোখ থাকতে অন্ধ হতে যাবেই বা কেন—বলেছিল মালা!

তুমি তাহলে সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা হয়েই থাকতে চাও?

মালঞ্চ বোধহয় বুঝতে পারেনি কথাটা অমন স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে সুশান্ত উচ্চারণ করতে পারে। মুহূর্তের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে থাকে তারপর বলে, সুরজিৎকে আমি ভক্তি করি।

তাই নাকি! তাহলে তোমার আজ প্রয়োজন ডিভোর্সের—কিন্তু শুনে রাখ মালঞ্চ—তা আমি হতে দেবো না।

বাধা দিতে পারবে?

দেবো, আর আমি দেখো আমার এ বাড়িতে যেন সে আর না আসে—।

তোমার বাড়ি! কিন্তু গত সাত মাস ধরে এ বাড়ির ভাড়া কে দিয়েছে জানো—ঐ সুরজিৎ ঘোষালই।

মালা!

হ্যাঁ, আমারও স্পষ্ট কথা শোন, তোমার অসুবিধা হলে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারো!

কথাটা শুনে সুশান্ত যেন কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলে, কি বললে?

বললাম তো, তোমার এখানে না পোষালে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারো।

আর যদি না যাই?

তাহলে বুঝব লজ্জা ঘেন্না বলে কিছুই তোমার নেই—

তোমাকে আমি খুন করব—বেশ্যা—চরিত্রহীন।

অতঃপর মালঞ্চ শান্ত গলায় বলেছিল, Don't shout! আজ পর্যন্ত কি দিয়েছ তুমি আমায়—আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর, ক'টা শাড়ি গয়না দিয়েছ বলতে পারো? একটা অন্ধকার গলির মধ্যে এই একতলার স্যাঁতসেঁতে ঘরে মানুষ কোনদিন সুস্থ থাকতে পারে? এরই নাম জীবন ধারণ! ভুলে যেও না, আমি চাকরি না করলে তোমার ঐ দুশো টাকায় আজকের দিনে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াই জুটত না। শোন, গোলমাল চেঁচামেচি করো না, তোমার প্রাপ্য থেকেও তোমাকে আমি বঞ্চিত করছি না, তবে এত

বড় সুযোগটা যখন হাতে এসেছে ছেড়ে দেব কেন ?

কি হল সুশান্তর, তারপর আর একটি কথাও সে বলতে পারেনি। অফিস যাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেল অতঃপর, কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেটে গেল আরো দু'মাস—

একদিন মালঞ্চ বললে, সুরজিৎ বালীগঞ্জে আমাকে একটা বাড়ি করে দিয়েছে, সামনের মাসে আমরা সেখানে উঠে যাব।

সুশান্তর চাকরিটা তখন আর নেই, সে কেবল স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

মালঞ্চ উঠে এল একদিন বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে। আর আশ্চর্য, সুশান্তও সেই বাড়িতে এসে উঠল। মালঞ্চর সঙ্গে মদ্যপান করে করে সুশান্ত তখন যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

দোতলায় ঘর থাকা সত্ত্বেও নীচের তলারই একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে নিল সে। মালঞ্চ বলেছিল, নীচে কেন ওপরের তলায় ঘর রয়েছে আরও। সুশান্ত মল্লিক কোন জবাব দেয়নি। মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে গেল সুশান্তর, আর সে মদের খরচা মালঞ্চই দিত।

অন্ধকার বেঞ্চের ওপর বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল সে খুন করবে মালঞ্চকে, কিন্তু কেমন করে খুন করবে ? কেন, বিষ দেবে।

বি. এস সিতে কেমিস্ট্রিতে অনার্স ছিল তার, অনেক ইনরগ্যানিক মেটালের নাম জানে সে, যার সামান্য ডোজই মৃত্যু আনে। মালঞ্চর আর বাঁচা চলে না, তাকে মরতেই হবে। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ আজ এক বারবধূর রূপ নিয়েছে। হ্যাঁ, ওর মরাই উচিত। মালঞ্চকে মরতেই হবে, মাথার মধ্যে সুশান্তর আগুন জ্বলতে থাকে।

সে রাত্রে জানতেও পারেনি মালঞ্চ, সুশান্ত বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। জানতে পারল পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ, যখন রতন এসে খবর দিল. মা, নীচের বাবু কাল সন্ধ্যার পর সেই যে বের হয়ে গেছেন আর ফিরে আসেননি—

সেদিন ও এল না, পরের দিন রাত্রেও ফিরে এল না সুশান্ত। মালঞ্চ সত্যিই এবারে যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, মানুষটা গেল কোথায় ? চাকরি বাকরি করে না, হাতে পয়সা নেই, মাথা গোঁজবারও যে কোন ঠাঁই নেই তা সে ভাল করেই জানে, তবে গেল কোথায় মানুষটা ? সত্যি সত্যিই তবে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল নাকি !

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আগেই চিড় ধরেছিল যেদিন থেকে

মালঞ্চ সুরজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—তথাপি সুশান্ত যেমন লজ্জা ও অপমান সহ্য করেও ঐ গৃহেই পড়েছিল তেমনি মালঞ্চরও রীতিমত একটা দুর্বলতা ছিল তার স্বামীর প্রতি। শুধু দুর্বলতা কেন, মালঞ্চর মনের মধ্যে বোধহয় কিছুটা মমতাও ছিল ঐ মানুষটার প্রতি।

মালঞ্চ ভাবে এর আগেও তো সে মানুষটাকে কত রূঢ় কথা বলেছে, কিন্তু কখনও তো বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি সে, বরং পরের দিন সন্ধ্যাতেই আবার এসে তার কাছে হাত পেতেছে। অথচ সে রাত্রে টাকাও নিল না, তার ওপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকে মালঞ্চ শূন্য দৃষ্টি মেলে। হঠাৎ মালাটার দিকে নজর পড়ল মালঞ্চর, যে মালাটা সুশান্ত দু'দিন আগে রেখে গিয়েছে। মালাটা মালঞ্চ স্পর্শও করেনি, মনেও ছিল না তার মালাটার কথা মালঞ্চ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ছোট টেবিলটার দিকে—মালা এখনও পড়ে আছে, কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে।

ঘরের ব্র্যাকেটের ওপর রক্ষিত টেলিফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মালঞ্চ ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো পুরুষ কণ্ঠে, হ্যালো—

কে ?

মালঞ্চ ? আমি দীপ্তেন।

বল।

তুমি, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি ?

না।

তাহলে আমি আসছি, বুঝলে, এখুনি আসছি—

মালঞ্চ কোন সাড়া দিল না। অন্য প্রান্তে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হল—মালঞ্চ ফোনটা নামিয়ে রাখল।

অলস ভাবেই তাকাল দেওয়াল ঘড়িটার দিকে। সবে পৌনে সাতটা। বাইরে সন্ধ্যার ঘোর নেমেছে। সুরজিৎ এখন আসবে না, আজ দু'দিন ধরেই মালঞ্চ লক্ষ্য করছে সুরজিতের আসতে সেই নটা সোয়া নটা বাজছে। সব বুঝেই মালঞ্চ দীপ্তেনকে আসতে মানা করল না।

॥ তিন ॥

আজ এক বছর ধরে দীপ্তেনের সঙ্গে মালঞ্চর আলাপটা জমে উঠেছে। গত বছর মার্চে সে আর সুরজিৎ পুরী গিয়েছিল কয়েক দিনের জন্যে, সেই সময়ই একদিন সী বীচে দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে মালঞ্চর আলাপ হয়।

বছর বত্রিশ তেত্রিশ বয়স হবে দীপ্তেনের, লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। এখনো বিয়ে-থা করেনি, ব্যাচেলার। বিলেত থেকে কি সব ম্যানেজমেণ্ট না কি পড়ে এসেছে। একটা বড় ফার্মে বেশ মোটা মাইনের চাকরি করে।

দীপ্তেন ভৌমিককে দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিল মালঞ্চ, দীপ্তেনও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আলাপ ঘনীভূত হয় কলকাতায় এসে, আজ প্রায় মাস ছয়েক হল। দুপুরে মাঝে মধ্যে তার ওখানে আসতে শুরু করে দীপ্তেন।

একদিন দীপ্তেন হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমার স্বামী যদি টের পেয়ে যান ?

এ সময় তো সে থাকে না।

আরে সেই জন্যেই তো আমি এ সময় আসি, তাহলেও টের পেয়ে গেলে—

সুরজিৎ আমার স্বামী নয় দীপ্তেন—

দীপ্তেন তো কথাটা শুনে একেবারে বোকা। বলেছিল, কি বলছ তুমি !

ঠিকই বলছি—

তবে সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ?

We are friends. Just friends !

তাহলে তোমার স্বামী ? তুমি তো বিবাহিতা ?

তাই, কিন্তু সে থেকেও নেই।

এ বাড়িটা তবে কার ?

সুরজিৎ আমাকে কিনে দিয়েছে। আমার।

দীপ্তেন মৃদু হেসেছিল মাত্র, তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করেছিল, সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে ?

হয়ে গেল।

কত দিন হবে ?

তা অনেক দিন হল। তারপরই মালঞ্চ বলেছিল, ও একটা ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ওর স্ত্রী আছে, দুটি ছেলে আছে। বড় ছেলে যুধাজিতের বয়সই তো প্রায় ছাব্বিশ—কথাগুলো বলে হাসতে থাকে মালঞ্চ।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, দীপ্তেন বলেছিল।

দীপ্তেনের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, সে আকর্ষণকে এড়াতে পারেনি মালঞ্চ। তাছাড়া মালঞ্চ নিশ্চিত ছিল সুরজিৎ ব্যাপারটা কিছুতেই জানতে পারবে না। মানদা বা রতন কিছু বলবে না, কারণ যাতে না বলে সে ব্যবস্থা মালঞ্চ করেছিল। আর নীচের তলায় থাকলেও স্বামী সুশান্ত কিছুই বলবে না। কারণ সুরজিতের সঙ্গে সে কথাই বলে না।

তবু দীপ্তেন একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ঐ বুড়ো ভাল্লুকটাকে তুমি কি করে সহ্য কর মালঞ্চ ?

ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।

ও তো তোমার বাপের বয়সী

তাহলেও সব কিছু আমাকে সে-ই দিয়েছে।

এ সব ছেড়ে দাও, চলে এসো তুমি আমার পাশের ফ্ল্যাটে, ফ্ল্যাটটা খালি আছে।

কেন, তোমার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে এখানে ?

অসুবিধা হচ্ছে বৈকি। আমি তোমাকে একান্ত ভাবে পেতে চাই মালা, একমাত্র আমারই হয়ে থাকবে তুমি।

সেটা কি নিদারুণ একটা বিশ্বাসঘাতকতা হবে না দীপ্তেন ? যে লোকটা এত দিন ধরে আমাকে এত সুখ, প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে রেখেছে, বাড়ি গাড়ি সব কিছু দিয়েছে—

আপাতত বাড়ি গাড়ি না দিতে পারলেও স্বাচ্ছন্দ আর আরাম আমিও তোমাকে দিতে পারব মালঞ্চ। চল তুমি আমার সঙ্গে, অবিশ্যি সুরজিৎবাবুকে বলেই যাবে, না বলে তোমাকে যেতে বলছি না আমি।

সেটা কি ভাল হবে দীপ্তেন ?

কেন ভাল হবে না, জানি না কি পেয়েছ তুমি ঐ বুড়ো ভাল্লুকটার মধ্যে।

দীপ্তেন জানত না এ সংসারে এমন মেয়েমানুষও আছে যাদের

কাছে দৈহিক আরাম, স্বাচ্ছন্দ ও স্বাচ্ছল্যটাই সব কিছু এবং তার জন্যে তারা নিজেদের বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। স্বামীর কাছ থেকে সেটা পাবার কোন আশা ছিল না বলেই মালঞ্চ সুরজিৎকে আঁকড়ে ধরেছিল। দেহ ও রূপ যৌবন তাদের কাছে কিছুই না, উচিত মূল্য পেলে তারা সবকিছু করতে পারে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে দীপ্তেন এলো। রাত তখন পৌনে আটটা।

একটা প্রেজেণ্টেশন এনেছি তোমার জন্যে—দীপ্তেন হাসতে হাসতে বলল।

সত্যি! কি?

Just guess, বল তো কি হতে পারে?

কেমন করে বলব বল।

পকেট থেকে দীপ্তেন একটা মরক্কো লেদারের ছোট বাক্স বের করল। বোতাম টিপতেই বাক্সের ডালাটা খুলে গেল—ভিতরে একটা মুক্তোর নেকলেস।

দেখি, দেখি—how lovely! দাও, পরিয়ে দাও।

দীপ্তেন নেকলেসটা মালঞ্চর শঙ্খের মত গ্রীবায় পরিয়ে দিল।

You are really sweet দীপ্তেন। মালঞ্চ দু'হাতে দীপ্তেনকে জড়িয়ে ধরল।

ঐ সময় সুরজিতের গাড়ির হর্ণ শোনা গেল।

সর্বনাশ! সুরজিতের গাড়ির হর্ণ। মালঞ্চ বলল, দীপ্তেন, শীঘ্রি তুমি বাথরুমের পিছনের দরজা খুলে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও।

আসতে দাও সুরজিৎবাবুকে। তুমি তো পারবে না, আজ আমিই এর চূড়ান্ত ফয়সলা করে নেব—

না না, তুমি যাও। কেন তুমি বুঝতে পারছ না দীপ্তেন, সুরজিৎ তোমাকে এখানে দেখলেই—

দেখুক না। তোমার ওপর তারও যেমন অধিকার আছে, আমারও ঠিক তেমনি অধিকার আছে।

দীপ্তেন, কি করছ। যাও, প্লীজ।

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু একজনকে তোমাকে বেছে নিতে হবে মালঞ্চ—হয় সুরজিৎ ঘোষাল, না হয় দীপ্তেন ভৌমিক—দুজনের

সঙ্গে তুমি খেলা চালিয়ে যাবে তা দীপ্তেন হতে দেবে না, বুঝেছ ? কথাগুলো বলে দীপ্তেন বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় হাতের সিগ্রেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে ঘষে দিয়ে গেল। সিঁড়িতে তখন সুরজিতের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মালঞ্চ সুরজিৎ সম্পর্কে একটু ভুল করেছিল। সে ভেবেছিল তার আর দীপ্তেনের গোপন মিলনের ব্যাপারটা সুরজিৎ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। জানবার একমাত্র উপায় মানদা আর রতন, কিন্তু টাকার লোভে তারা সুরজিতের কাছে কথাটা তুলবে না।

কিন্তু তার ঐখানেই হিসেবে ভুল হয়েছিল। রতন বলেনি কিন্তু মানদা সুরজিতের কানে কথাটা আকারে ইঙ্গিতে তুলে দিয়েছিল, সুরজিতের ইদানীং ভাবান্তরের কারণও তাই। যেটা মালঞ্চ অনুমানও করতে পারেনি।

কিন্তু সুরজিৎ মুখে কিছু প্রকাশ করেনি, তক্কে তক্কে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তবু দীপ্তেনকে ধরতে পারেনি সুরজিৎ, কারণ দীপ্তেন এমনই সময়ে আসত যখন সুরজিতের আসার সম্ভাবনা নেই। দু-একবার তথাপি সে surprise visit দিয়েছে, তবু দীপ্তেনকে ধরতে পারেনি মালঞ্চরই সাবধানতার জন্য।

আজ ঘরে ঢুকেই সুরজিৎ থমকে দাঁড়াল। মালঞ্চ সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মদির কটাক্ষে মুখে মৃদু হাসি টেনে বলল, কি সৌভাগ্য, আজ একেবারে নির্ধারিত সময়ের আগেই ?

আগে এসে পড়ে তোমার অসুবিধা ঘটালাম মালঞ্চ ?

কি যা তা বলছ সুরজিৎ, জানো, আজ মার্কেট থেকে মটন এনে আমি নিজে স্টু রেঁধেছি তোমার জন্যে, সঙ্গে কি খাবে বল—পরটা না লুচি ? কি হল, অমন ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন পোশাক ছাড়বে না ?

বাঃ, তোমার হারটা তো চমৎকার— সুরজিৎ ঘোষাল বলে ওঠে।

আমার গলায় ! সঙ্গে সঙ্গে হারটার কথা মনে পড়ে যায় মালঞ্চর, মুখের হাসি তার উবে যায়।

তা কিনলে বুঝি হারটা— না কোন প্রেমিকের প্রেমোপহার ?

ছিঃ সুরজিৎ, তোমার মন এত ছোট ! হারটা আমি আজই কিনে এনেছি।

কোন্ দোকান থেকে কিনলে ? সাচ্চা মুক্তো বলেই যেন মনে

হচ্ছে—বলতে বলতে হঠাৎ সুরজিতের নজর পড়ে সামনের ত্রিপয়ে এ্যাসট্রের ওপর।

এগিয়ে গেল সুরজিৎ—অর্ধদগ্ধ, দুমড়ানো সিগ্রেটটা এ্যাসট্রে থেকে তুলে নিল। তারপর শান্ত গলায় সুরজিৎ বলল, দীপ্তেন ভৌমিক কখন এসেছিল মালঞ্চ ?

দীপ্তেন ভৌমিক !

আকাশ থেকে পড়ার ভান কোরো না মালঞ্চ, ব্যাপারটা আমার কাছে আর গোপন নেই।

কি গোপন নেই ?

তুমি যে বেশ কিছুকাল ধরেই দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে মাতামাতি করছ—আমি সেটা জানি।

হঠাৎ সোজা ঋজু হয়ে দাঁড়াল মালঞ্চ। বলল, হ্যাঁ, এসেছিল।

কেন, কেন সে এখানে আসে ?

কৈফিয়ৎ চাইছ ?

চাওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়।

কিন্তু ভুলো না সুরজিৎ, আমি তোমার বিয়ে করা স্ত্রী নই।

জানি তুমি আমার রক্ষিতা।

Shut up !

হারামজাদী, তুই আমারই খাবি, আমারই ঘরে থাকবি, আর—

বের হয়ে যাও—মালঞ্চ চিৎকার করে ওঠে, এই মুহূর্তে এ বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও সুরজিৎ—এটা আমার বাড়ি

সুরজিতের মনে পড়ে যায় যে বৎসর খানেক পূর্বে পাকাপোক্ত ভাবে বাড়িটার দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়েছে—মালঞ্চর নামে।

তাই বলে, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোকেও আমি ছেড়ে দেব না হারামজাদী, গলা টিপে তোকে আমি শেষ করে দেব—বলে সুরজিৎ ঘর থেকে হন হন করে বের হয়ে গেল।

রাগে মালঞ্চ তখন ফুঁসছে।

একটু পরেই মানদা এসে ঘরে ঢুকল :—বাবু চলে গেলেন ?

নীচের দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা আমায় এনে দে মানদা।

কিন্তু নীচের বাবু যদি ফিরে আসেন ?

ঠিক আছে, যা। আর হ্যাঁ, শোন ঐ নীচের বাবু এলে আমাকে এসে জানাবি।

॥ চার ॥

ব্যাপারটা পরে জানা যায়—আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবারের সন্ধ্যার ঘটনা।

পরের দিন শনিবার, মানদা সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ চা নিয়ে এসে ঘরের দরজা ঠেলে দেখে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

প্রথমে ডাকাডাকি করে মানদা, পরে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে মালঞ্চর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মানদা ভয় পেয়ে রতনকে ডেকে আনে। দুজনে তখন আরো জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়, ডাকাডাকি করে, তবু কোন সাড়া নেই—

মানদা ভয় পেয়ে গিয়েছে তখন রীতিমত। কাঁপা কাঁপা গলায় রতনকে বলল, ব্যাপার কি বল তো রতন ?

ঠিক ঐ সময় সিঁড়িতে স্যাণ্ডেলের শব্দ পাওয়া গেল।

মানদা বলল, এ সময় কে এলো আবার ?

মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। মাথার চুল রুক্ষ, এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনের প্যান্ট আর শার্টটা আরো ময়লা হয়ে গিয়েছে।

মানদা সুশান্তকে দেখে বলে, বাবু, মা ঘরের দরজা খুলছে না।

খুলবেও না আর কোন দিন—

সে কি বাবু! কি বলছেন আপনি!

আমি জানি, শেষ হয়ে গেছে—আমি চললাম—থানায় খবর দাও—তারাই এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে--বলে যেমন একটু আগে এসেছিল সুশান্ত, তেমনি ভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সুশান্ত কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল না, সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘণ্টা দুই পরে থানার অফিসার নীচের ঘরে ঢুকে দেখতে পেয়েছিলেন, তক্তাপোষের ওপর সুশান্ত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

সুশান্ত কথাগুলো বলে যাবার পর রতন কিছুক্ষণ ঘরের সামনে বারান্দাতে দাঁড়িয়েই থাকে, তারপর মানদার দিকে কেমন যেন বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মানদাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তারও মুখে কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পর রতনের যেন বিহ্বলতাটা কাটে। সে বলে, তুই কোথাও যাসনে মানদা, আমি থানাতে চললাম—

থানায়, কেন রে ?

কি বোকা রে তুই—সত্যিই যদি মারা পড়ে থাকেন তাহলে ঘরের দরজা ভেঙে কি আমরা খুনের দায়ে পড়ব ?

খুন! অস্ফুট কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মানদা।

কে জানে। হতেও তো পারে। কাল এগারোটা পর্যন্ত যে মানুষটা বেঁচে ছিল হঠাৎ সে যদি রাত্রে ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকে! উঁহু বাবা, আমার ভাল ঠেকছে না। নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে—আমি চললাম থানায় খবর দিতে—বলতে বলতে রতন এগুলো।

এই রতন, আমাকেও তাহলে তোর সঙ্গে নিয়ে চল—মানদা চেঁচিয়ে ওঠে।

আমাকে সঙ্গে নে! মানদাকে খিঁচিয়ে উঠল রতন, তুই কচি খুকীটি নাকি!

মাইরি বলছি রতন, আমি এর কিছু জানি না।

জানিস না তো থানার লোক এসে যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তাই বলবি।

আমি কাল রাত এগারোটার সময় যখন নীচে চলে যাই মা তখন চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল। জলজ্যান্ত মানুষটা—

তাহলে তাই বলবি, আমি আসছি—বলে রতন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

স্থানীয় থানার দারোগা সুশীল চক্রবর্তীর বয়স খুব বেশী নয়, বছর চল্লিশেক হবে। রতনের মুখে সংবাদটা পেয়েই জনা দুই সেপাই সঙ্গে নিয়ে তিনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে চলে এলেন।

মানদা তখনও বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ মুখ ফ্যাকাসে। একটা অজ্ঞাত ভয় যেন মানদাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে দেখিয়ে রতনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে ?

আজ্ঞে বাবু ও এই বাড়ির ঝি, মানদা।

হুঁ। কোন্ দরজা ?

ঐ যে দেখুন না—

সুশীল চক্রবর্তী দরজাটা একবার ঠেললেন—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে জোরে দরজার গায়ে কয়েকবার ধাক্কা দিলেন—ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

বিক্রম সিং !

জি হুজুর !

দরজা ভেঙে ফেল।

কিন্তু ঘরের দরজা ভাঙা অত সহজ হল না। মজবুত কাঠের দরজা, দরজার গায়ে ইয়েল লক সিস্টেম। অনেক কষ্টে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর বিক্রম সিং আর হরদয়াল উপাধ্যায় দরজাটা ভেঙে ফেলল।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই সুশীল চক্রবর্তী থমকে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে তখনো, সব জানালা বন্ধ। মালঞ্চ চেয়ারের ওপর বসে—মাথাটা ঈষৎ বুকের ওপর ঝুঁকে আছে, আর হাত পাঁচেক দূর থেকেই সুশীল চক্রবর্তী স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একটা পাকানো রুমাল মহিলাটির গলায় চেপে বসে আছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে উপবিষ্ট ঐ দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে এলেন সুশীলবাবু।

চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে, এবং মুখের ভিতর থেকে জিহ্বাটা সামান্য বের হয়ে আছে। গায়ে হাত দিলেন—শরীর ঠাণ্ডা এবং শক্ত কাঠ। সুশীল চক্রবর্তীর বুঝতে কষ্ট হল না, মহিলাটি অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

মাথার কেশ বিপর্যস্ত কিছুটা। হাত দুটো দু'পাশে ছড়ানো। গলায় একটা সোনার হার, হাতে পাঁচ গাছি করে বর্ফি প্যাটার্নের সোনার চুড়ি ঝক্‌ঝক করছে, কানে নীল পাথরের দুটো টাব। পরণে একটা জামদানী ঢাকাই শাড়ি, বুক পর্যন্ত খোলা। ব্লাউজের বোতামগুলো ছেঁড়া, খালি পা—

হঠাৎ নজরে পড়ল সুশীলবাবুর—ঘরময় কতগুলো বড় বড় মুক্তো ছড়ানো, নীচু হয়ে মেঝে থেকে একটা মুক্তো তুলে নিয়ে হাতের পাতায় মুক্তোটা পরীক্ষা করলেন, একটা বড় মটরের দানার মত মুক্তোটা—ভিতর থেকে একটা নীলাভ দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দামী সিংহলী মুক্তো মনে হয়।

স্পষ্ট বোঝা যায়, কেউ গলায় রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে ভদ্রমহিলাকে হত্যা করেছে। মানদা আর রতন ঘরে ঢোকেনি, তারা বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুশীল চক্রবর্তী ডাকলেন, ওহে রতন না কি তোমার নাম, ভিতরে এসো।

রতন প্রায় কাঁপতে কাঁপতে এসে ঘরে ঢুকল আর ঢুকেই গৃহকর্ত্রীকে ঐ ভাবে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল।

এ কে ?

আজ্ঞে উনিই আমাদের মা, এই বাড়ির কর্ত্রী।

তা তোমাদের বাবু—মানে কর্তাবাবু কই, তাকে ডাক তো।

বাবু তো এখানে থাকেন না আজ্ঞে।

থাকেন না মানে ?

আজ্ঞে বেতের বেলায় থাকেন না। সন্ধ্যার পর আসেন আর রাত এগারোটা সোয়া এগারোটা নাগাদ চলে যান।

দেখ বাপু, তোমার কথার তো আমি মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবু এখানে থাকেন না—মানে তোমাদের গিন্নীমা একা একা এ বাড়িতে থাকেন ?

আজ্ঞে একা না, মানদা আর আমি থাকি, আর নীচের ঘরে একজন বাবু থাকেন।

বাবু! কে বাবু ?

তা তো জানি না আজ্ঞে, উনি তিনদিন ছিলেন না, আজ সকালেই আবার ফিরে এসেছেন। তিনিই তো বললেন আজ্ঞে, আমাদের মা বেঁচে নেই, তিনি মরে গেছেন।

সুশীল চক্রবর্তীর কেমন যেন সব গোলমাল ঠেকে। এবং বুঝতে পারেন ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই গোলমাল আছে।

যাকে ওরা এ বাড়ির মালিক বা বাবু বলছে—তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসেন আবার রাত্রি এগারোটা সোয়া এগারোটায় চলে যান, অথচ নীচে আর এক বাবু থাকে—মানে কি ?

সুশীলবাবু প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ির আসল মালিক কে ?

আজ্ঞে বললাম তো, তিনি এখানে থাকেন না।

তার নামটা জানো ? কি নাম তার ?

আজ্ঞে শুনেছি সুরঞ্জিৎ ঘোষাল।

আর নীচে যে বাবু থাকেন, তার নাম ?

তা তো জানি না।

সে বাবুটি কে ?

তা জানি না।

তবে তুমি জানলে কি করে যে এ বাড়ির আসল মালিক সুরজিৎ ঘোষাল ?

আজ্ঞে মানদার মুখে শুনেছি।

ডাক তোমার মানদাকে। সুশীলবাবু বললেন।

এই মানদা, ঘরে আয়, দারোগাবাবু কি শুধাচ্ছেন। রতন মানদাকে ডেকে আনল।

মানদা এসে ঘরে ঢুকল। একটু মোটার দিকেই চেহারাটা, বয়েস ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। মনে হয় মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানোই ছিল, এখন একটু বিপর্যস্ত। পরনে একটা ভেলভেট পাড় মিলের মিহি শাড়ি, গলায় একছড়া সরু হার, হাতে সোনার রুলি। চোখ মুখের চেহারাটা বেশ সুশ্রী।

তোমার নাম মানদা ?

আজ্ঞে বাবু।

ইনি তোমাদের গিন্নীমা ?

আজ্ঞে—কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মানদা। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল তার।

তোমাদের কর্তাবাবুর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ছিল ?

আজ্ঞে ইনি সুরজিৎবাবুর বিয়ে করা ইস্ত্রী নন।

বিয়ে করা স্ত্রী নন !

আজ্ঞে না।

এবার সুশীলবাবু বুঝতে পারেন মহিলাটি সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা ছিল। বলেন, তার মানে উনি সুরজিৎবাবুর রক্ষিতা ছিলেন ?

হ্যাঁ।

এর কোন আত্মীয় স্বজন আছে ?

আছে।

কে ?

ওর স্বামী।

স্বামী ! কোথায় থাকেন তিনি ? তার নাম জানো ?

জানি, সুশান্তবাবু—এই বাড়িরই নীচের তলায় থাকেন।

কোথায় তিনি ?

বোধহয় নীচে।

কাল রাত্রে বাড়ি ছিলেন সুশান্তবাবু ?

আজ্ঞে তিনদিন ছিলেন না, আজ সকালেই এসেছেন।

ব্যাপারটা সুশীল চক্রবর্তীর কাছে তখনো পরিষ্কার হয় না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, সুরজিৎবাবু কি রোজ আসতেন এখানে ?

তা আসতেন বৈকি।

আর ওর স্বামী ?

এই তো একটু আগে বল্লুম, সে মানুষটার সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই ছিল না।

উনি ওপরে আসতেন না ?

না। তবে মাঝে মধ্যে টাকার দরকার হলে, মানে মদ খাবার পয়সা চাইতে আসতেন।

কতদিন এ বাড়িতে আছ তুমি ?

তা বছর চারেক হবে।

আর উনি ?

উনি কতদিন এ বাড়িতে আছেন জানি না বাবু, তবে শুনেছি এই বাড়িটা সুরজিৎবাবুই ওকে কিনে দিয়েছিলেন।

গ্যারেজে একটা গাড়ি দেখলাম--

সুরজিৎবাবুই গিন্নীমাকে ওটা কিনে দিয়েছিলেন।

ড্রাইভার নেই ?

আজ্ঞে না, মা নিজেই গাড়ি চালাতেন।

রতন কতদিন আছে ?

ও আমার মাস দুই পরে আসে। তার আগে এক বুড়ো ছিল—ভৈরব, সে কাজ ছেড়ে দেবার পর রতন আসে।

সুরজিৎবাবু কোথায় থাকেন জানো ?

আজ্ঞে কোথায় থাকেন জানি না, তবে ফোন নাম্বারটা জানি।

সুশীল চক্রবর্তী মানদার কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে ঘরের কোণে দেওয়ালে ব্র্যাকেটের ওপরে রক্ষিত ফোনটার কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়াল করলেন। একজন ভদ্রমহিলা ফোন ধরলেন।

এটা কি সুরজিতবাবুর বাড়ি ?

হ্যাঁ।

তিনি বাড়িতে আছেন ?

আছেন, ঘুমাচ্ছেন—আধ ঘণ্টা বাদে ফোন করবেন।

তাকে একটিবার ডেকে দিন, আমার জরুরী দরকার।

কে আপনি ? কোথা থেকে বলছেন ?

আপনি কে কথা বলছেন ?

আমি তার স্ত্রী।

শুনুন, বিশেষ জরুরী দরকার, আমি পুলিশ অফিসার, একবার তাকে ডেকে দিন।

একটু পরেই অন্য প্রান্ত থেকে ভারী গলা শোনা গেল, সুরজিৎ ঘোষাল বলছি।

আমি—থানার ও-সি সুশীল চক্রবর্তী, আপনাদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বলছি, এখুনি একবার এখানে চলে আসুন।

কি ব্যাপার ?

এ বাড়িতে একজন খুন হয়েছেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসুন। বলে সুশীল চক্রবর্তী ফোন রেখে দিলেন।

ওর স্বামী নীচের ঘরে থাকেন বলছিলে না! সুশীলবাবু আবার মানদাকে প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ।

চল তো নীচে।

একজন সেপাইকে ঘরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন। বাড়িটি দোতলা, ওপরে তিনখানা ঘর, নীচেও তিনখানা ঘর, আর আছে দেড়তলায় একটা ঘর, তার নীচে গ্যারেজ।

সুশীলবাবু যখন ঘরে ঢুকলেন সুশান্ত তখন ঘুমে অচেতন।

সুশীল চক্রবর্তী একবার ঘরটার চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। একটা বেতের চেয়ার, একটা খাট। এক কোণে দড়ির আলনায় খানকয়েক ময়লা প্যান্ট, লুঙ্গি, শার্ট ঝুলছে। আর এক কোণে ছেঁড়া ময়লা কাবুলী চপ্পল, কাঁচের গ্লাস চাপা দেওয়া একটা জলের কুঁজো। লোকটা শার্ট আর প্যান্ট পরেই ঘুমোচ্ছে।

শুনছেন, ও মশাই—

কয়েকবার ডাকেও ঘুম ভাঙল না, শেষ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে সুশান্তর ঘুম ভাঙাতে হল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে সুশান্ত উঠে বসল, কে ?

আমি থানা থেকে আসছি, কি নাম আপনার ?

আমার নাম দিয়ে কি হবে আপনার ?

যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দিন, ধমকে উঠলেন সুশীল চক্রবর্তী।

সুশান্ত মল্লিক।

এ বাড়ি আপনার ?

আজ্ঞে না।

তবে এ বাড়ি কার ?

কে জানে কার।

জানেন না, অথচ এ বাড়িতে থাকেন, ভারী আশ্চর্য তো! সুরজিৎ ঘোষালকে চেনেন ?

চিনব না কেন।

কে লোকটা ?

ওপরে গিয়ে মালঞ্চ দেবীকে শুধান না, তিনিই আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

মালঞ্চ দেবী কে ?

হাসল সুশান্ত, বলল, সুরজিৎ ঘোষালের মেয়েমানুষ।

আপনি কে হন মালঞ্চ দেবীর ?

কেউ না।

মিথ্যে কথা বলছেন, মানদা বলছিল উনি আপনারই স্ত্রী—

বাজে কথা, আপনি নিজেই গিয়ে শুধান না ওকে।

কাকে শুধাব— She is dead.

তাহলে সত্যি সত্যিই She is dead ! জানেন মশাই, ভেবেছিলাম আমিই ঐ মহৎ কর্মটি করব। কিন্তু তা আর হল না, দেখছি, মাঝখান থেকে হার্লটটাকে আর একজন এসে হত্যা করে গেল। However I am really glad it is done !

আপনিও তো এই বাড়িতেই থাকেন ?

হ্যাঁ, মালঞ্চ দেবীর দয়ায়।

এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন, মানে কে বা কারা তাকে হত্যা করতে পারে ?

না মশাই, আমি আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের সংবাদে কি প্রয়োজন। দেখুন স্যার, তিন রাত আমি ঘুমোইনি। ঘুমে শরীর আমার ভেঙে আসছে, please আমাকে একটু ঘুমোতে দিন। বলতে বলতে সুশান্ত আবার খাটের ওপর গা ঢেলে শুয়ে পড়ল।

ঠিক ঐ সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। সুশীল চক্রবর্তী বাইরে এসে দেখলেন, সৌম্য, সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিরাট একটা ইমপোর্টেড কার থেকে নামছেন। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল।

সুশীল চক্রবর্তী এগিয়ে বললেন, আপনিই বোধহয় সুরজিৎ ঘোষাল ?

হ্যাঁ। ফোনে বলেছিলেন কে যেন খুন হয়েছে। রীতিমত উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ল সুরজিৎ ঘোষালের কণ্ঠে।

হ্যাঁ, ওপরে চলুন মিঃ ঘোষাল। আসুন।

সুশীল চক্রবর্তীর পিছনে পিছনে ওপরে উঠে মালঞ্চর শয়নকক্ষে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন সুরজিৎ ঘোষাল, এ কি! মালা নেই!

না মিঃ ঘোষাল, She is dead. ঐ দেখুন, গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ওকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা করা হয়েছে !

হ্যাঁ।

কে—কে হত্যা করল ?

সেটা এখনো জানা যায়নি।

মালঞ্চকে হত্যা করা হয়েছে! সুরজিৎ ঘোষাল যেন কেমন বিমূঢ় অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকেন মালঞ্চর মৃতদেহটার দিকে।

মিঃ ঘোষাল।

সুশীল চক্রবর্তীর ডাকে কেমন যেন বোবা দৃষ্টিতে সুরজিৎ তাকালেন তার মুখের দিকে।

এ বাড়িটা কার? সুশীল চক্রবর্তীর প্রশ্ন।

এই বাড়িটা—এটা—

কার এ বাড়িটা? এ বাড়ির মালিক কে?

ঐ মালঞ্চ।

কিন্তু আপনিই এ বাড়িটা কিনে দিয়েছিলেন ঐ মালঞ্চ মল্লিককে, তাই নয় কি ?

কে বলল আপনাকে ?

আমি জেনেছি।

সুরজিৎ ঘোষাল বোবা।

আর উনি আপনার keeping-য়ে ছিলেন। এটা কি সত্যি ?

হ্যাঁ, সুরজিৎ ঘোষাল কুণ্ঠার সঙ্গে মাথা নীচু করে বললেন।

কত বছর উনি আপনার কাছে ছিলেন ? সুশীল চক্রবর্তীর আবার প্রশ্ন।

তা বোধহয় বছর সাতেক হবে।

Quite a long period, তা কখনও মনোমালিন্য বা ঝগড়া-টগড়া হয়নি আপনাদের দুজনের মধ্যে ?

ঝগড়া ? না। তবে ইদানীং কিছুদিন ধরে আমি ওর পরে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম। She was playing double role with me !

অন্য কোন পুরুষ ?

হ্যাঁ।

কি নাম তার ?

দীপ্তেন ভৌমিক।

তিনি বুঝি এখানে যাতায়াত করতেন ?

হ্যাঁ, এবং আমার অগোচরে।

কথাটা কি করে আপনি জানতে পারলেন—if you don't mind মিঃ ঘোষাল ?

Somehow first I smelt it। আমার কেমন সন্দেহ হয়—বুঝতেই পারছেন I was alert এবং ক্রমশ সবই জানতে পারি একটু একটু করে।

আচ্ছা, ঐ যে দীপ্তেন ভৌমিক, তিনি কি করেন, কোথায় থাকেন জানেন নিশ্চয়ই ?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম তিনি বালীগঞ্জেই লেক রোডে থাকেন। বিলেত থেকে ম্যানেজমেণ্ট না কি সব পাশ করে এসে বছর তিনেক হল একটা ফার্মে কাজ করছেন। মোটা মাইনে পান।

তা দীপ্তেনবাবুর সঙ্গে মালঞ্চদেবীর আলাপ হল কি করে ?

বলতে পারেন আমারই নির্বুদ্ধিতায়।

কি রকম ?

গত বছর আমরা পুরী বেড়াতে যাই, সেখানেই আলাপ।

তার বাড়ির ঠিকানাটা জানেন ?

জানি।

সুরজিৎ ঘোষালের কাছ থেকে ঠিকানাটা শুনে সুশীল চক্রবর্তী লিখে নিলেন, তার নোটবইয়ে।

আচ্ছা মিঃ ঘোষাল, তিনি কি ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন ?

না, ওটা একটা মাল্টি-স্টোরিড বিলডিংয়ের চারতলার ফ্ল্যাট, মনে হয় ফ্ল্যাটটা তিনি কিনেছেন।

বিক্রম সিং ঐ সময় একটা কাগজে করে কতকগুলো মুক্তো এনে সুশীল চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বলল, স্যার, ঘরের মধ্যে এই পঞ্চাশটা মুক্তো পাওয়া গিয়েছে। আর এই ছেঁড়া সিল্কের সুতোটা।

সুশীল চক্রবর্তী কাগজটা সব সমেত মুড়িয়ে পকেটে রেখে বললেন, আপনি কাল এখানে এসেছিলেন, মিঃ ঘোষাল ?

এসেছিলাম।

কখন ?

রাত্রি সোয়া আটটা নাগাদ।

তারপর কখন চলে যান ?

আধঘণ্টা পরেই।

অত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে ?

কাজ ছিল একটা।

আচ্ছা, মালঞ্চদেবীর স্বামী তো এই বাড়িতেই থাকেন। আপনি কোন আপত্তি করেননি ?

না।

আপনার সঙ্গে তার পরিচয় আছে ?

থাকবে না কেন -

লোকটিকে কি রকম মনে হয় ?

Most non-interfeering, শান্তশিষ্ট টাইপের মানুষ।

Naturally !

আমি কি এখন যেতে পারি মিঃ চক্রবর্তী ?

হ্যাঁ পারেন, তবে আপনাকে হয়তো পরে দরকার হতে পারে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর আপনি আমাকে বাড়িতেই পাবেন।

সুরজিৎ ঘোষালকে বিদায় দিয়ে রতনকে আবার ডাকলেন সুশীল চক্রবর্তী। প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম রতন কি ?

আজ্ঞে রতন সাঁপুই।

তোমার দেশ কোথায়?

মেদিনীপুর জেলায় আজ্ঞে—পাঁশকুড়ায়।

আচ্ছা রতন, ঐ সুরজিৎবাবু ছাড়া অন্য একজন বাবুও এখানে আসতেন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দীপ্তেনবাবু।

কাল রাত্রে দীপ্তেনবাবু এসেছিলেন?

হ্যাঁ, সন্ধ্যার মুখেই এসেছিলেন।

কখন চলে গেলেন?

আজ্ঞে কখন গিয়েছিলেন বলতে পারব না—তাকে আমি যেতে দেখিনি।

হুঁ। আচ্ছা, দীপ্তেনবাবু থাকতে থাকতেই কি সুরজিৎবাবু এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

তাহলে তো দুজনের দেখাও হতে পারে—

বলতে পারব না আজ্ঞে—দেখা হয়েছিল কিনা—।

হুঁ। কাল কত রাত পর্যন্ত তুমি জেগে ছিলে?

আজ্ঞে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাই সদরে তালা দিয়ে দশটা নাগাদ শুয়ে পড়েছিলাম। তারপরই ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ সকালে কখন ঘুম ভাঙল?

ভোর ছটা সাড়ে ছটায় মা চা খেতেন এবং মার হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেলেই রান্নাঘরের বেলটা বেজে উঠত, তখন মানদা চা নিয়ে ওপরে যেত।

এ বাড়িতে রান্না-বান্না কে করে, তুমি না মানদা?

আজ্ঞে আমিই।

তারপর বল—

সাতটা বেজে যেতেও যখন বেল বাজল না তখন মানদা চা নিয়ে ওপরে যায়, তারপর তো যা ঘটেছে আপনি সব শুনেছেন।

হুঁ! তোমার মাইনে কত—কত পেতে এখানে?

আজ্ঞে একশো টাকা, তাছাড়া ২।৩ মাস পর পর জামা কাপড় পেতাম, মাঝে মধ্যে বকশিসও—

দীপ্তেনবাবু যে এখানে যাতায়াত করতেন সে কথাটা তুমিই

বোধহয় সুরজিৎবাবুকে জানিয়েছিলে ?

ছিঃ বাবু, চুকলি কাটা আমার অভ্যাস নয়—এ ঐ মানদার কাজ। ঐ মানদাই বলেছে, বুঝলেন বাবু, নচেৎ সুরজিৎবাবু জানলেন কি করে আর তাইতেই তো এই বিভ্রাট হল।

তোমার ধারণা তাহলে দীপ্তেনবাবুর ব্যাপার নিয়েই—

ঠিক জানি না বাবু, তবে আমার তো তাই মনে হয়।

হুঁ। ঠিক আছে, যাও। মানদাকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, এখন এ বাড়িতে পাহারা থাকবে, তুমি কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না—

আজ্ঞে আমি তো ভেবেছিলাম আজই দেশে চলে যাব।

না, এখন যাওয়া হবে না। পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু বিপদে পড়বে- বুঝেছ ? যাও, মানদাকে পাঠিয়ে দাও—

মানদা এলো। আর একবার মানদার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন সুশীল চক্রবর্তী, তারপর জেরা শুরু করলেন।

মানদা, কাল তোমার সুরজিৎবাবু কখন এখানে আসেন ?

তা ঠিক বলতে পারব না বাবু, ঘড়ি দেখিনি। তবে দীপ্তেনবাবু আসার ঘণ্টাখানেক পরেই বাবুর গাড়ি এসে থামে।

দীপ্তেনবাবু তখন কোথায় ছিলেন ?

এই ঘরে।

তাহলে তোমার বাবুর সঙ্গে দীপ্তেনবাবুর কাল রাত্রে দেখা হয়েছিল বল ?

তা বলতে পারব না বাবু।

কেন, দীপ্তেনবাবু তো তখন এই ঘরেই ছিলেন বলছ—

ছিলেন তবে দেখা হয়েছিল কি না জানি না, কারণ পরে বাবু চেঁচামেচি করে যখন বের হয়ে গেলেন তখন ঘরে ঢুকে আমি দীপ্তেনবাবুকে দেখতে পাইনি।

এ বাড়ি থেকে বেরুবার আর কোন দ্বিতীয় রাস্তা আছে ?

না তো।

বলছিলে বাবু চেঁচামেচি করছিলেন—কেন চেঁচামেচি করছিলেন তা জানো ?

বোধহয় ঐ দীপ্তেনবাবুর ব্যাপার নিয়েই—

দীপ্তেনবাবু যে তোমার বাবুর অনুপস্থিতিতে এ বাড়িতে আসতেন

তোমার বাবু জানলেন কি করে—তুমি বলেছিলে ?

আজ্ঞে না। মা আমাকে মানা করে দিয়েছিলেন, আমি বলতে যাব কেন ?

মিথ্যে কথা। সত্যি বল, তুমিই—

মা কালীর দিব্বি বাবু, আমি চুকলি কাটিনি।

তুমি মাইনে কত পেতে ?

দেড়শো টাকা।

বল কি ! তা মাইনেটা কে দিত ?

মা-ই দিতেন।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পারো। আর একটা কথা শুনে রাখ, এ বাড়ি থেকে এখন তুমি বা রতন কেউ কোথাও বেরুবে না।

বেশ, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।

মানদা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

মালঞ্চর মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন সুশীল চক্রবর্তী—ঐখান থেকেই ফোন করে। মৃতদেহের ব্যবস্থা করে সুশীল চক্রবর্তী ঘরটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন।

বেশ বড় সাইজের ঘর, মেঝেতে সুন্দর ডিজাইনের টালী পাতা। একধারে একটি সিঙ্গল খাটে মোটা ডানলোপিলোর গদির ওপর বিছানা পাতা। দামী একটা বেডকভার দিয়ে তখনো শয্যাটি ঢাকা, বোঝা যায় গত রাত্রে ঐ শয্যা কেউ ব্যবহার করেনি।

একধারে একটা স্টীলের আলমারি, তারই গা ঘেঁষে বিরাট একটা ড্রেসিং টেবিল, তার সামনে বসবার একটা গদি-মোড়া কুশন। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে নানাবিধ দামী দামী প্রসাধন দ্রব্য সাজানো। সবই ফরেন গুড্স। প্রসাধন দ্রব্যগুলো দেখলে মনে হয় মালঞ্চ রীতিমত শৌখিন ছিল। ঘরের অন্য দিকে একটা ওয়ারড্রোব, তার ওপরে সুন্দর সোনালী ফ্রেমে পাশাপাশি দুটো ফটোই বোধহয় এক সময় ছিল, এখন একটাই মাত্র ফটো দেখা যাচ্ছে—মালঞ্চর ফটো।

ফটো ফ্রেমের সামনে এক গোছা চাবি সমেত একটা রূপোর চাবির রিং, এবং তার পাশে রয়েছে একটা দামী লেডিজ রিস্টওয়াচ।

ঘরের অন্য কোণে সুদৃশ্য জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে একগোছা বাসী রজনীগন্ধার স্টিক। তার পাশে একটা মাঝারি সাইজের রেডিওগ্রাম।

ঘরটা দেখা শেষ করে সুশীল চক্রবর্তী ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দরজা ঠেলে বাথরুমে প্রবেশ করলেন।

দীপ্তেন ভৌমিক কাল সন্ধ্যায় এখানে এসেছিল, কিন্তু তাকে রতন বা মানদা কেউই এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে দেখেনি। তবে কোথা দিয়ে লোকটা বের হয়ে গেল কাল রাত্রে? প্রশ্নটা সুশীল চক্রবর্তীর মাথার মধ্যে তখনো ঘোরাফেরা করছে।

ঘরের দরজায় ইয়েল-লক্ করা ছিল, সেই দরজা ভেঙে ওরা ঢুকেছেন মালঞ্চর শোবার ঘরে। বাথরুমে দেখা গেল আর একটা দরজা আছে, কিন্তু সে দরজাটা বন্ধ। সুশীল চক্রবর্তী আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন এ বাড়িতে ঢোকার সময়—সদরের দরজাতেও ইয়েল লক সিস্টেম।

বাথরুমের দরজা বন্ধ, ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল—তবে কোথা দিয়ে কোন্ পথে দীপ্তেন ভৌমিক এ বাড়ি থেকে গত রাত্রে বের হয়ে গিয়েছিল? তবে কি সকলের অজ্ঞাতে কোন এক সময় ঐ সদর দিয়েই বের হয়ে গিয়েছিল?

বাথরুমে দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না, ঝক্ঝকে আয়না লাগানো বেসিন, ব্রাকেটের সঙ্গে লিকুইড সোপ কেস লাগানো, গোটা দুই টুথব্রাশ, টুথ পেস্ট, একটা ট্যালকাম পাউডারের কৌটো, সাবানের কেস, তাতে সাবান রয়েছে। দেওয়ালের র‍্যাকে ঝুলছে একটা টাওয়েল আর সিল্কের নাইটি।

বাথরুমের পিছনের দরজাটা খুলে ফেললেন সুশীল চক্রবর্তী। একটা ঘোরালো লোহার সিঁড়ি নীচের গলিপথে নেমে গিয়েছে। মেথরদের যাতায়াতের ব্যবস্থা ঐ সিঁড়িই। দরজাটা বন্ধ করে সুশীল চক্রবর্তী আবার ঘরে ফিরে এলেন।

মর্গে বডি নিয়ে যাবার জন্যে একটা কালো ভ্যান এসে গিয়েছে।

ডেড-বডি নিয়ে যাবার পর সুশীল চক্রবর্তী ঘরের মধ্যেকার আলমারিটা খুললেন—ঐ চাবির রিংয়েরই একটা চাবির সাহায্যে।

হ্যাঙ্গারে নানা রংয়ের সব দামী দামী শাড়ি ও ব্লাউজ সাজানো। চাবি দিয়ে আলমারির ড্রয়ার খুললেন—একটা চন্দন কাঠের বাক্স—বেশ ভারি—তালা লাগানো ছিল না বাক্সটায়, ডালা তুলতেই দেখা

গেল অনেক সোনার গহনা—ডালা বন্ধ করে বাক্সটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। ড্রয়ারের মধ্যে একটা প্লাষ্টিকের বাক্সের মধ্যে কয়েকটি একশো টাকার নোট বাণ্ডিল বাঁধা, কিছু দশটাকা ও পাঁচ টাকার নোট, খুচরো পয়সা। একশো টাকার নোট প্রায় হাজার দুই টাকার হবে। আলমারিটা বন্ধ করে, ঘরে ইয়েল-লক টেনে দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলেন সুশীল চক্রবর্তী।

বাইরে মানদা দাঁড়িয়ে ছিল। মানদাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই চাবি কি তোমার মার কাছেই থাকত?

আজ্ঞে একটা চাবি বাবুর কাছে আর অন্যটা মার কাছে থাকত, মানদা বলল।

সদরের চাবি তো তাহলে তার কাছেও একটা থাকত?

হ্যাঁ।

অতঃপর বিক্রম সিংকে বাড়ির প্রহরায় রেখে বাইরে এসে জীপে উঠে বসলেন সুশীল চক্রবর্তী। আসবার সময় আর একবার উঁকি দিলেন নীচের তলায় সুশান্ত মল্লিকের ঘরে—সুশান্ত মল্লিক ঘুমোচ্ছে।

আকাশ কালো হয়ে উঠেছে তখন। গত রাত থেকেই মধ্যে মধ্যে মেঘ জমছে আকাশে, কিন্তু বৃষ্টি নামেনি। পথে যেতে যেতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল।

সুরজিৎবাবুর বড় ছেলে যুধাজিৎ পরের দিন তার মার কাছ থেকেই সব ব্যাপারটা জেনেছিল। স্বামীর যে একটি রক্ষিতা আছে, আর তাকে বাড়ি গাড়ি করে দিয়েছেন সুরজিৎ, তার স্ত্রী স্বর্ণলতা জানতেন। প্রথম প্রথম স্বামীকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, অনেক কান্নাকাটিও করেছিলেন কিন্তু স্বামীকে ঐ ডাইনির কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেননি। অবশেষে চুপ করে গিয়েছিলেন।

ঐ দিন সুরজিৎবাবু ফিরতেই স্বর্ণলতা শুধালেন, কোথায় গিয়েছিলে এই সাত সকালে?

কাজ ছিল।

কি এমন কাজ যে ফোন পাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিলে?

মালঞ্চকে কে যেন খুন করে গিয়েছে—

সে কি! অস্ফুট একটা আর্তনাদ স্বর্ণলতার কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এলো।

হ্যাঁ। থানার লোক এসে দরজা ভেঙে তাকে মৃত অবস্থায় দেখেছে।

তা কি ভাবে মারা গেল গো?

গলায় রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

কি সর্বনাশ! কে—কে করল?

তা আমি কি করে বলব?

তুমি জানো না কিছু? প্রশ্নটা করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন স্বর্ণলতা—সত্যি সত্যিই তুমি জানো না?

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে তাকালেন সুরজিৎ। কয়েকটা মুহূর্ত স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর শান্ত গলায় স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সুরজিৎ বললেন, কি বলতে চাও তুমি?

তুমি তো কাল রাত্রেও সেখানে গিয়েছিলে।

তাই কি? স্পষ্ট করে বল, কি বলতে চাও তুমি।

তুমি কিছুই জানো না?

কি জানব?

কে তাকে হত্যা করল?

জানি না।

তাহলে কাল অত রাত করে বাড়ি ফিরেছিলে কেন?

॥ ছয় ॥

শনিবার সকালে হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির দোতলার দরজা ভেঙে মালঞ্চর মৃতদেহ পুলিশ আবিষ্কার করল এবং পরের শুক্রবার মানে ঠিক পাঁচ দিন পরে অকস্মাৎ যেন সমস্ত ব্যাপারটা নাটকীয় একটা মোড় নিল। সুরজিৎ ঘোষাল যা স্বপ্নেও ভাবেননি তাই হল। সংবাদপত্রে ব্যাপারটা ফ্ল্যাশ করল—

'বালীগঞ্জ হিন্দুস্থান রোডের এক দ্বিতল গৃহে, রুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এক মহিলাকে। শোনা যাচ্ছে ঐ মহিলাটি কোন একটি নামকরা ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাকি রক্ষিতা ছিল। সেই রক্ষিতাকে ভদ্রলোকটি ওই বাড়িটি কিনে দিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত সন্ধ্যায় ঐ রক্ষিতার গৃহে যেতেন এবং রাত্রি প্রায় এগারোটা অবধি থেকে আবার চলে আসতেন।

পুলিশ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে যে যেদিন রাত্রে হত্যা সংঘটিত হয় সেই দিন সন্ধ্যায়ও অর্থাৎ শুক্রবার সন্ধ্যাতেও ঐ ভদ্রলোক তার গৃহে গিয়েছিলেন। পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে। ঘরের মেঝেতে একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আরো সংবাদ যে, যে রুমালের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করা হয়েছে সেই রুমালের এক কোণে নাকি লাল সুতায় ইংরেজী আদ্যাক্ষর 'S লেখা আছে। এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।"

আগের দিন সন্ধ্যার কিছু পরে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সুশীল চক্রবর্তী এসেছিলেন পার্ক স্ট্রীটে সুরজিৎ ঘোষালের গৃহে।

সুরজিৎ ঘোষাল সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছেন তখন। জামা কাপড়ও ছাড়েননি। ভৃত্য সনাতন এসে জানাল, বালীগঞ্জ থানার ও-সি সুশীলবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সুশীল চক্রবর্তী! চমকে ওঠেন সুরজিৎ।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন স্ত্রী স্বর্ণলতা। তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, বালীগঞ্জ থানার ও. সি. আবার কেন এলো গো?

কি করে জানব। দেখি—সুরজিৎ ঘোষাল উঠে পড়লেন।

নীচের পার্লারে সুশীল চক্রবর্তী অপেক্ষা করছিলেন। সুরজিৎ ঘোষাল নীচে এসে পার্লারে প্রবেশ করলেন।

মিঃ ঘোষাল, এ সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত।

কি ব্যাপার মিঃ চক্রবর্তী?

এই রুমালটা দেখুন তো—বলে কাগজে মোড়া একটা রুমাল পকেট থেকে বের করে সুরজিৎ ঘোষালের সামনে ধরলেন সুশীল চক্রবর্তী।

রুমাল! কেমন যেন অসহায় ভাবে কাগজের মোড়কটার দিকে তাকালেন সুরজিৎ ঘোষাল।

এই রুমালটার সাহায্যেই সেদিন মালঞ্চ মল্লিককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল। দেখুন তো, এই রুমালটা চিনতে পারেন কি না—

সুরজিৎ ঘোষালের সমস্ত দেহটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল।

মুখে একটিও কথা নেই। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তিনি রুমালটার দিকে। রুমালটার এক কোণে লাল সুতো দিয়ে ইংরেজী 'S' লেখা।

চিনতে পারছেন, কার রুমাল এটা ?

রুমালটা মনে হচ্ছে আমারই—

এই রুমালটা সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে ?

সুরজিৎ ঘোষাল একেবারে যেন বোবা, পাথর।

আচ্ছা, সে রাত্রে আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে ঠিক কতক্ষণ ছিলেন ?

আধঘণ্টা মত হবে।

তারপর সেখান থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান ?

কেন, আমি—আমি তো সোজা এখানেই, মানে বাড়িতেই চলে আসি—

না, আপনি তা আসেননি। রাত সাড়ে এগারোটার সময় আপনাকে বালীগঞ্জের হরাইজন ক্লাবে ড্রিংক করতে দেখা গিয়েছে

কে—কে বললে ?

শুনুন, আপনি যেখানে যেখানে যেতেন সব জায়গাতেই আমরা খোঁজ নিয়েছি—আপনি হরাইজন ক্লাবে প্রায়ই যেতেন, আপনি সেখানকার মেম্বার। সে রাতে আপনি পৌনে এগারোটা নাগাদ সেই ক্লাবে যান। সুতরাং রাত আটটা নাগাদ যদি আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে থাকেন তাহলে ঐ সময়টা—মানে রাত আটটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ?

I was feeling very much disturbed। মনটার মধ্যে একটা অস্থিরতা, তাই আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম

আপনার ড্রাইভার সঙ্গে ছিল ?

না, হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে বরাবর আমি নিজেই ড্রাইভ করে যেতাম। কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না—!

নিহত মালঞ্চ মল্লিকের গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় এই রুমালটা পাওয়া গিয়েছে, আর আপনি স্বীকার করছেন এ রুমালটা আপনারই, আপনি সে রাত্রে সেখানে গিয়েছিলেন মানে দুর্ঘটনার রাত্রে। তাছাড়া একমাত্র আপনার কাছেই মালঞ্চর ঘরের দরজার এবং ঐ

গাড়ির সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি থাকত সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।

আপনার কি ধারণা আমিই সে রাত্রে মালঞ্চকে হত্যা করেছি ?

সেটা এখনো প্রমাণ না হলেও ঐ হত্যার ব্যাপারে একজন suspect হিসাবে আপাতত আপনাকে আমি arrest করতে এসেছি। আমার সঙ্গে আপনাকে থানায় যেতে হবে।

বেশ চলুন। লম্বা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সুরজিৎ বললেন।

দশ মিনিট পর সুশীল চক্রবর্তী তার জীপে সুরজিৎ ঘোষালকে তুলে নিয়ে লালবাজারের দিকে চলে গেলেন।

সুরজিৎ ঘোষালকে থানা অফিসার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে এই সংবাদটা সনাতনই ওপরে এসে কাঁদতে কাঁদতে স্বর্ণলতাকে জানাল। স্বর্ণলতা সংবাদটা শুনে যেন পাথর হয়ে গেলেন।

সুরজিতের বড় ছেলে যুধাজিৎ আরো আধঘণ্টা পরে এলো ইউনিভারসিটি থেকে। সনাতনই তাকেও প্রথমে সংবাদটা দিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে। যুধাজিৎও সংবাদটা শুনে একেবারে স্তম্ভিত। সে তাড়াতাড়ি মার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এসব কি শুনছি মা।

সাশ্রুনয়নে স্বর্ণলতা নিঃশব্দে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

বাবাকে arrest করে নিয়ে গিয়েছে! মা—মাগো, কথা বলছ না কেন ?

স্বর্ণলতা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেবল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। কেলেঙ্কারীর কিছুই আর বাকী থাকবে না—কাল সকালেই সংবাদপত্রে নাম-ধাম দিয়ে সব কথা হয়তো ছেপে দেবে। তারপর তিনি মুখ দেখাবেন কি করে ?

কেঁদো না মা, I don't believe, আমি বিশ্বাস করি না বাবা ঐ কাজ করতে পারেন। আমি এক্ষুনি আমাদের সলিসিটার মিঃ বোসের কাছে যাচ্ছি—বলে যুধাজিৎ আর দাঁড়াল না। বের হয়ে গেল গাড়ি নিয়ে

সলিসিটার মিঃ নির্মল বসু সবকিছু শুনে বললেন, সর্বাগ্রে সুরজিতের জামীনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে হত্যার সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, হয়তো জামীন দিতে চাইবে না, ৩০২ ধারার

কেস। তবু চলুন, একবার এ্যাডভোকেট মিঃ ভাদুড়ীর কাছে যাওয়া যাক।

সোমনাথ ভাদুড়ী ক্রিমিন্যাল সাইডের আজকের সবচাইতে নাম করা এ্যাডভোকেট। তিনি ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত নীরবে শুনলেন যুধাজিতের কাছ থেকে, কেবল তার হাতের মোটা লাল নীল পেনসিলটা দু-আঙুলের মধ্যে ঘুরতে লাগল।

সব শুনে তিনি বললেন, ব্যাপারটা বেশ জটিল বলেই মনে হচ্ছে নির্মলবাবু, কালই আদালতে মিঃ ঘোষালকে যখন হাজির করা হবে, তখন আমরা জামীনের জন্য আর্জি ফাইল করব। তারপর দেখা যাক কি হয়। একটু থেমে সোমনাথ ভাদুড়ী আবার বললেন, যুধাজিৎবাবু, আইনের দিক থেকে অতঃপর যা কিছু করবার আমরা করব, করতেও হবে আমাদের, এবং আইন আদালতের ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন কতটা মন্দাক্রান্তা গতিতে চলে। ইতিমধ্যে আমার পরামর্শ যদি চান তো একটা কথা বলি।

বলুন। যুধাজিৎ বলল।

এদিকে যা হবার হোক, আপনারা ইতিমধ্যে একজনের সাহায্য নিলে বোধহয় ভাল করতেন।

কার সাহায্য ?

কিরীটী রায়ের নাম শুনেছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে নির্মল বসু বললেন, নিশ্চয়, শুনেছি বৈকি।

চলুন না, তার কাছে একবার যাওয়া যাক। বিচার বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা মশাই ভদ্রলোকটির। দুটো কেসের ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমি কাজ করে ওর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী মনের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছি। তবে ভাবছি তিনি রাজী হবেন কিনা—

কেন, রাজী হবেন না কেন, যা ফিস্ লাগে—Whatever amount he wants, যুধাজিৎ বলল, I am ready to pay.

সোমনাথ ভাদুড়ী হাসলেন—টাকার অঙ্ক দিয়ে তাকে রাজী করাতে পারবেন না যুধাজিৎবাবু। টাকা তিনি অবশ্যি নেন, কিন্তু আসলে গোয়েন্দাগিরি করা ওর একটা নেশা। এক কালে রহস্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে নেশা ছিল ভদ্রলোকের, কিন্তু ইদানিং আর তেমন যেন কোন উৎসাহ দেখি না। রহস্যের ব্যাপারে যেন মাথাই ঘামাতে চান না, তাছাড়া ভদ্রলোক প্রচণ্ড খেয়ালী।

আপনি যদি একবার অনুরোধ করেন মিঃ ভাদুড়ী—যুধাজিৎ বলল।

সোমনাথ ভাদুড়ী প্রত্যুত্তরে যুধাজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমিই যখন তার নাম করেছি তখন আমি অবশ্যই বলব।

তাহলে আর দেরি করে লাভ কি, চলুন না এখনই একবার তার কাছে যাই—

এখন না, কাল বিকেলের দিকে আসুন, যাওয়া যাবে। সকালটা আমায় জামীনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে।

সুনীল বসু বললেন, মিঃ ভাদুড়ী, আমিও কি আসব ?

আসতে পারেন, তবে না এলেও চলে, আমিই যুধাজিৎবাবুকে নিয়ে যাব।

তাহলে সেই কথাই রইল, আমি না এলে যুধাজিৎবাবুই আসবেন। আজ উঠি—

পরদিন আদালতে পুলিশ সুরজিৎ ঘোষালকে হাজির করল।

কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা কি করে জানি সংবাদটা ঠিক পেয়ে গিয়েছিল, ঐ দিনকার সংবাদপত্রে সুরজিৎ ঘোষালের গ্রেপ্তারের কাহিনী ছাপা হয়ে গিয়েছে দেখা গেল। সারা কলকাতা শহরে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়। এত বড় একজন নামী লোক,—জনসাধারণের কৌতূহল যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আদালতে কিন্তু জামীন পাওয়া গেল না, সরকার পক্ষের কৌঁসুলি মিঃ চট্টরাজ তীব্র ভাষায় জামীন দেওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করলেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী যদিও বললেন—তার ক্লায়েণ্ট সমাজের একজন গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠিত লোক তাকে জামীনে খালাস দেওয়া উচিত। কিন্তু তার উত্তরে চট্টরাজ বললেন, জামীন দিলে তদন্তের অসুবিধা হবে, চার্জ গঠন করা যাবে না।

জজসাহেব উভয় পক্ষের সওয়াল শুনে সুরজিৎকে আরো দশদিন হাজতে থাকবার নির্দেশ দিলেন। আরো দশদিন পরে ধার্য হল শুনানীর দিন, পুলিশের তদন্তের সাহায্য করবার জন্য।

বলাই বাহুল্য, পরের দিনের সংবাদপত্রে সমস্ত ব্যাপারটা বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে গেল। সুরজিৎ ঘোষালকে জামীন দেননি জজ, আরো তদন্ত সাপেক্ষে জেল হাজতে থাকবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া গ্রাস করল সুরজিৎ ঘোষালের গৃহকে।

॥ সাত ॥

কিরীটী কিন্তু প্রথমটা রাজী হয়নি।

রাত আটটা নাগাদ সোমনাথ ভাদুড়ী তার গড়িয়াহাটার বাড়িতে একাই এসেছিলেন কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে। কিরীটী বলেছিল, না ভাদুড়ীমশাই, ওসব ঘাটাঘাটি করতে এ বয়েসে আর ভাল লাগে না, আপনারা বরং সুব্রতর কাছে যান। আমার মনে হয় সে কেসটা ঠিক ট্যাক্‌ল্‌ করতে পারবে।

তা জানি, মৃদু হেসে সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, তবু কিরীটীবাবু আপনি হলে—

আমিও বিশ্বাস করি এ্যাডভোকেট সোমনাথ ভাদুড়ী যখন এ মামলা হাতে নিয়েছেন তখন কোন অবিচার হবে না, দোষী ঠিকই চিহ্নিত হবে।

হাসতে হাসতে সোমনাথ ভাদুড়ী বললেন, কিন্তু আপনি ছাড়া মামলার সমস্ত সূত্র গুছিয়ে আমার হাতে তুলে দেবে কে—কারণ ব্যাপারটা সত্যিই আমার কাছে জটিল মনে হচ্ছে রায়মশাই। তাছাড়া সুরজিৎ ঘোষাল সমাজের একজন গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। অবিশ্যি রক্ষিতার ব্যাপারটা তার জীবনে একটা কলঙ্ক। কিন্তু আজকের দিনে হাতে যাদের প্রয়োজনের বেশী পয়সা আছে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঐ ধরণের Vices দেখা দেয়।

কিরীটী এবারে হেসে উঠল।

হাসছেন রায়মশাই, আমার ঐ সব সো-কলড্ হাই সোসাইটির কিছু কিছু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কিছু কিছু ব্যাপার-স্যাপার জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলুন হয়েছে, এমন demoralised হয়ে গেছে সব—

আস্তে ভাদুড়ী মশাই, আস্তে। কিরীটী পূর্ববৎ হাসতে হাসতেই বলল, আপনি যাদের কথা বলছেন তারা ওই সব ব্যাপারকে কোন ব্যাধি, পাপ বা অন্যায় কিছু বলে মনে করেন না। তাছাড়া ওটা এ যুগের একটা কালচারের সামিল।

কালচারই বটে! সে যাক, আপনাকে কিন্তু সুরজিৎ ঘোষালের কেসটা হাতে নিতে হবে।

আপনার কাছ থেকে রেহাই পাবো না বুঝতে পারছি, বলুন সব ব্যাপারটা—আপনি যতদূর জানেন।

সোমনাথ ভাদুড়ী বলে গেলেন সব কথা। কিরীটী নিঃশব্দে শুনে গেল, কোন মন্তব্য করল না। সোমনাথ ভাদুড়ীর কথা শেষ হলে পাইপে টোবাকো ঠাসতে ঠাসতে কিরীটী বলল, তাহলে এখানেও সেই এক নারী ও তিনটি পুরুষের সংযোজন। ট্রায়াঙ্গুলার ব্যাপার। মালঞ্চ দেবীর স্বামী সুশান্ত মল্লিক আর দুজন—সুরজিৎ ঘোষাল ও দীপ্তেন ভৌমিক। তিনজনই চাইত এক নারীকে। সুশান্ত মল্লিক মানে ঐ মালঞ্চর স্বামীটা তো একটা ফুল—নচেৎ স্ত্রীকে একজনের রক্ষিতা হিসাবে allow করে সেই রক্ষিতার আশ্রয়েই থাকতে পারে! তার পয়সায় নেশা করতে পারে! কে জানে, হয়তো সে সত্যি সত্যিই মালঞ্চকে ভালবাসত—

ভালবাসত! না না, ও একটা অপদার্থ।

তবু তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেন না ভাদুড়ীমশাই, এবং বর্তমান মামলায় যে মোটিভ বা উদ্দেশ্য সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেটা ওর দিক থেকে বেশ strong-ই থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। প্রত্যেক হত্যার ব্যাপারেই আপনি তো জানেন আমাদের সর্বাগ্রে তিনটি কথা চিন্তা করতে হয়। প্রথমত, হত্যার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই হত্যার আশেপাশে থাকলে হত্যা করার ব্যাপারে কার কতটুকু Possibility বা সম্ভাবনা থাকতে পারে ও তৃতীয়ত, probability, ওদের মধ্যে কার পক্ষে হত্যা করার সবচাইতে বেশী সুযোগ ছিল।

তাহলে তো রায়মশাই ওদের তিনজনই—

সেইজন্যেই তো বলছিলাম ভাদুড়ীমশাই, যে বাড়িতে হত্যা সংঘটিত হয়েছে ওদের তিনজনের মধ্যে একজন সেখানে থাকত ও অন্য দুজনের সেখানে সর্বদা যাতায়াত ছিল। কাজেই ওদের তিনজনেরই মালঞ্চকে হত্যা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল বলে ওদের যে কোন একজনের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল। আর এই মামলায় আপনার সর্বাপেক্ষা বড় সূত্র এইটিই হবে, তাই সর্বাগ্রে আপনাকে ঐ তিনটি মহাপুরুষের সমস্ত সংবাদ in details সংগ্রহ করতে হবে।

আর কিছু?

একটা কথা ভুলে যাবেন না ভাদুড়ীমশাই, দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। প্রথমে দীপ্তেন ভৌমিক ও তার পরে

সুরজিৎ ঘোষাল মালঞ্চর কাছে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আপাতত যা আমরা জেনেছি সুশান্ত মল্লিক সে রাত্রে ঐ বাড়িতে যে উপস্থিত ছিল না সেটা তার পক্ষে একটা alibi-ও হতে পারে।

কিরীটী বলতে লাগল, সুতরাং সন্দেহের তালিকা বা সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকা থেকে ঐ তিন মহাত্মার একজনকেও আপনি বাদ দিতে পারছেন না আপাতত। All spotted, ওদের প্রত্যেকেরই মালঞ্চকে হত্যা করবার ইচ্ছা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, যদিও অবিশ্যি তার কারণটা একজন থেকে অন্যের পৃথক হতে পারে। তাহলেও একটা কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা ঐ একটি নারীকেই কেন্দ্র করে। কি জানেন ভাদুড়ীমশাই, তাস খেলতে বসে রংয়ের টেক্কা কে হাতছাড়া করতে চায় বলুন। না ভাদুড়ীমশাই, আমার তো মনে হচ্ছে আপনি যতটা ভাবছেন ব্যাপারটা হয়তো ততটা জটিল মানে complicated নয়।

নয় বলছেন ?

হ্যাঁ। কারণ এ মামলায় মোটিভটা যেদিকে থেকেই বিচার করুন না কেন, তিনজনের যে কোন একজনের অ্যাঙ্গেল থেকেই, দেখবেন শেষটায় হয়তো এটাই প্রমাণিত হবে, পাল্লার কাঁটাটা একদিকেই ঝুঁকছে—towards that woman.

আসলে কি জানেন ভাদুড়ীমশাই, সুরজিৎ ঘোষালের মত একজন মানী গুণী সমাজে প্রতিষ্ঠাবান পয়সাওয়ালা ব্যক্তি যদি এই হত্যার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে জড়িত হয়ে না পড়তেন এবং তার সঙ্গে একটা কলঙ্কের ব্যাপার না থাকত তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে যেমন এত হৈচৈ হত না, তেমনি সরকারও এত তেল পোড়াত না।

কি বলছেন আপনি রায়মশাই ?

আমি মিথ্যা বলিনি ভাদুড়ীমশাই, একটু ভেবে দেখলেই আপনিও বুঝতে পারবেন—সমাজে কি আর কারও রক্ষিতা নেই—না কি কারও রক্ষিতাকে হত্যা করা হয়নি ইতিপূর্বে ? ব্যাপারটা সুরজিৎ ঘোষালের মত এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বলেই মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে না জানি কত রহস্যই আছে! অবিশ্যি এও আমি বলব, হত্যা হত্যাই, its a crime and crime must be punished.

রায়মশাই, যতটুকু শুনলেন তাতে করে সুরজিৎ ঘোষালকে আপনার—

দোষী না নির্দোষী কি মনে হয় তাই না আপনার প্রশ্ন ভাদুড়ীমশাই—সেটা তো এই মুহূর্তে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, কারণ আমরা আপাতত যে মোটিভ ভাবছি হত্যার হয়তো সে মোটিভ আদৌ ছিল না। আর সেটার যদি কোন হদিশ পাই তাহলে হয়তো দেখব তিনজনের মধ্যে দুজন সহজেই eliminated হয়ে গিয়েছে, আর সে-রকম হলে হয়তো হত্যার ব্যাপারটাই একটা সম্পূর্ণ অন্য রূপ নেবে, কাজেই সবটাই এখন তদন্ত সাপেক্ষ।

তা ঠিক, তবে আপনাকে ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল—

আপনি black sheepকে ব্যাক করছেন কিনা তাই না ভাদুড়ীমশাই?

তাই—

কিরীটী বললে, সে আরো পরের কথা, আপনি ডিফেন্স কৌসুলি. এগিয়ে যেতে হবে, আপনি আবার দিন কতক বাদে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। অবিশ্যি তেমন কিছু জানতে পারলে আমিও আপনার কাছে যেতে পারি।

তাহলে আজ আমি উঠি—

আসুন, আর যুধাজিৎ বাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

ঠিক আছে।

কিছু দিন যাবৎ কিরীটীর মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা চলছিল, সোমনাথ ভাদুড়ী চলে যাবার পর মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারটা চিন্তা করতে করতে সেটা যেন তার অজ্ঞাতেই আপনা থেকে সক্রিয়তার দিকে মোড় নেয়। এবং প্রথমেই যেটা তার মনে হয়, আঞ্চলিক থানার ও. সি. সুশীল চক্রবর্তীর সাহায্যই তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর একেবারে অপরিচিত নয়, তাছাড়া কিরীটী জানে তার মাথার মধ্যে কিছু বস্তু আছে, তার মস্তিষ্কের গ্রে সেলগুলো সাধারণের চাইতে একটু বেশীই সক্রিয়, তার প্রমাণও কিছু দিন আগে একটা হত্যা মামলার ব্যাপারে পেয়েছিল কিরীটী।

কিরীটী আর দেরি করে না, জংলীকে ডেকে হীরা সিংকে গাড়ি বের করতে বলে দিল।

গায়ে জামা চড়াচ্ছে কিরীটী, কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল।—বেরুচ্ছ নাকি কোথায়?

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। কিরীটী বললে, হ্যাঁ, একবার থানায় যাচ্ছি, সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

মালঞ্চর হত্যা মামলাটা তাহলে তুমি accept করলে ?

কি করি, ভাদুড়ীমশাইকে না করতে পারলাম না।

তা কাল সকালে গেলেই তো হয়।

তা হয়, তবে এখন হয়তো তাকে একটু ফ্রি পাবো।

আসলে কিন্তু কৃষ্ণা খুশিই হয়েছে। ইদানীং তার স্বামীর ঐ ধরণের নিষ্ক্রিয়তা কৃষ্ণার আদৌ যেন ভাল লাগছিল না। মানুষটার হাতে যখনই কোন কাজ থাকে না তখনই তার মুখে এক বুলি—কিরীটী রায় বুড়ো হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণা প্রতিবাদ জানায়, চুল পাকলেই মানুষ কিন্তু বুড়িয়ে যায় না।

কিরীটি হাসতে হাসতে বলে, বয়স হলে বুড়িয়েই যায়।

কত বয়েস হয়েছে তোমার ?

হিসাব করে দেখ সজনী, চৌষট্টি—সিক্সটি ফোর।

তাহলে আমিও তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আমারও তো বয়েস—

কিরীটী বলে উঠেছে, না, তোমার বয়স আমার চোখে বাড়েনি—

আমার চোখেও তুমি বুড়ো হয়ে যাওনি, বুঝেছ—

কৃষ্ণা বললে, বেশী রাত করো না কিন্তু।

না, তাড়াতাড়িই ফিরব।

॥ আট ॥

সুশীল চক্রবর্তী থানাতেই ছিলেন।

কয়দিন ধরে তিনি মালঞ্চর হত্যা ব্যাপারটা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত, এখানে ওখানে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে তাকে। অফিস ঘরে বসে কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন সুশীল চক্রবর্তী। কিরীটীকে ঘরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে তিনি বললেন, একেই বলে বোধহয় মনের টান দাদা, আসুন, আসুন।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, তাই নাকি ?

হ্যাঁ, আজ দুদিন থেকে আপনার কথাই ভাবছিলাম দাদা।

তাই বোধহয় আমারও তোমার কথা মনে পড়ল। তা ব্যাপার কি বল তো, হিন্দুস্থান রোডের মার্ডার কেসটা নাকি ?

হ্যাঁ দাদা—

আমিও কিন্তু এসেছিলাম সেই ব্যাপারেই সুশীল।

সত্যি! বসুন দাদা। তা আমাদের বড় কর্তাদের পক্ষ থেকে, না সুরজিৎ ঘোষালের পক্ষ থেকে?

আপাতত বলতে পারো আমার নিজের পক্ষ থেকেই। এখনো কেসটা আমি কারো পক্ষ থেকেই নিইনি ভায়া।

কেসটা কিন্তু বেশ জটিলই মনে হচ্ছে দাদা—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

সত্যিই জটিল কিনা সেটা জানবার জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি ভায়া, তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে যা তোমার মনে হয়েছে বা হচ্ছে সেটা আমায় বল তো।

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর অনুরোধে সেই প্রথম দিন থেকে মালঞ্চর হত্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা যা জেনেছেন একে একে সব বলে গেলেন এবং বলা শেষ করে বললেন—কি রকম মনে হচ্ছে দাদা, ব্যাপারটা সত্যিই কি বেশ একটু জটিলই নয়?

খুব একটা জটিল বলে কিন্তু মনে হচ্ছে না, ভায়া। কিরীটী বলল, আমি বুঝতে পারছি মালঞ্চ হত্যার বীজটা কোথায় ছিল—

বুঝতে পারছেন?

হ্যাঁ, তুমিও একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে। একটি নারীকে ঘিরে, যে নারীর মধ্যে মনে হয় তীব্র যৌন আকর্ষণ ছিল—এক ধরণের নারী, যারা সহজেই পুরুষের মনকে রিরংসায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, সেইটাই এই হত্যার বীজ হয়ে ক্রমশ ডালপালা বিস্তার করেছিল বলেই আমার অনুমান।

একটু বুঝিয়ে বলুন দাদা—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

তিনটি পুরুষ এক্ষেত্রে—সুরজিৎ ঘোষাল ও দীপেন ভৌমিক দুজন বাইরের পুরুষ আর তৃতীয়জন মালঞ্চর হতভাগ্য স্বামী সুশান্ত মল্লিক ঘরের জন। মালঞ্চর যৌন আকর্ষণে ঐ তিনজন মালঞ্চকে ঘিরে ছিল।

কিন্তু সুশান্ত মল্লিক তো তার স্ত্রীকে—

ভুলে যেও না, স্ত্রী ভ্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও সুশান্ত তার আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, আর পারেনি বলেই তার স্ত্রী অন্যের রক্ষিতা জেনেও সেই স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যেতে পারেনি, হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই পড়ে ছিল। তার স্ত্রী অন্যের রক্ষিতা জেনেও

তারই হাত থেকে প্রত্যহ মদের পয়সা ভিক্ষা করে নিয়েছে।

তারপর—একটু থেমে কিরীটী বলতে লাগল, তার স্ত্রী তার কাছে অপ্রাপনিয়া জেনেও তার মনের রিরংসা তাকে সর্বক্ষণ পীড়ন করেছে। তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। এমনও তো হতে পারে ভায়া, সেই অবদমিত রিরংসা থেকেই কোন এক সময়ে একটা স্ফুলিংগ তার মনের মধ্যে আকস্মিক আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ হত্যাকাণ্ডটা ঘটে গিয়েছে।

কিন্তু যতদূর জানা গিয়েছে ঐ ব্যাপারের তিন দিন আগে থাকতেই সুশান্তবাবু ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল—সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

হ্যাঁ গিয়েছিল, কিন্তু হত্যার পরের দিনই তার প্রত্যাবর্তন। চলেই যদি গিয়েছিল তো আবার ফিরে এলো কেন? এবং ফিরে এলো যে রাত্রে হত্যাটা সংঘটিত হয় তারই পরদিন প্রত্যুষে। এর মধ্যে দুটো কারণ কি থাকতে পারে না?

দুটো কারণ?

হ্যাঁ, প্রথমত, যারা কোন বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য কাউকে হত্যা করে তাদের মধ্যে একটা সাইকোলজি থাকে, হত্যার আনন্দকে চরম আনন্দে তুলে দেবার জন্যে আবার তারা অকুস্থলে ফিরে আসে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সকলের মধ্যে উপস্থিত থেকে সেই চরম আনন্দকে রসিয়ে রসিয়ে উপলব্ধি করবার জন্যে। এবং দ্বিতীয়ত, সুশান্ত মল্লিক হয়তো অকুস্থল থেকে ঘটনার সময় দূরে থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে তার নির্দোষিতাটুকুই, an alibi.

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, আমি দাদা অতটা—

তলিয়ে দেখনি, তাই না ভায়া, কিন্তু কথাটা ভাবা উচিত ছিল নাকি তোমার?

ভাবছি আপনি বুঝলেন কি করে যে সুশান্ত মল্লিককে আমি সত্যি কিছুটা eliminate-ই করেছিলাম—

সে তো তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি যত গুরুত্ব দিয়েছ ঐ দুজনের পরেই—সুরজিৎ ঘোষাল আর দীপ্তেন ভৌমিক। কিন্তু খুনের মামলার তদন্তে অমন বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা তোমার অবহেলা করা উচিত হয়নি।

কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন?

ঐ যে তোমার ঐ সুশান্ত মল্লিকের হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে

অকুস্থলে আবির্ভাব ও তার সেই কথাগুলো—'দরজা আর খুলবে না', রতন আর মানদা যখন কিছুতেই দরজা খোলাতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাটা সে বলল কেন? এমনি একটা কথার কথা না কি জেনে শুনেই সে মালঞ্চর মৃত্যুর ব্যাপারটা ঘোষণা করেছিল? যাকগে, rather late than never তুমি দীপ্তেন ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলেছ?

বলেছি গত পরশুই তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে তো কাছাকাছিই লেক রোডে থাকে, কিন্তু দেখা পাইনি। অফিসের কাজে নাকি তিনি আগের আগের দিন পাটনায় গিয়েছেন আর আজ কালের মধ্যেই তার ফেরার কথা। বলে এসেছি এলেই থানায় রিপোর্ট করতে—

ঐ সময়ে থানার সামনে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল এবং একটু পরেই একজন সুশ্রী ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন।

কি চাই? সুশীল চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন।

এখানকার O. C. কে।

আমিই—বলুন কি দরকার?

আমার নাম দীপ্তেন ভৌমিক।

নামটা কানে যেতেই কিরীটী দীপ্তেন ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে দেখল। বেশ বলিষ্ঠ লম্বা চওড়া চেহারা, সুশ্রীও।

বসুন মিঃ ভৌমিক, সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

আমার খোঁজে আপনি আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। দীপ্তেন বললেন।

হ্যাঁ, আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মালঞ্চ দেবী খুন হয়েছেন—

জানি। যেদিন আমি পাটনায় যাই, সেদিন পাটনাতেই সংবাদপত্রে news-টা পড়েছিলাম।

আপনার সঙ্গে মালঞ্চ দেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল?

তা কিছুটা ছিল।

যে রাত্রে মালঞ্চ দেবী নিহত হন সেদিন সন্ধ্যারাত্রে আপনি ঐ মালঞ্চ দেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

গিয়েছিলাম।

সেখান থেকে কখন চলে এসেছিলেন?

আধঘণ্টাটাক পরেই, কারণ আমার ট্রেন ছিল রাত ন'টা চল্লিশে—

কিরীটী ঐ সময় বললে, কিন্তু মিস্টার ভৌমিক, আপনাকে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে রতন বা মানদা কেউ দেখেনি—

না দেখে থাকতে পারে।

আবার কিরীটীর প্রশ্ন : সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন বোধহয় ?

তা ছাড়া আর কোথা দিয়ে আসব। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো ? আপনাদের কি ধারণা ঐ জঘন্য ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ আছে ?

মনে হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক মিঃ ভৌমিক ? সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

How fantastic—তা হঠাৎ ঐ ধরণের একটা absurd কথা আপনাদের মনে হল কেন বলুন তো অফিসার ?

কিরীটী বললে, যে স্ত্রীলোক একই সঙ্গে দুজন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের লীলা খেলা চালাতে পারে এবং সেখানে যাদের যাতায়াত, তাদের প্রতি ঐ ধরণের সন্দেহ জাগেই, যদি—

কিরীটীকে বাধা দিয়ে দীপ্তেন ভৌমিক বললেন, থামুন। একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, সে রাত্রে আমি ন'টা চল্লিশের ট্রেনে কলকাতা ছেড়ে যাই। আমি কি চলন্ত ট্রেন থেকে উড়ে এসে তাকে হত্যা করে হাওয়ায় উড়তে উড়তে আবার চলন্ত ট্রেনে ফিরে গিয়েছি ? সত্যি মশাই, আপনাদের পুলিশের উর্বর মস্তিষ্কে সবই বোধহয় সম্ভব। ঐ সব আবোল তাবোল কতগুলো প্রশ্ন করার জন্যেই কি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?

Listen দীপ্তেনবাবু, যতক্ষণ না আপনি প্রমাণ করতে পারছেন, কিরীটী বললে, যে সত্যি সত্যিই সে রাত্রে আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে আধঘণ্টার মধ্যে বের হয়ে এসেছিলেন, পুলিশের সন্দেহটা ততক্ষণ আপনার ওপর থেকে যাবে না।

আমি একজন ভদ্রলোক, আমি বলছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয় ?

না মিঃ ভৌমিক, যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট হত যদি ঐ রাত্রেই আপনার বিশেষ ভাবে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ একজন ঐ ভাবে না নিহত হত।

মালঞ্চর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল ঠিকই কিন্তু সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আচ্ছা দীপ্তেনবাবু, কিরীটীর প্রশ্ন, আপনি জানতেন নিশ্চয়ই,

যে মালঞ্চ দেবী, অনেকদিন ধরে সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতা হিসাবে ছিল—

জানব না কেন? জানতাম।

সে ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে মালঞ্চর ঘনিষ্ঠতাটা সুরজিৎ ঘোষাল যে ভাল চোখে দেখতে পারেন না সেটা তো স্বাভাবিক—

আমি অত শত ভাবিনি মশাই, তাছাড়া ভাববার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

ভাবাটা বোধহয় উচিত ছিল, যাক সে কথা। আপনি ভাল করে ভেবে বলুন, কখন কোন্ পথ দিয়ে সে রাতে আপনি সেই বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, এবং কিসে করে ফিরেছিলেন?

আমি ফিরেছিলাম ট্যাক্সিতে—

কেন, আপনার তো গাড়ি আছে—

গাড়ি আমি আগের দিন গ্যারাজে দিয়েছিলাম repair-এর জন্যে, আর আগেই বলেছি, আমি সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলাম।

দীপ্তেনবাবু, আপনি কি মালঞ্চ দেবীকে একটা মুক্তোর হার দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ—

কত দাম সেটার? কিরীটী জেরা করতে থাকে।

হাজার তিনেক—

ঐ রকম দামী জিনিস আরো দিয়েছেন কি তাকে?

দিয়েছি অনেক কিছু, কিন্তু অত দামী জিনিস আগে দিইনি।

তা হঠাৎ অত দামী হার, অন্য একজনের রক্ষিতাকে দিতে গেলেন কেন?

খুশি হয়েছিল দিয়েছি। আর কিছু আপনাদের জিজ্ঞাস্য আছে?

আচ্ছা, আপনার নাম তো দীপ্তেন ভৌমিক, আর কোন নাম নেই আপনার?

মানে?

মানে অনেকের দুটো নাম থাকে, যেমন ডাক নাম, পোশাকী নাম, আলাদা আলাদা—

আছে। আমার ডাকনাম সুন্নু, মা বাবা আমাকে সুন্নু বলে ডাকতেন, আর দাদাকে মন্নু বলে ডাকতেন।

আপনার দাদা বেঁচে আছেন?

হ্যাঁ, ইংলণ্ডে সেটেল্ড—

আপনি নিশ্চয়ই রুমাল ব্যবহার করেন ?

নিশ্চয় করি। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনাদের ? একটু যেন বিরক্তির সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করলেন দীপ্তেন ভৌমিক।

না, আপনি আপাতত যেতে পারেন মিঃ ভৌমিক। সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর চোখের ইশারা পেয়ে ভৌমিককে বললেন।

ধন্যবাদ। চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন দীপ্তেন, তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন একটু যেন দ্রুত পদেই।

ভদ্রলোক থানা থেকে বের হয়ে যেতে সুশীল চক্রবর্তী বললেন, আমি দীপ্তেন ভৌমিকের ওপরে constant watch রাখব ভাবছি দাদা—

ওয়াচ রাখতে হলে শুধু দীপ্তেন ভৌমিক কেন, সে তালিকা থেকে সুশান্ত মল্লিকও বাদ যাবেন না। কিন্তু আমি কি বলছি জানো ভায়া—আজকের সমাজের মানুষ এ কি এক সর্বনাশা পথে ছুটে চলেছে। না আছে কোন সংযম—কোন যুক্তি—কেবল to achieve, এবং মজা হচ্ছে, কি তারা চায়, কি পেলে তারা সুখী-সন্তুষ্ট, সেটা ওদের নিজেদের কাছেও স্পষ্ট নয়। ঐ মালঞ্চ দেবীর কথাই ভাবো না, সুরজিৎ ঘোষালকে নিয়ে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, দীপ্তেন ভৌমিককেও টেনেছিল—যাকগে, আজ উঠি। হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল একবার তোমাদের অকুস্থলটা ঘুরে এলে মন্দ হত না।

বেশ তো, কখন যাবেন বলুন, আমি আপনাকে তুলে নেব'খন। বাড়িটা তো এখন পুলিশ পাহারাতেই আছে।

রতন আর মানদা ?

তারাও আছে।

আর কেউ নেই ?

আছে বৈকি, মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত মল্লিকও তো ঐ বাড়িতেই আছে এখনো।

কিন্তু বাড়িটা এখন কার সম্পত্তি হবে ? মালঞ্চর কোন ওয়ারিশন নেই ?

জানি না। এখনো তো দাবীদার আসেনি

হুঁ। কাল সকালে তুমি ন'টা নাগাদ আসতে পারবে ?

পারব না কেন, যাব।

তাহলে ঐ কথাই রইল, আমি চলি।

কিরীটী থানা থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী চলন্ত গাড়িতে বসে বসে ভাবছিল--মালঞ্চর মৃত্যুটা কি তিনটি পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ঈর্ষা থেকেই ঘটেছে না আরো কিছু ছিল ?

সুরজিৎ ঘোষালের মত লোক ঈর্ষা প্রণোদিত হয়ে তার রক্ষিতাকে খুন করতে পারে কথাটা যেন ভাবা যায় না, অথচ তারই রুমাল মৃতের গলায় পেঁচিয়ে গিঁট বাঁধা ছিল, এবং সে মালঞ্চকে শাসিয়ে ছিল, হত্যার হুমকিও দেখিয়েছিল। সুরজিৎ ঘোষালকে গ্রেপ্তার করার পিছনে পুলিশের ঐটাই জোরালো যুক্তি, সুরজিৎ ঘোষালের কথাগুলো সুশীল চক্রবর্তী মানদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই জেনেছেন।

কিন্তু মানদা আরো বেশী কিছু জানে, কারণ সে ছিল মালঞ্চর পেয়ারের দাসী। অনেক মাইনে পেত সে। মানদা যদিও দীপ্তেন ভৌমিকের কথাটা স্বীকার করেনি তবু সে-ই তার মনিবের কর্ণগোচর করেছে বলে কিরীটীর ধারণা, সেটা মানদারই কাজ। মানদা গাছেরও খেত তলারও কুড়াত।

কিরীটীর আরো মনে হয় দীপ্তেন ভৌমিক সত্যি কথা বলেননি।

কিরীটী জানত না যে দু'দিন পরেই সে দীপ্তেন ভৌমিক সম্পর্কে এক চমকপ্রদ সংবাদ শুনবে সুশীল চক্রবর্তীর কাছ থেকে, এবং সে সংবাদ পাওয়ার পর মালঞ্চর হত্যা ব্যাপারটা সত্যিই জটিল হয়ে উঠবে

॥ নয় ॥

পরের দিন সোয়া ন'টা নাগাদ সুশীল চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন কিরীটীর বাড়িতে।

কিরীটী প্রস্তুত হয়েই ছিল, সুশীল চক্রবর্তীর জীপে উঠে বসল।

হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির দরজায় দুজন সেপাই পাহারায় ছিল এবং একজন অন্দরে ছিল। জীপ থেকে সুশীল চক্রবর্তীকে নামতে দেখে তারা সেলাম জানাল। কিরীটীকে নিয়ে সুশীল চক্রবর্তী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রথমেই ওরা সুশান্ত মল্লিক যে ঘরটায় থাকে সেই নীচের ঘরটায় উঁকি দিলেন। সুশান্ত মল্লিককে ঘরের মধ্যে দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে জীপের শব্দে রতন ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। সুশীল চক্রবর্তী রতনকেই প্রশ্ন করলেন, সুশান্তবাবুকে দেখছি না, কোথায় তিনি ?

আজ্ঞে সকালে যখন চা দিই তখন তো ছিলেন। তবে গতকাল তিনি বলেছিলেন, এ বাড়িতে তিনি আর থাকবেন না, চলে যাবেন।

কেন, তার কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি ?

না বাবু, অসুবিধা হবে কেন। মানদার হাতেই তো সংসার খরচের টাকা থাকত, এখন যা আছে এ মাসটা চলে যাবে। তবে, ওনার তো আবার বোতলের ব্যাপার আছে সন্ধ্যাবেলা—মানদা তো সে সব কিছু দিচ্ছে না বোধহয় সেজন্যেই—

সুশীল চক্রবর্তী হাসলেন। ঠিক সেই সময় দেখা গেল সুশান্ত মল্লিক দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সুশীল চক্রবর্তীকে দেখে সুশান্ত বললে, এই যে দারোগাবাবু, আপনি আমার ওপরে কেন জুলুম করছেন বলুন তো ?

জুলুম !

নয় ! বাড়ি থেকে বেরুতে পারব না। এটা জুলুম ছাড়া আর কি বলুন তো ?

কিরীটী চেয়ে চেয়ে দেখছিল লোকটাকে। মুখে বেশ দাড়ি গজিয়েছে খোঁচা খোঁচা। বোধহয় কয়েকদিন কোন ক্ষৌরকর্ম না করায়। পরনের জামা ও পায়জামাটা ময়লা। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মনে হয় অনেকদিন চিরুনীর স্পর্শও পড়েনি।

কিরীটী চুপি চুপি সুশীল চক্রবর্তীকে বললে, এই বোধহয় মালঞ্চর স্বামী ?

হ্যাঁ দাদা।

লোকটাকে ছেড়ে দাও। তবে নজর রেখো—

কিন্তু দাদা, যদি ভাগে, আমি তো ভেবেছিলাম এবারে ওকে এ্যারেস্ট করব। নিম্ন কণ্ঠে কথাগুলো বললেন সুশীল চক্রবর্তী।

সুশান্তবাবু—

কিরীটীর ডাকে সুশান্ত মল্লিক তাকাল ভ্রূকুটি করে।

আপনাকে আমরা ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে পারি যদি ঠিক ঠিক আপনার কাছ থেকে যেগুলো জানবার জন্যে এসেছি সেগুলোর জবাব দেন।

মানে !

মানে আপনি সেদিন যে সব কথা বলেছেন, সব আমরা একেবারে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিতে পারছি না। কিরীটীই জবাব দিল।

আমি কিছু জানি না—বলতে বলতে কিছুক্ষণ কিরীটীর দিকে তাকিয়ে থেকে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সুশান্ত মল্লিক।

সুশীল চক্রবর্তী ঐ ঘরের দিকেই এগুচ্ছিলেন কিন্তু বাধা দিল কিরীটী বললে, আগে চল সুশীল, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখি, আর সেই ঘরটা—

সুশীল চক্রবর্তী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীর পিছনে এগোলেন। হঠাৎ নজর পড়ল কিরীটীর নীচের একটা তালাবন্ধ ঘরের বন্ধ জানালার দিকে - কবাট দুটো ঈষৎ ফাঁক, আর সেই সামান্য ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে চোখ। সেই চোখের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি। কিরীটী থমকে দাঁড়াল।

কিরীটীকে থামতে দেখে সুশীল বললেন, কি হল দাদা, ওপরে চলুন—

সুশীল, চল তো নীচের ঐ ঘরটা আগে দেখি। বলে বন্ধ দরজার ঘরটা কিরীটী দেখিয়ে দিল।

ঐ তালাবন্ধ ঘরটা ?

হ্যাঁ। চাবি নেই তোমার কাছে ?

না তো।

তাহলে ঐ ঘরের তালার চাবি কোথায় পাওয়া যাবে ?

ওদের কাছেই অল্প দূরে রতন দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে সুশীল চক্রবর্তী শুধালেন, ঐ ঘরের তালার চাবি কোথায় ?

তা তো জানি না হুজুর—

ঐ ঘরে তালা দেওয়া কেন ?

তা জানি না হুজুর, ঐ ঘরটা তালা দেওয়াই থাকে, বরাবর—

মানদাকে ডাকো তো, সে হয়তো জানে ঐ ঘরের তালার চাবি কোথায় ?

ঠিক ঐ সময় মানদাকে দোতলার সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল। রতন মানদাকে দেখতে পেয়ে বলল, বাবু, ঐ যে মানদা—

বলতে বলতেই মানদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে।

মানদা, ঐ ঘরের তালার চাবিটা কোথায় ?

আমি তো জানি না বাবু। মানদা বলল।

ঐ ঘরের তালার চাবিটা কোথায় তুমি জানো না? কিরীটীর আবার প্রশ্ন।

না, আমি এখানে আসা অবধি দেখছি, ঐ দরজায় ঐ ভাবেই তালা ঝোলে।

কখনো কাউকে দরজা খুলতে দেখনি?

না বাবু—

কিরীটী এবার সুশীল চক্রবর্তীর দিকে তাকাল সুশীল, তোমার কাছে তো সেই চাবির রিংটা আছে, সঙ্গে এনেছ?

হ্যাঁ, এই নিন সুশীল চক্রবর্তী অনেকগুলো চাবি সমেত একটা রূপোর চাবির রিং পকেট থেকে বের করে কিরীটীর হাতে তুলে দিল। কিন্তু রিংয়ের কোন চাবির সাহায্যেই ঘরের তালাটা খোলা গেল না। এমন কি চাবির থোকার কোন চাবিই তালাতে প্রবেশ করানোও গেল না। অথচ তালাটা দেখে কিরীটীর মনে হয় তালাটা সর্বদাই খোলা হয়। তালাটার চেহারা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার মত নয়।

কোন চাবিতেই তো তালাটা খুলছে না দাদা।

কোন চাবি না লাগলে আর কি করা যাবে, তালাটা ভাঙতে হবে—কিরীটী শান্ত গলায় কথাগুলো বলে পর্যায়ক্রমে একবার অদূরে দণ্ডায়মান রতন আর মানদার মুখের দিকে তাকাল।

গডরেজের মজবুত বড় তালা, তালাটা ভাঙা অত সহজ হল না। একটা লোহার রড দিয়ে প্রায় ১৫।২০ মিনিট ধস্তাধস্তি করার পর তালাটা ভাঙা গেল, তাও দুজন সিপাইয়ের সাহায্যে। এবং অত যে শব্দ করে তালাটা ভাঙা হল তবু ঠিক তার পাশের ঘরে থেকেও সুশান্ত মল্লিকের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না বা সে এসে ব্যাপারটা জানবারও কোন চেষ্টা করল না।

ঘরটা অন্ধকার ছিল, জানালা দরজা বন্ধ থাকায় কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীকে বলল, দেখ তো সুশীল, ঘরের আলোর সুইচটা কোথায়—

হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচটা পাওয়া গেল। খুট করে সুইচ টিপতেই একটা ডুমে ঢাকা একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল।

ঐ ঘরটা ঠিক মালঞ্চর দোতলার শোবার ঘরের নীচেই। পরে সেটা বুঝেছিল কিরীটী। মাঝারী সাইজের ঘরটি, ঘরের মধ্যে মাত্র একটি দেওয়াল আলমারী, তার পাল্লায় চাবি লাগানো। এ ছাড়া

ঘরের মধ্যে আর অন্য কোন আসবাবপত্র নেই।

দেখলে মনে হয় ঘরটা কেউ কখনও ব্যবহার করে না। গোটা চারেক জানালা, সব জানালারই পাল্লা বন্ধ। দুটি দরজা, যে দরজার তালা ভেঙে একটু আগে তারা প্রবেশ করেছে তার ঠিক উল্টো দিকে আর একটা দরজা।

দরজাটা খোলাই ছিল, এবং পাল্লা ধরে টানতেই খুলে গেল। দরজাটার পিছনে একটা সরু ফালি মত যাতায়াতের পথ এবং সেই পথের ওপরেই মেথরদের দোতলায় যাবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

কিরীটীর বুঝতে কষ্ট হয় না ব্যাপারটা। সে ভুল দেখেনি, কিছুক্ষণ আগে ঐ ঘরের ঈষৎ ফাঁক করা জানালার কপাটের আড়াল থেকে যে চক্ষুর দৃষ্টি সে দেখেছিল, সে যে-ই হোক, এই ঘরের মধ্যেই সে ছিল এবং পিছনের ঐ দরজা পথেই সে অন্তর্হিত হয়েছে।

সুশীল

কিছু বলছেন দাদা?

এখন বুঝতে পারছ তো, সে রাত্রে এই গলিপথ দিয়েই দীপেন ভৌমিক সকলের অজ্ঞাতে বের হয়ে গিয়েছিল।

ঐ সিঁড়িটা দিয়ে?

খুব সম্ভবত, কিরীটী বললে, হ্যাঁ, সে রাত্রে ঐ সিঁড়ি দিয়েই দীপেন মালঞ্চর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। আর আজ কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের মধ্যে যে ছিল সে-ও ঐ সিঁড়ি ব্যবহার করেছে—

এই ঘরের মধ্যে কেউ ছিল নাকি?

হ্যাঁ। আর এ বাড়িতে এখন যারা আছে সে তাদেরই মধ্যে একজন কেউ

কে বলুন তো দাদা?

জানি না, তবে এ সময় এই ঘরের মধ্যে সে কেন এসেছিল তাই ভাবছি—

হয়তো আমাদের প্রতি নজর রাখবার জন্যে

না। আমার ধারণা তার এ ঘরে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল এবং আমাদের সাড়া পেয়ে এবং জানালার কপাট ঈষৎ ফাঁক করে আমাদের দেখতে পেয়েই সরে পড়েছে। তবে বাড়ির বাইরে সে নিশ্চয় যায়নি। চল তো, ঘরের আলমারিটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

ঐ চাবির রিংয়ের মধ্যেরই একটা চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেলা গেল। একটা তাকে থরে থরে সাজানো কতকগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স। অনেকটা সিগ্রেটের বাক্সর মত।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স নিয়ে বাক্সর ঢাকনাটা তুলতেই দেখা গেল তার মধ্যে সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো সব লম্বা লম্বা সিগ্রেট।

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এ সব তো সিগ্রেট দেখছি—

কিরীটী কোন কথা না বলে একে একে সব বাক্সগুলোই খুলে ফেলল। গোটা দশেক বাক্সর মধ্যে ছ'টা খালি, বাকি চারটের মধ্যে সিগ্রেট রয়েছে, তার মধ্যে একটায় অর্ধেক।

কি ব্যাপার বলুন তো দাদা, এখানে এই আলমারীতে এত সিগ্রেট কেন ?

আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তো—কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলল, এগুলো সাধারণ সিগ্রেট নয় সুশীল, এগুলো মনে হচ্ছে নিষিদ্ধ নেশার সিগ্রেট—'ছ্যাসহিস'—চরস ইত্যাদি দিয়ে সে সব নেশার জন্য তৈরি সিগ্রেট গোপন পথে চলাচল করে এগুলো তাই— সেই জাতীয় সিগ্রেট — নিষিদ্ধ বস্তু।

সুশীল চক্রবর্তী নিঃশব্দে সিগ্রেটগুলোর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে।

কিরীটী বললে, মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে থেকে এই নিষিদ্ধ বস্তুর লেনদেন হত। আমি ভাবছি সুশীল, শেষ পর্যন্ত এর মধ্যেই মালঞ্চর হত্যার বীজ লুকিয়ে ছিল না তো।

এই সিগ্রেটের মধ্যে ?

হ্যাঁ। এই সিগ্রেটকে কেন্দ্র করেই হয়তো মৃত্যু গরল ফেনিয়ে উঠেছিল। এগুলো নিয়ে চল। আর এই সিগ্রেটগুলোর মধ্যে থেকে আজই একটা এ্যানালিসিসের জন্যে পাঠিয়ে দাও।

তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, হয়তো এগুলো সরাবার জন্যেই এখানে সে এসেছিল আজও। কয়দিন ধরেই হয়তো চেষ্টা করছিল এগুলো সরাবার, কিন্তু চাবির রিং তোমার পকেটে থাকায় সুবিধা করতে পারেনি চল, এবার ওপরে যাওয়া যাক।

সুশীল চক্রবর্তী ভাঙা দরজাটার দিকে এগুচ্ছিলেন। কিরীটী বাধা দিয়ে বললে, না ও দরজা দিয়ে না, চল, পিছনের দরজা দিয়ে

বেরিয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে আমরা ওপরে যাব—

সেই মতই ওরা ওপরে উঠে এলো, লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পথে

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়। দেখা গেল নীচের সেই ঘরটার ওপরের ঘরটাই মালঞ্চর শয়নকক্ষ। বাথরুম দিয়েই ওরা ঘরে ঢুকল, দরজা খোলাই ছিল বাথরুমের।

দাদা, আপনি সত্যিই নীচের ঘরে কাউকে দেখেছেন ?

একটি চক্ষু—শ্যেন দৃষ্টি ছিল সেই চোখের তারায়—কিরীটী বললে, চোখাচোখি যখন একবার হয়েছে তখন পালাতে সে পারবে না। চল, ঘরের ভিতরটা আর একবার আজ দুজনে মিলে খুঁটিয়ে দেখা যাক।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিরীটীর নজর পড়ল ঘরের মধ্যে এ্যাশট্রেটার ওপর—সোফাসেটের মাঝখানে একটি ছোট ত্রিপয়ের ওপরে বেলজিয়াম কাট গ্লাসের সুদৃশ্য একটি এ্যাশট্রে, তার মধ্যে চার পাঁচটা দগ্ধাবশেষ সিগ্রেটের টুকরো পড়ে আছে। একটা টুকরো হাতে তুলে নিয়ে কিরীটী দেখল—বিলাতী সিগ্রেট—স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫।

সুশীল, তোমার নিহত নায়িকার ধূমপানের অভ্যাস ছিল নাকি ?

জানি না তো—

জিজ্ঞাসা করনি ?

না।

জিজ্ঞাসা করাটা উচিত ছিল ভায়া। তার যদি ধূমপানের অভ্যাস না থাকে তবে এগুলো কার সিগ্রেটের দগ্ধাবশেষ ? হয় সুরজিৎ ঘোষালের না হয় দীপেন ভৌমিকের নিশ্চয়।

সুশান্ত মল্লিকেরও তো হতে পারে দাদা—

মনে হয় না। কারণ যে পরমুখাপেক্ষী তার ভাগ্যে স্মাগ্‌ল করা বিলাতী সিগ্রেট জুটত বলে মনে হয় না। স্পেশাল ব্র্যাণ্ডের সিগ্রেট যখন, তখন এই বঁড়শীর সাহায্যেই মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় টেনে তোলা কষ্টকর হবে না—কথাগুলো বলে কতকটা যেন আপন মনেই কিরীটী ঘরের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। সুশীল চক্রবর্তীর মুখে শোনা ঘরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সব কিছু।

সুশীল, তুমি এই ঘরের বাইরে থেকে লক করে গেলেও এ ঘরে প্রবেশাধিকার তুমি বন্ধ করতে পারনি, বুঝতে পারছ বোধহয়। কই—দেখি তোমার চাবির গোছা—

সুশীল চক্রবর্তী পকেট থেকে চাবির রিংটা কিরীটীর হাতে তুলে দিলেন।

ঐ আলমারির চাবি কোন্‌টা সুশীল ?

সুশীল চাবিটা দেখিয়ে দিলেন এবং চাবির সাহায্যে কিরীটী আলমারিটা খুলে ফেলল। দুটি ড্রয়ার। দুটি ড্রয়ারই একে একে খুলে তার ভেতরের সবকিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কিরীটী।

কিন্তু ড্রয়ারের মধ্যে সুশীল চক্রবর্তী সেদিন অনুসন্ধান চালিয়ে যা পেয়েছিলেন তার চাইতে বেশী কিছু পাওয়া গেল না। কিরীটী তবু অনুসন্ধান চালিয়ে যায়….।

কি খুঁজছেন দাদা ? সুশীল প্রশ্ন করল।

ব্যাঙ্কের পাশ বই। মালঞ্চর নিশ্চয়ই একাধিক ব্যাঙ্কে একাউণ্ট ছিল।

একটা তো পেলেন।

যেখানে নিষিদ্ধ চোরাই দ্রব্যের কারবার সেখানে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স মাত্র হাজার ২।৩ থাকাটা ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। চোরাই কারবারের লেনদেনের নিট ফল অত সামান্য তো হতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কিরীটীর অনুমানই ঠিক। মালঞ্চর নামে চার পাঁচটা ব্যাঙ্কের পাশ বই পাওয়া গেল। কিছু ফিক্সড্ ডিপোজিটেরও কাগজপত্র পাওয়া গেল সেই সঙ্গে।

সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এ যে দেখছি অনেক টাকা দাদা—

কিরীটী বলল, হ্যাঁ, যোগফল তাই দাঁড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে বেশ জটিলই হয়ে উঠল সুশীল—চোরা কারবার, হত্যা, সুন্দরী এক নারী, তিনটি পুরুষ মক্ষিকা সেই নারীকে ঘিরে, ভুলে যেও না।

ব্যাঙ্কের পাশবইগুলো সঙ্গে নিয়ে ওরা দুজনে দোতলা থেকে আগের সিঁড়ি পথেই নীচের তলায় নেমে এসে সুশান্ত মল্লিকের ঘরে ঢুকল।

সুশান্ত মল্লিক তার ঘরের মধ্যে বসে ধূমপান করছিল ; সামনেই চৌকির ওপরে একটা সোনার সিগ্রেট কেস ও একটা ম্যাচ। ওরা ঘরে ঢুকতেই সুশান্ত মল্লিক ওদের দিকে তাকাল। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সুশান্ত মল্লিক একটু যেন বিরক্তই হয়েছে, কিন্তু কোন কথা বলল না।

কি সুশান্তবাবু, কি ঠিক করলেন? কিরীটী বলল।

কিসের কি ঠিক করব?

পুলিশকে সাহায্য করলে হয়তো আপনি এই ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পেলেও পেয়ে যেতে পারেন।

আমি যা জানি সবই তো বলেছি—

কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমাদের আরো যে কিছু জানবার আছে সুশান্তবাবু—কিরীটী বলল।

আমি আর কিছুই জানি না।

বেশ, তাই না হয় মেনে নিলাম। এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন।

কি প্রশ্ন?

মালঞ্চ নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করতেন, গাড়ি নিয়ে তিনি মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই বেরুতেন, তিনি কোথায় যেতেন জানেন?

সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতো হয়তো।

আর কোথাও যেতেন না—যেমন ধরুন কোন ক্লাব বা রেস্তোঁরা—

একটা নাইট ক্লাবে মাঝে মধ্যে সে যেতো জানি। ক্লাবটা বালীগঞ্জ সারকুলার রোডে—

হুঁ। বুঝেছি। ক্লাবটার নাম দি রিট্রিট, তাই না? A notorious night club! আচ্ছা, মালঞ্চ দেবী ড্রিংক করতেন না মিঃ মল্লিক?

করত বোধহয়—

আপনি দেখেন নি কখনো?

সামান্য বেসামাল অবস্থায় মাঝে মধ্যে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখেছি তাকে, কিন্তু মদ্যপান করতে দেখিনি।

দীপ্তেনবাবু আর সুরজিৎ ছাড়া অন্য কোন পুরুষের এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল কি?

সমীর রায় নামে একজন বিলেত ফেরত ডাক্তার আর এক তরুণ মাড়োয়ারীকে কালেভদ্রে এখানে আসতে দেখেছি।

আর কেউ?

একজন অভিনেত্রী দু-একবার এসেছে—

কি নাম তার?

ডলি দত্ত, বোধহয় তার নাম।

আচ্ছা, মালঞ্চ দেবী ধূমপান করতেন?

কখনো দেখিনি—

হুঁ। আপনি এ বাড়ি থেকে বেরুতে চান মাঝে মধ্যে—তাই না সুশান্তবাবু? কিরীটী বলল।

মাঝে মধ্যে না। আমি একেবারেই চলে যেতে চাই। আপনারা না আটকালে চলে যেতামও, সুশান্ত মল্লিক বলল।

কিন্তু যাবেন কোথায়?

যা হোক একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে থাকবার—

কেন, এই বাড়িটা তো আপনার স্ত্রীরই নামে।

দপ্ করে যেন সুশান্ত মল্লিক জ্বলে উঠল, কি বললেন, স্ত্রী! কে আমার স্ত্রী—ঐ বাজারের বেশ্যাটা! হ্যাঁ, বলতে পারেন অবিশ্যি সেই স্ত্রীলোকটারই কাছে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে আজো বেঁচে আছি আমি, কিন্তু আর না। তারপরই একটু থেমে ভাঙা গলায় সুশান্ত মল্লিক বলল, চলে যেতাম অনেক আগেই, কিন্তু কেন পারিনি জানেন? যখনই ভেবেছি ওই বোকা মেয়েটার দেহটাকে দশজনে খুবলে খুবলে খাচ্ছে তখনই মনে হয়েছে এই ছেঁড়াছিঁড়ি একদিন ওকে শেষ করে দেবে। আর দেখলেন তো, হলও তাই। কিন্তু কি হল, একেবারেই পারলাম না তো ওকে রক্ষা করতে—

শেষের দিকে কিরীটীর মনে হল যেন কান্না ঝরে পড়ছিল সুশান্ত মল্লিকের কণ্ঠ থেকে।

কিরীটী বলল, সুশান্তবাবু, সেদিন সকালবেলা যখন মালঞ্চর ঘরের দরজা খুলছিল না, আপনি কেন তখন রতনকে বলেছিলেন মালঞ্চ দেবী শেষ হয়ে গিয়েছেন?

বলেছিলাম নাকি! আমার ঠিক মনে নেই—

হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন। আচ্ছা, আর একটা কথা সুশান্তবাবু, কিরীটী বলল, ঐ দুর্ঘটনার আগে হঠাৎ কেন আপনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন?

বুঝতে পেরেছিলাম এ বাড়িতে আর আমার থাকা হবে না, কারণ মালঞ্চ তা চায় না—

মালঞ্চ কিছু বলেছিলেন?

হ্যাঁ—

কি বলেছিলেন?

সুশান্ত মল্লিক সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা বলে গেল। তারপর বলল,

আপনিই বলুন মশাই, তারপরও কি থাকা যায় ?

তবে আবার এখানে ফিরে এলেন কেন ?

ফিরে আসতাম না, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন আমার মন বলছিল, তার বড় বিপদ, আর আমার মন যে মিথ্যা বলেনি, সে তো প্রমাণিতই হয়েছে।

তা বটে! তা ঐ দুটো রাত কোথায় ছিলেন আপনি ?

পথে পথে, আর কোথায় থাকব। আমার আবার জায়গা কোথায় ?

আচ্ছা সুশান্তবাবু, আপনর স্ত্রীর হত্যার ব্যাপারে কাউকে আপনি সন্দেহ করেন ? কিরীটীই পুনরায় প্রশ্নটা করল।

না, তবে ঐ ধরনের মেয়েছেলেদের শেষ পরিণাম ঐ রকমই যে হবে অর্থাৎ অপঘাত মৃত্যু. তা আমার জানা ছিল।

ঠিক আছে সুশান্তবাবু, আপনি বেরুতে পারেন—অবশ্যই যদি আপনি কথা দেন যে পুলিশের অনুমতি ছাড়া এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

তাই হবে। আর যাবই বা কোথায়—যতদিন না একটা আস্তানা মেলে মাথা গুঁজবার মত।

হঠাৎ সুশান্ত বলে ওঠে, ঐ মানদা, ওকে একদম বিশ্বাস করবেন না মশাই, She is a dengerous type !

কিরীটী মৃদু হাসে। সুশান্ত বলে, আপনি হাসছেন স্যার, ঐ ধরনের উয়োম্যানরা can do anything for money.

তার মানে আপনি কি বলতে চান ওকে টাকা দিয়ে—

কিছুই আমি বলতে চাই না স্যার, শুধু বলছিলাম ওর ওপরে নজর রাখবেন।

দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে সুশীল বললেন, লোকটা মনে হচ্ছে একটা বাস্তু ঘুঘু—

সুশান্ত মল্লিকের ওপরে নজর রেখেছ তো ?

হ্যাঁ, বিনোদকে বলেছি—

॥ দশ ॥

মানদা আর রতন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে কি সব কথাবার্তা বলছিল নিজেদের মধ্যে। ওদের দেখেই চুপ করে গেল।

কিরীটীর ইঙ্গিতে সুশীল মানদাকে বললেন, মানদা, এই ভদ্রলোক তোমাকে ক'টা প্রশ্ন করতে চান, ঠিক ঠিক জবাব দেবে—

কেন দেবো না বাবু, সত্যি কথা বলতে মানদা ডরায় না, তেমন বাপে জন্ম দেয়নি মানদাকে।

রতন, তুমি নীচে যাও, ডাকলে এসো। সুশীল বললেন।

যে আজ্ঞে। রতন নীচে চলে গেল।

মানদা, তোমার মা তো নিজের ড্রাইভ করতেন? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, মা খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারত বাবু।

প্রায়ই তোমার মা গাড়ি নিয়ে বেরুত, তাই না?

প্রায় আর বেরুবে কি করে, বাবু আসতেন তো সন্ধ্যার সময়, রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকতেন, তবে যদি কখনো তাড়াতাড়ি চলে যেতেন, মা গাড়ি নিয়ে বেরুত তাছাড়া বাবু বাইরে-টাইরে গেলে বেরুত।

তোমার মা কোথায় যেতো জানো?

কি একটা ক্লাবে যেতো শুনেছি। নাম জানি না।

কখন ফিরত?

তা রাত সাড়ে বারোটা, দেড়টার আগে ফিরত না।

তোমার মা মদ খেতো?

খেতো বৈকি, তবে খেতে দেখিনি।

যদি দেখনি তবে জানলে কি করে তোমার মা মদ খেতো? কিরীটী শুধালো।

আজ্ঞে বাবু, তা কি আর জানা যায় না। মাঝে মাঝে ক্লাব থেকে ফিরে এলে আমি যখন দরজা খুলে দিতাম মার মুখ থেকে ভর ভর করে গন্ধ বেরুত। তাছাড়া টলতেও দেখেছি মাকে—

তোমার মা সিগ্রেট খেতো?

হ্যাঁ তবে বেশী নয়। মাঝে মধ্যে কখনো সখনো একটা-আধটা খেতে দেখেছি।

ডাক্তার সমীর রায়কে তুমি চেনো মানদা?

এখানে তো প্রায়ই কে এক ডাক্তারবাবু আসতেন, নাম জানি না,

তবে মা তাকে ডাঃ রায় বলে ডাকতেন।

তোমার বাবু জানতেন যে ঐ ডাক্তারবাবু এখানে আসতেন ?

জানবেন কি করে—বাবু যখন থাকতেন না তখনই তো ডাক্তারবাবু আসতেন।

আর একজন মারোয়াড়ী—অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক ?

হ্যাঁ, আগরওয়ালা বলে একজন আসতেন মাঝে মধ্যে।

ডলি দত্তকে জানো ? ওই ফিল্ম এ্যাকট্রেস, ছবি করে ?

হ্যাঁ, সেও তো আসত এখানে। ঐ ডাক্তারবাবুর সঙ্গেই আসত।

আচ্ছা, যে রাতে তোমার মা খুন হয়, সে রাত্রে তো তোমার বাবু আর দীপ্তেনবাবু দুজনেই এ বাড়িতে এসেছিলেন, তাই না ? কিরীটীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, আগে দীপ্তেনবাবু, আর তাই নিয়েই তো বাবুর সঙ্গে রাগারাগি. বাবু বলেছিলেন মাকে খুন করবেন।

তোমার বাবু যখন ওকে শাসাচ্ছিল তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

দরজার বাইরে।

আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছিলে বুঝি ?

হ্যাঁ। বাবু যে বলেছিল মায়ের ওপরে সর্বদা নজর রাখতে।

তাহলে এ বাড়িতে যা হত তুমিই সে সব কথা তোমার বাবুকে বলতে ?

তা বলব না—বাবু তো ঐ জন্যেই আমাকে রেখেছিলেন।

তোমার বাবু তাহলে তোমার মাকে সন্দেহ করতেন ?

তা সন্দেহের মত কাজ করলে সন্দেহ করবে না লোকে।

তা বটে! কিরীটী হাসল।

মানদা—কিরীটী আবার প্রশ্ন করল, তুমি কোন্ ঘরে থাকো ?

আজ্ঞে নীচের একটা ঘরে—

যে রাত্রে তোমার মা খুন হয়, সে রাত্রে রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তুমি কি করছিলে ? মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার ?

বাবু রাগারাগি করে চলে যাবার পর রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা পর্যন্ত নীচেই ছিলাম। ভেবেছিলাম মা হয়তো গাড়ি নিয়ে বেরুবে, কিন্তু তা যখন বের হল না বুঝলাম আর বেরুবে না, তখন ওপরে তাকে খাবার কথা বলতে যাই—

গিয়ে কি দেখলে ?

মার ঘরের দরজা বন্ধ।

তারপর ?

ডাকাডাকি করলাম, মা তখন বললেন, তিনি খাবেন না, আর আমাদের খেয়ে নিতে বললেন।

তোমার মার গলার স্বর স্পষ্ট শুনেছিলে ?

মার গলার স্বর সামান্য একটু জড়ানো ছিল, তবু ঠিক মার গলাই শুনেছি। তারপর নিচে গিয়ে আমি আর রতন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি

ওপরের তলায় কোন শব্দ-টব্দ কিছু শোননি সে রাত্রে ?

না।

ঠিক আছে, তুমি রতনকে এবারে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে রতন এলো !

কিরীটীই প্রশ্ন করে, রতন, সে রাত্রে তুমি কখন শুয়েছিলে

বোধহয় তখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজতে শুনেছিলাম

সেটা যে সাড়ে এগারোটাই তা কি করে বুঝলে, সাড়ে বারোটা বা দেড়টাও তো হতে পারে।

মানদাও বলেছিল, বলেছিল রাত সাড়ে এগারোটা বাজল রতন।

আচ্ছা রতন, পরের দিন তুমি কখন সদর খোল ?

যখন থানায় খবর দিতে যাই।

তা তোমার বাবুকে আগে ফোনে খবর না দিয়ে তুমি থানায় গেলে কেন ?

আজ্ঞে মানদাই যে বললে—

হুঁ, আচ্ছা রতন, নীচের যে ঘরটায় সর্বদা তালা দেওয়া থাকত সেটা তুমি কাউকে খুলতে দেখেছ কখনো ?

মার কাছেই চাবি থাকত, মা-ই মাঝে মধ্যে খুলতেন, আর কাউকে আমি ঐ ঘরের দরজা খুলতে দেখিনি বাবু।

তোমার কৌতূহল হয়নি কখনও—ঘরে কেন সর্বদা তালা দেওয়া থাকে ?

না।

মানদা কখনও ঐ ঘরে ঢোকেনি ?

না, দেখিনি বাবু।

মানদা ও রতনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীকে

নিয়ে আবার সারা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল। বাড়ি থেকে বের হয়ে জীপে উঠে কিরীটী বলল, সুশীল, তোমায় একটা কাজ করতে হবে—

কি বলুন দাদা?

ডাঃ সমীর রায় আর ঐ অভিনেত্রী ডলি দত্ত—ওদের একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। কাল পরশু যখন হোক ওদের থানায় ডেকে আনাতে পারো?

থানায়?

হ্যাঁ। কিম্বা এক কাজ কর, তোমাদের ডি-সি ডি-ডি মিঃ চট্টরাজকে আমার কথা বলে বল ওদের লালবাজারে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে।

সেই বোধহয় ভাল হবে দাদা, আপনি বরং ফোনে মিঃ চট্টরাজকে বলুন, আমি আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এখুনি লালবাজার যাচ্ছি।

ভাল কথা। তোমার ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসেছে?

সে তো কালই এসে গেছে, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি।

ফোরেনসিক রিপোর্ট, ভিসারা ও অন্যান্য জিনিসের?

না, এখনও আসেনি, তবে আশা করছি দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যাবে।

ডি-সি ডি-ডি মিঃ চট্টরাজকে বলতেই তিনি ডাঃ সমীর রায় ও ডলি দত্তকে লালবাজারে ডেকে আনবার ব্যবস্থা করলেন, এবং কিরীটী ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে শুনে আরও খুশি হলেন।

লালবাজার থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে হয়ে গেল সুশীল চক্রবর্তীর। থানায় ঢুকে তিনি দেখেন কিরীটী তার ঘরে বসে আছে।

এ কি দাদা, আপনি কতক্ষণ! সুশীল চক্রবর্তী বললেন।

মিনিট দশেক। কই দেখি তোমার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট—

সুশীল চক্রবর্তী পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, শ্বাসরোধ করেই হত্যা করা হয়েছে, এবং মৃত্যুর সময় সম্ভবত সাড়ে এগারো থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কোন এক সময়।

শরীরের কোথাও বিশেষ কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি যাতে করে প্রমাণিত হতে পারে মৃত্যুর পূর্বে নিহত ব্যক্তি কোন রকম

স্ট্রাগ্‌ল্ করেছিল। মৃতের হাতে এবং পায়ে অনেকগুলো কালো কালো চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আর ভিসারার রিপোর্ট এখনও আসেনি।

আচ্ছা দাদা, সুশীল চক্রবর্তী বললেন, হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে যে বাক্স ভরা সিগ্রেট পাওয়া গিয়েছে, আপনি বলেছিলেন, ওগুলি সম্ভবত নিষিদ্ধ নেশার সিগ্রেট—ওর মধ্যে কি আছে বলে আপনার মনে হয় ?

ওর মধ্যে গাঁজা বা ভাঙ্গ জাতীয় নেশার বস্তু আছে বলে মনে হয়। ঐ যাদের তোমরা বল হ্যাসহিস সিগ্রেট। আমাদের দেশে ভারতীয় গাঁজা থেকেই ওই বস্তুটি তৈরি হয়ে থাকে। ফার্মাকোপিয়াতেও তুমি ওর কথা পাবে—An Arabian aromatic confection of Indian hemp. পশ্চিমের দেশগুলোতে ঐ ধরণের সিগ্রেট নেশার জন্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় গাঁজা থেকেই মূলত তৈরি হয়! আমার মনে হয়, চোরাই পথে ঐ নেশার কারবার চালাত মালঞ্চ দেবী। অবিশ্যিই সে একা নয়, সঙ্গে তার আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই ছিল, আর ঐ নেশার চোরাকারবার করে প্রচুর উপার্জন করত মালঞ্চ ও তার সঙ্গী সাথীরা।

তবে কি তার মৃত্যুর পিছনে ঐ চোরা কারবারের কোন—

হলে আশ্চর্য হব না সুশীল। যাক, আমি এখন উঠব। তোমাদের ডি-সি ডি-ডি আমাকে ফোন করেছিলেন, সেখানে একবার যেতে হবে—

॥ এগারো ॥

পরের দিন বেলা ন'টা নাগাদ কিরীটী লালবাজারে ডি-সি ডি-ডি মিঃ চট্টরাজের অফিস ঘরে প্রবেশ করে দেখে একজন মধ্যবয়সী সুদর্শন ভদ্রলোক, পরনে দামী স্যুট, চট্টরাজের মুখোমুখি বসে।

চট্টরাজ কিরীটীকে চোখের ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বললেন।

ডাঃ রায়, আপনার ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যাতায়াত ছিল সে কথা আমরা গত কালই জানতে পারি—ডি-সি ডি-ডি বলতে থাকেন।

যাতায়াত ছিল বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ?

মানে প্রায়ই আপনি ওখানে যেতেন।

হ্যাঁ যেতাম, মালঞ্চ দেবী আমার পেসেণ্ট ছিলেন।

I see, তা তার রোগটা কি ছিল ডাঃ রায় ?

নানা ধরনের অসুখ ছিল। তবে প্রায়ই মাইগ্রেন আর পেটের কলিকে ভুগতেন।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটী প্রশ্ন করল, Excuse me ডাঃ রায়, একটা কথা, আপনি কি জানতেন ঐ মহিলাটি গাঁজা জাতীয় কোন নিষিদ্ধ নেশা করতেন ?

না, আমি জানি না।

মালঞ্চ দেবী কখনও বলেননি ?

না।

আপনি সাধারণত রাত্রের দিকেই সেখানে যেতেন শুনেছি—

বাজে কথা। যখনই দরকার পড়ত তখনই যেতাম, আমরা ডাক্তার, কল এলে যেতেই হয়।

ডাক্তার হিসাবেই তো যেতেন। তবে আপনাকে দরকারটা বেশীর ভাগ রাত্রের দিকেই হত—তাই নয় কি ?

বললাম তো, যখন দরকার হত তখুনি যেতাম।

তা মিঃ সুরজিৎ ঘোষাল ব্যাপারটা জানতেন ?

জানতেন বৈকি, আর তার কল পেয়েই তো প্রথমে আমি সেখানে যাই—

সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে মালঞ্চর সম্পর্কর কথাটা নিশ্চয়ই আপনি জানতেন, অর্থাৎ মালঞ্চ তার keeping-য়ে ছিল ?

আমার জানার দরকার হয়নি and that was non of my business.

ডাঃ রায়, আপনি দীপ্তেন ভৌমিককে জানেন ?

হ্যাঁ, পরিচয় আছে। সমীর ডাক্তার বললেন।

তিনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন জানেন নিশ্চয়ই ?

না, তাকে সেখানে আমি কখনও দেখিনি।

ডাঃ রায়, বালীগঞ্জ সারকুলার রোডে একটা নাইট ক্লাব আছে, So called সোসাইটির অভিজাত নর-নারীরা যেখানে রাত্রে মিলিত হয়। ক্লাবটা জানেন আপনি ?

জানি।

আপনিও তো সেখানে প্রায়ই যেতেন। সেখানে আপনার দীপ্তেন

ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হত না ?

মনে করতে পারছি না।

আর মিঃ সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে ?

না, তাকে কখনও সেখানে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

মালঞ্চ দেবী—তাকে নিশ্চয়ই ঐ নাইট ক্লাবে দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি মাঝে মধ্যে সেখানে যেতেন।

ডাঃ রায়, আপনি অভিনেত্রী ডলি দত্তকে চেনেন ?

না, ও নাম শুনিইনি আমি কখনও।

ডি-সি ডি-ডি প্রশ্ন করলেন, ব্যাঙ্কে আপনার কোন ভল্ট নেই ?

না মশাই, নেই। আমাদের আয়টাই আপনারা কেবল দেখেন, ব্যয়ের দিকটা কখনও ভেবে দেখেন না। আমার আয় যেমন তেমন খরচও অনেক।

আচ্ছা, আর একটা কথা, আবার কিরীটীর প্রশ্ন, আপনি তো মালঞ্চ দেবীর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছিলেন, তিনি গাঁজা ছাড়া অন্য কোন রকম নেশা করতেন বলে জানেন ?

হ্যাঁ, করতেন। She was addicted to pethidine প্রথমে abdominal colic-য়ের জন্যে নিতেন, পরে অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

নিজে নিজেই ইন্‌জেকশন নিতেন বোধহয় ?

শেষের দিকে তাই নিতেন জানি।

আপনি তাকে ঐ মারাত্মক বিষ শরীরে নিতে নিষেধ করেননি ?

বহুবার করেছি, কিন্তু পেথিডিনের নেশা বড় মারাত্মক নেশা, একবার ঐ নেশার কবলে পড়লে রেহাই পাওয়া দুষ্কর—

আর একটা নেশাও তিনি করতেন, আমরা যতদূর জেনেছি। জানেন কিছু ?

কিসের নেশা ?

হ্যাসহিস—

Good Lord ! না, আমি জানতাম না।—and I don't think so.

প্রশ্নোত্তরের পর ডাক্তার রায়কে মিঃ চট্টরাজ যাবার অনুমতি দিলেন।

অভিনেত্রী জলি দত্তকে কিন্তু তার টালার বাড়িতে খোঁজ করে পাওয়া গেল না! তার স্বামী জীবন দত্ত বললেন, ছবির ব্যাপারে সে বোম্বাই গিয়েছে।

সুশীল চক্রবর্তী ডলি দত্ত সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন।

বয়স ত্রিশের মধ্যে, খান তিনেক ছবিতে কাজ করেছে বেশ কয়েক বছর আগে, এবং কোন ছবিই দাঁড়ায়নি। বর্তমানে ৩/৪ বৎসর তার হাতে কোন কাজ নেই। তার স্বামী জীবন দত্ত ব্রোকার, বেশ ভালই রোজগার করে। স্বচ্ছল অবস্থা। ডলি দত্ত গ্র্যাজুয়েট এবং হাই সোসাইটিতে তার যাতায়াত ও মেলামেশা আছে। নিজের একটা ফিয়াট গাড়ি আছে, সেটা নিয়েই ঘুরে বেড়ায়।

ডলি দত্ত একদিন নিজেই লালবাজারে এসে হাজির হল। গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে চট্টরাজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় প্রহরারত সার্জেন্ট ডলি দত্তকে বাধা দিল।—কাকে চাই ?

মিঃ চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করব। বলুন ফিল্ম এ্যাকট্রেস ডলি দত্ত এসেছেন।

সার্জেন্টের নাম শোনা ছিল, বললে, অপেক্ষা করুন, আমি খবর দিচ্ছি—বলে সার্জেন্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে বললে, যান, ভিতরে যান—

চট্টরাজ তার নিজের অফিস ঘরে বসে একটা রিপোর্ট দেখছিলেন। ডলি দত্ত ভিতরে ঢুকতেই তিনি বললেন, বসুন—

শুনলাম থানা থেকে আমার বাড়িতে কেউ আমার খোঁজে গিয়েছিলেন, আমি কলকাতায় ছিলাম না—ডলি দত্ত বললে।

চট্টরাজ চেয়ে ছিলেন ডলি দত্তর দিকে। বয়েস যা-ই হোক দেখতে ২৭/২৮য়ের বেশী বলে মনে হয় না। স্লিম ফিগার, বগল-কাটা বুক-খোলা ব্লাউজ গায়ে, পরণে একটা ডিপ ব্লু রঙের দামী জর্জেট শাড়ি। গলায় একটা সোনার সরু চেন, দু'কানে দুটো হীরের ফুল। হাতে কিছু নেই, ডান হাতে ছোট একটা দামী সোনার ঘড়ি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, শ্যাম্পু করা।

ডলি দত্ত চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, তা আমাকে হঠাৎ আপনাদের কি প্রয়োজন হল বলুন তো ?

আপনি নিশ্চয়ই সংবাদ পেয়েছেন—হিন্দুস্থান রোডের মালঞ্চ দেবীকে হত্যা করা হয়েছে ?

হ্যাঁ, নিউজ পেপারে পড়েছি—

আমরা শুনেছি তিনি আপনার একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন ?

বান্ধবী ! Not at all. সামান্য পরিচয় ছিল।

তা কেমন করে পরিচয় হল ?

আমার একজন admirer ছিলেন তিনি। একটা ফাংশনে আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে।

আপনি প্রায়ই তার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন ?

প্রায়ই নয়, বার দুই বোধহয় গিয়েছি।

বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের নাইট ক্লাব দি রিট্রিটে আপনার যাতায়াত আছে—মালঞ্চ দেবীকে আপনি সেখানে দেখেছেন ?

দেখেছি।

ডাঃ সমীর রায়কে চেনেন ? এই শহরের নাম করা ফিজিসিয়ান ?

নাম শুনেছি, পরিচয় নেই।

কিন্তু ডাঃ রায় বলেছেন, সেই নাইট ক্লাবেই তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়। আপনারা উভয়েই উভয়ের পরিচিত এবং আপনি প্রায়ই ডাঃ রায়ের সঙ্গে মালঞ্চদেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেতেন।

ডাঃ রায় বলেছেন ঐ কথা ?

হ্যাঁ। নচেৎ আমরা জানব কি করে ?

All bogus ! দু-একদিন সামান্য একটু কথাবার্তা বললেই যদি যথেষ্ট পরিচয় হয়, তাহলে তো যাদের সঙ্গে কখনো দু'-চারটে কথা বলেছি, তারা সকলেই আমার যথেষ্ট পরিচিত।

আপনি লেক রোডের দীপ্তেন ভৌমিককে চেনেন ?

সামান্য পরিচয় আছে।

তার সঙ্গে, তার গাড়িতে মাঝে মধ্যে আপনি বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের নাইট ক্লাবে যেতেন আমরা জানতে পেরেছি—

মাঝে মধ্যে নয়, বার দুই হয়তো গিয়েছি—

And you stayed there uptill midnight—কথাটা সত্যি ?

তা মাঝে মধ্যে একটু বেশী সময় থাকতাম।

গতকাল evening flight-এ বম্বে থেকে ফিরেই এয়ার পোর্ট থেকে সোজা ট্যাক্সি করে আপনি তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন ?

ডলি দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ চট্টরাজের মনে হল হঠাৎ যেন ডলি দত্ত একটু বিব্রত বোধ করছে। ডলি দত্ত কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

কি ভাবছেন মিসেস দত্ত ? সংবাদটা তাহলে মিথ্যে নয় ?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। মানে—

নিশ্চয়ই কোন জরুরী ব্যাপার ছিল—নচেৎ বাড়িতে না গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা একেবারে তার লেক রোডের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন কেন?

হ্যাঁ। একটু কাজ ছিল, মানে তার এক বন্ধু বম্বে থেকে একটা প্যাকেট তাকে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। জরুরী। তাই সোজা সেখানেই গিয়েছিলাম—

জরুরী প্যাকেট! তা কি ছিল তার মধ্যে জানেন?

না, আমি তা জানব কি করে।

কিন্তু আমি বোধহয় অনুমান করতে পারি—প্যাকেটটার মধ্যে ছিল নিষিদ্ধ নেশার বস্তু, হ্যাসহিস্ সিগ্রেট—

Oh! Christ, কি বলছেন আপনি!

মিসেস দত্ত--গম্ভীর গলায় চট্টরাজ বললেন, If I am not wrong কথাটা আপনি জানতেন—

নিশ্চয়ই না, কখনোই না—

জানতেন, আপনি জানতেন। আর আপনি বোম্বাই গিয়েছিলেন কোন ফিল্মের Contract এর ব্যাপারে নয়, ঐ প্যাকেটটাই নিয়ে আসতে—

What do you mean!

মিসেস দত্ত, আপনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমতী, কিন্তু অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। আপনি জানতেন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িটা একটা ডেন ছিল, আর ঐখানেই ঐ নিষিদ্ধ বস্তু হ্যাসহিসের লেনদেন চলত—

Believe me officer, আ-আমি ওসব ব্যাপারে কিছুই জানিতাম না, জানলে ঐ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও যেতাম না।

মিসেস দত্ত, কোন্ ব্যাঙ্কে আপনার এ্যাকাউণ্ট আছে?

ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট?

হ্যাঁ, কারণ আমরা খবর পেয়েছি, রোজগার আপনার ভালই, এবং সেটা ঐ ফিল্ম লাইন থেকে নয়—

আপনি জানেন না আমার স্বামী একজন ব্রোকার এবং সে যথেষ্ট রোজগার করে। সে প্রতি মাসে আমাকে অনেক টাকা হাত খরচ দেয়। ফিল্মে অভিনয় করাটা আমার পেশা নয়, নেশা। হ্যাঁ,

নেশাই বলতে পারেন। ব্যাঙ্কে আমার সামান্য একটা এ্যাকাউণ্ট আছে। ব্যাঙ্কের নাম দিচ্ছি, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন—

ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। তবে আপনাকে হয়তো ভবিষ্যতে আবার আমাদের প্রয়োজন হবে। আমাদের না জানিয়ে আপনি কলকাতার বাইরে যাবেন না।

কিন্তু কেন, আপনারা কি মালঞ্চ হত্যার ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করছেন ?

সন্দেহ সকলের প্রতিই হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে যারা মালঞ্চ দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল, যাদের ওখানে যাতায়াত ছিল। আচ্ছা, আপনি আসুন।

ডলি দত্ত আসার সময় যেভাবে গট্-গট্ করে এসেছিলেন, বেরুবার সময় কিন্তু তেমন নয়, গতিটা মনে হল শ্লথ। একটু পরে ডলি দত্তর গাড়িটা লালবাজারের গেট দিয়ে বের হয়ে গেল।

॥ বারো ॥

ডলি দত্ত বের হয়ে যাবার পর চট্টরাজ কিরীটীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন—রায়সাহেব, একবার আমার অফিসে আসতে পারেন ?

কিরীটী বলল, সন্ধ্যার পর যাব।

ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কিরীটী তখুনি বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হল। একবার সুশীল চক্রবর্তীর ওখানে যেতে হবে।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, বেরুচ্ছ নাকি ?

হ্যাঁ, একবার সুশীলের ওখানে যাব।

যেতে হবে না দাদা, আমি এসে গিয়েছি—বলে হাসতে হাসতে সুশীল চক্রবর্তী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

আরে এসো, এসো সুশীল, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

বৌদি, কফি—

কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুশীল বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক দাদা, ওগুলো হ্যাসহিস সিগ্রেট—

তোমাকে যে বলেছিলাম মালঞ্চর ঘরটা আর একবার ভাল করে সার্চ করতে ?

করেছি। কিন্তু ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ, বা পেথিডিন এ্যাম্পুল তো পেলাম না।

হিসেবে যে মিলছে না ভায়া। কিরীটী যেন একটু চিন্তিত।

কি ভাবছেন দাদা! সুশীল চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করেন, কিসের কি হিসেব আবার মিলছে না?

ভাবছি, তাহলে পেথিডিন এ্যাম্পুল বা একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পাওয়া গেল না কেন? যে পেথিডিন এ্যাডিক্টেড তার ঘরে ঐ দুটি বস্তু থাকবে না তা তো হতে পারে না। তবে কি হত্যাকারী কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ঐ দুটি বস্তু ঘর থেকে নিয়ে গিয়েছে? তাই যদি হয় তো, আমরা দুটো definite conclusion-য়ে পৌঁছাতে পারি সুশীল।

কি কনক্লুশন?

প্রথমত, হত্যাকারী Unknown third person নয়, সে মালঞ্চর বিশেষ পরিচিতের মধ্যেই একজন, এবং দ্বিতীয়ত, মালঞ্চ যে পেথিডিন এ্যাডিক্টেড, সেটা সে ভাল করেই জানত, এবং সেটা তার পক্ষে সুবিধাই হয়েছিল!

সুশীল চক্রবর্তী কিরীটীর ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন—বলেন, তাহলে তো ঐ পরিচিত পাঁচজনের মধ্যেই একজন—

হ্যাঁ, মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত মল্লিক, তার বাবু সুরজিৎ ঘোষাল, দীপ্তেন ভৌমিক এবং ডাঃ সমীর রায়, তার পেয়ারের চোরাই কারবারের পার্টনার ও শ্রীমতী ডলি দত্ত—কিরীটী বললে।

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন সুশীল চক্রবর্তী।

এখন কথা হচ্ছে সুশীল ওরা সকলেই মালঞ্চর বিশেষ পরিচিত জন হলেও ওরা সকলেই কি জানত যে মালঞ্চ পেথিডিন এ্যাডিক্টেড—এক ডাক্তার ছাড়া?

একসঙ্গে মেলামেশা, একই সূত্রে বাঁধা, একই ইণ্টারেস্ট—ওদের সকলের জানাটাই তো স্বাভাবিক দাদা—

কি জানি, হতেও পারে। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, সুরজিৎ ঘোষালকে অনায়াসেই ঐ লিস্ট থেকে elminate করা যেতে পারে আপাতত।

কেন!

হাজার হলেও মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালের কিপিংয়ে ছিল, সেক্ষেত্রে

সে নিশ্চয়ই সুরজিৎ ঘোষালকে ব্যাপারটা জানতে দেবে না, বিশেষ করে সুরজিৎ ঘোষাল সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যা জানা গিয়েছে, মদ তো দূরের কথা, ভদ্রলোক স্মোক পর্যন্ত করেন না। মালঞ্চ সম্পর্কে তার চরিত্রের ঐ বিশেষ দুর্বলতাটুকু ছাড়া সত্যিই তিনি একজন যাকে বলে ভদ্রলোক। আজকের সো-কল্‌ড সোসাইটির কোন ভাইস-ই তার ছিল না। সেদিক দিয়ে বাকী চারজন তোমার সন্দেহের তালিকাভুক্ত।

ঐ চারজনের মধ্যে কাকে আপনি—

সুশীল, মাকড়সার জালে চার-পাঁচটা বিষাক্ত মাকড়সা বিচরণ করছে, এবং ঐ প্রত্যেকটি মাকড়সার ক্ষেত্রেই মালঞ্চকে হত্যা করার যথেষ্ট মোটিভ থাকতে পারে। কাজেই এই মুহূর্তে ওদের ঐ চারজনের মধ্যে বিশেষ ভাবে একজনকে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ, সার্কামস্টান্‌সিয়াল এভিডেন্স যাকে বলে, তার দ্বারাই একমাত্র ওদের একজনকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা চলতে পারে, অন্য কাউকে নয়। অবিশ্যি বোঝা যাচ্ছে ওরা সকলেই একটা চোরা-কারবার চালাত এবং প্রত্যেকেরই ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যেমন যাতায়াত ছিল তেমনি ছিল আরো একটা মিটিং প্লেস, ঐ নাইট ক্লাবটি, সেক্ষেত্রে ওদেরই কেউ একজন হত্যাকারী হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হত্যাকারী বললেই তো হবে না, আপাত দৃষ্টিতে ওদের প্রত্যেকের মোটিভ থাকলেও ঐ সঙ্গে তোমাকে ভাবতে হবে ওদের মধ্যে সে রাত্রে কার পক্ষে মালঞ্চকে হত্যা করা সবচাইতে বেশী সম্ভব ছিল, অর্থাৎ Probabilityর দিক থেকে কার উপরে বেশী সন্দেহ পড়ে। তার ওপর base করে তুমি যদি এগুতে পারো তাহলেই দেখবে ঐ হত্যা রহস্যের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে গেছ। হাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আরো প্রমাণ চাই, অতএব তোমায় কিছুটা সুতো ছাড়তে হবে—আরো সুতো, তবেই বিরাট কাৎলাকে তুমি বঁড়শীতে গাঁথতে পারবে।

পরের দিনই সুশীল চক্রবর্তী সকাল আটটা নাগাদ লেক রোডে দীপ্তেন ভৌমিকের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন।

দিনটা ছিল রবিবার। লিফ্‌টে করে ওপরে উঠে ফ্ল্যাটের কলিং বেলের বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল।

ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা মধ্যবয়সী ভৃত্যশ্রেণীর একটি লোক দরজাটা খুলে বলল, কাকে চান?

এখানে দীপ্তেন ভৌমিক থাকেন ?

হ্যাঁ। কি নাম বলব সাহেবকে ?

বল একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান, বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। বসুন, আমি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। তবে রবিবার তো, সাহেব কারো সঙ্গেই দেখা করেন না, আপনার সঙ্গেও দেখা করবেন কিনা জানি না।

একটা কাগজ দাও, আমি আমার নাম লিখে দিচ্ছি—

সুশীল চক্রবর্তীর দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল বেয়ারা। সুশীল চক্রবর্তী কাগজটিতে নিজের নাম লিখে দিলেন। বেয়ারা কাগজটা নিয়ে চলে গেল।

বেশ বড় সাইজের একটি হল ঘর, ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট পাতা, বেশ দামী, নরম পুরু কার্পেট। সুন্দরভাবে সাজানো ঘরটি, সোফা সেট, বুককেস, ডিভান, কাচের শো-কেসে ইংরেজী বাংলা সব বই। দেওয়ালে দীপ্তেন ভৌমিকেরই একটি রঙীন বড় ফটো, জানালা দরজায় দামী পর্দা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পরনে স্লিপিং পায়জামা ও গায়ে গাউন জড়ানো, মুখে সিগ্রেট, বের হয়ে এলেন দীপ্তেন ভৌমিক।

আপনি মিঃ চক্রবর্তী? দীপ্তেন প্রশ্ন করল, কি প্রয়োজন আমার কাছে ?

বসুন, বলছি।

একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে কিন্তু মিঃ চক্রবর্তী, আমাকে এখুনি আবার একটু বেরুতে হবে।

হিন্দুস্থান রোডের মার্ডার কেসটার ব্যাপারে আপনাকে পুলিশের তরফ থেকে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বলুন কি জিজ্ঞাস্য আছে।

আপনার তো মালঞ্চ দেবীর সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল ?

হৃদ্যতা! Not at all, তবে চিনতাম তাকে।

আমরা কিন্তু জেনেছি আপনি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন—

প্রায়ই নয়, কখনো-সখনো যেতাম।

ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই যে সেখানে আপনি যেতেন সেটা কিন্তু আমরা জেনেছি মিঃ ভৌমিক। শুধু সেখানেই নয়, দি রিট্রিট নাইট ক্লাবেও আপনি মালঞ্চ দেবীর সঙ্গে যেতেন। মিঃ ভৌমিক, বিভিন্ন

সোর্স থেকে আমরা যথাসম্ভব খবরাখবর সংগ্রহ করেই আপনার কাছে এসেছি। অতএব বুঝতেই পারছেন, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।

সুশীল চক্রবর্তীর স্পষ্ট কথায় ও গলার স্বরে মনে হল দীপ্তেন ভৌমিক যেন একটু থমকেই গিয়েছে।

হঠাৎ শয়নঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং অভিনেত্রী ডলি দত্ত ঘর থেকে বের হয়ে এলো। ডলি দত্তর সঙ্গে পূর্বেই কথাবার্তা হয়েছিল সুশীল চক্রবর্তীর, তাই ডলি দত্ত সুশীল চক্রবর্তীকে দেখে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে দীপ্তেনের দিকে তাকিয়ে বললে, দীপ্তেন, আমি যাচ্ছি—

এসো—মৃদুকণ্ঠে দীপ্তেন বলল।

ঘরের মধ্যে একটা বিদেশী সেন্টের সৌরভ ছড়িয়ে ডলি দত্ত বের হয়ে গেল।

বেশ, স্বীকার করলাম না হয় ছিল, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? দীপ্তেন বলল।

সুরজিৎ ঘোষাল যে সেটা পছন্দ করতেন না তাও নিশ্চয় আপনার অজানা ছিল না?

Don't talk about that old fool.

কিন্তু সুরজিৎ ঘোষালেরই রক্ষিতা ছিলেন মালঞ্চ দেবী, আপনার ও মালঞ্চ দেবীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, বিশেষ করে তার অবর্তমানে, সুরজিৎ ঘোষালের না পছন্দ হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি?

ওসব কথা ছাড়ুন মিঃ চক্রবর্তী, আমার কাছে কি জানতে চান বলুন।

যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে সে রাত্রে আপনি মালঞ্চ দেবীর বাড়ি গিয়েছিলেন?

সে তো আগেই বলেছি।

হ্যাঁ, আপনি বলেছেন এবং আপনি এও বলেছেন যে সদর দিয়েই বের হয়ে এসেছিলেন আপনি।

এখনও তাই বলছি, এবং বের হয়ে সোজা আমি ট্রেন ধরি।

না, সে রাত্রে আপনি তখনই কলকাতা ছেড়ে যাননি, এবং সে রাত্রে আবার আপনি হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন, I mean second time.

What nonsense! কি সব আবোল-তাবোল বকছেন মিস্টার চক্রবর্তী?

যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না পেয়ে আপনাকে আমি কথাটা বলছি না মিঃ ভৌমিক। আপনাকে আর ডলি দত্তকে সেই রাত্রে বারোটা নাগাদ নাইট ক্লাব দি রিট্রিটে ড্রিঙ্ক করতে দেখা গিয়েছে।

হতেই পারে না।

বললাম তো, আমাদের হাতে তার প্রমাণ আছে। এবার বলুন মিঃ ভৌমিক, সেদিন সন্ধ্যা রাত্রে মালঞ্চদেবীর হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বের হয়ে ঐ নাইট ক্লাবে যাবার আগে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন? কি করেছিলেন?

আমি নাইট শো-তে সিনেমা গিয়েছিলাম।

তাহলে সে রাত্রে আপনি কলকাতা ছেড়ে যাননি স্বীকার করছেন?

হ্যাঁ, কলকাতাতেই ছিলাম।

আপনি সেকেণ্ড টাইম আবার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন। বলুন কেন গিয়েছিলেন?

দরকার ছিল।

কি এমন দরকার পড়ল যে সেকেণ্ড টাইম সেখানে যেতে হল মিঃ ভৌমিক?

সেটা সম্পূর্ণ আমার পার্সোনাল ব্যাপার, ব্যক্তিগত।

তা কখন গিয়েছিলেন? মানে ক'টা রাত্রি তখন? যদিও একটু আগে বললেন সিনেমায় গিয়েছিলেন—

বই দেখতে আমার ভাল লাগছিল না, তাই ইণ্টারভ্যালের আগেই বের হয়ে আসি সিনেমা হাউস থেকে।

ট্যাক্সিতেই বোধহয় গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

তখন রাত ক'টা হবে?

পৌনে এগারোটা হবে। ঠিক সময় দেখিনি।

আচ্ছা, মানদা বা রতন কেউই দ্বিতীয়বার আপনাকে সেখানে যেতে দেখিনি, তাহলে ধরতে হয় আপনি নিশ্চয়ই মেথরদের যাতায়াতের জন্য পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি পথে উঠে বাথরুমের দরজা দিয়েই গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।

ওই দরজা দিয়ে আপনি মাঝে মধ্যে যেতেন তাহলে ?

যেতাম।

ঘরে ঢুকে কি দেখলেন আপনি ? মানে মালঞ্চ দেবী কি করছিলেন সে সময় ?

ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ একটা সোফায় বসে ছিল সে।

তারপর ?

দশ মিনিটের মধ্যেই আমি আমার কাজ সেরে চলে আসি। পরে সেখান থেকে নাইট ক্লাবে যাই।

মালঞ্চ দেবী তখন তাহলে জীবিত ছিলেন ?

হ্যাঁ।

মালঞ্চ দেবী যে একজন স্মাগলার ছিলেন আপনি জানেন ?

স্মাগলার ! না তো ! কে বললে ? ইমপসিব্‌ল !

হ্যাসহিসের চোরা কারবার ছিল তার, আপনি জানতেন না বলতে চান ?

না, বিশ্বাস করুন। সত্যিই আমি জানতাম না, I never knew that she was a smuggler !

হুঁ। তিনি যে পেথিডিন অ্যাডিক্টেড ছিলেন তাও জানতেন না বোধহয় ?

না তো !

তার সঙ্গে এতদিন ধরে এত ঘনিষ্ঠতা সত্বেও ঐ দুটি সংবাদ আপনার অবিদিত ছিল মিঃ ভৌমিক, এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল ? আপনি জানতেন, জানতেন কিন্তু এখন স্বীকার করছেন না। ঠিক আছে, আপনি ডাঃ সমীর রায়কে চেনেন নিশ্চয়ই—

চিনি।

তারও সঙ্গে মালঞ্চ দেবীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না ?

ডাঃ রায় ওর ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছিলেন, এইটুকুই জানি, তার বেশি কিছু জানি না।

আপনি কি ব্র্যাণ্ড সিগ্রেট খান ?

কেন বলুন তো ?

দেখি আপনার সিগ্রেট কেসটা—

দীপ্তেন ভৌমিক নাইট গাউনের পকেট থেকে একটা দামী সিগ্রেট

কেস বের করে দিলেন সুশীল চক্রবর্তীর হাতে। কেসটা খুলে দেখলেন সুশীল চক্রবর্তী, স্মাগ্‌ল করা সিগ্রেট স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫—এবং আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল—ভিতরের দিকে ডালার গায়ে এনগ্রেভ করে লেখা To Dipten—Mala.

সিগ্রেট কেসটা ফেরত দিতে দিতে সুশীল চক্রবর্তী বললেন, এই মালাটি কে দীপ্তেনবাবু? Who is she?

এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ চক্রবর্তী।

আচ্ছা, আপনার সোনার সিগ্রেট কেস ছিল কি কখনও?

না তো।

আপনার পরিচিত জনেদের মধ্যে কারও ছিল বলে কি আপনার মনে পড়ে?

ডাঃ রায়ের কাছে একটা সোনার সিগ্রেট কেস দেখেছি বলে মনে পড়ছে।

তিনি কি ব্র্যাণ্ড সিগ্রেট খান?

সেম ব্র্যাণ্ড—State Express 555.

ঠিক আছে, আর আপনার সময় নষ্ট করব না। তবে আপনাকে আবার আমাদের প্রয়োজন হতে পারে। কলকাতার বাইরে গেলে পুলিশের পারমিশন ছাড়া যাবেন না—

ঠিক আছে।

চলি—সুশীল চক্রবর্তী অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন।

॥ তেরো ॥

মালঞ্চ হত্যারহস্য আরো ঘনীভূত হল এবং তার আভাস পাওয়া গেল দিন দুই পরে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে।

"শহরের কোন এক নাম-করা ডাক্তার ও কোন এক কোম্পানির বড় অফিসারের ব্যাঙ্কের লকার থেকে প্রচুর গিনি ও কারেন্সী নোট পাওয়া গিয়েছে। যে অর্থের কোন বিশ্বাসযোগ্য এক্সপ্ল্যানেশান ওই দুজনের একজনও দিতে পারেননি, ওরা দুজনেই নিহত মালঞ্চ দেবীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত ছিলেন।

আরো একটি সংবাদ—মালঞ্চ দেবী পেথিডিনে এ্যাডিক্টেড ছিলেন। হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির একটি তালাবন্ধ ঘরে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ বহু টাকার নিষিদ্ধ নেশার বস্তু পেয়েছে। ঐ হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে

জড়িত সন্দেহে পুলিশ মালঞ্চ দেবীর পিয়ারের দাসী মানদা দাসীকে গ্রেপ্তার করেছে।”

দিন দুই পরে আবার সংবাদ বেরুল, কাগজে কাগজে—

“শহরের এক নাম-করা এ্যাডভোকেট জগৎ চৌধুরী, মানদার জামীনের জন্য আদালতে আবেদন রেখেছিলেন কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটার সদানন্দ মিত্র তার বিরোধিতা করেন। জজ আরো তদন্ত সাপেক্ষে মানদার জামীন অনুমোদন করেননি। তাকে জেল হাজতে রাখার নির্দেশ জারী করেছেন। সুরজিৎ ঘোষালের জামীনের প্রশ্ন নিয়ে জজসাহেব বিবেচনা করবেন আগামী মঙ্গলবার।”

ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে সোমনাথ ভাদুড়ী তার চেম্বারে বসে কিরীটীর সঙ্গে ঐ মামলার ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছিলেন।

কিরীটী বলছিল, মানদা যে অনেক কিছুই জানে ভাদুড়ী মশাই, সেটা অনুমান করেই আমি সুশীলকে পরামর্শ দিয়েছিলাম ওকে গ্রেপ্তার করতে।

আমারও মনে হয় কাজটা ভালই হয়েছে রায়মশাই, আপনার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে, হত্যাকারীকে নানা ভাবে ঐ মানদার সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু ওর জামীনের ব্যাপারে আমাদের জগৎ চৌধুরীকে কে ব্রিফ দিয়েছেন সেটাই বুঝতে পারছি না।

যার বেশী interest নিঃসন্দেহে সে-ই দিয়েছে—কিরীটী মৃদু হেসে বলল।

কিন্তু কে সে? কাকে আপনার সন্দেহ হয় বলুন তো।

সন্দেহ যার পরেই হোক, একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু নিশ্চিত হয়েছি ভাদুড়ী মশাই—কিরীটী বলল, মানদা অনেক কিছুই জানে, আর তাই বোধহয় হত্যাকারী মানদার জামীনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে জানে না ঐ রকমের চরিত্রের এক মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করে কত বড় ভুল সে করেছে। এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো মানদার হাত দিয়েই ফাঁসীর দড়িটা তার গলায় এঁটে বসবে।

আপনিই তো একটু আগে বলছিলেন রায়মশাই, সুশান্ত মল্লিক নাকি ঐ মানদা সম্পর্কে বলেছিল She is a dangerous woman!

হ্যাঁ, বলেছিল, কিন্তু You can't count much upon him! একটা মেরুদণ্ডহীন মাতাল—নিজের স্ত্রীকে অন্যের রক্ষিতা জেনেও তারই আশ্রয়ে যে পড়ে থাকে এবং তারই টাকায় নেশা করে, আর যা-ই

হোক তাকে বোধহয় পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

আচ্ছা, ঐ চিত্রাভিনেত্রীটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?

গোলমালটা হয়তো সেখানেও থাকতে পারে ভাদুড়ীমশাই।

হ্যাঁ, এটা তো বুঝতে পারা গিয়েছে দীপ্তেন ভৌমিককে মালঞ্চ ভালবাসত, তাই হয়তো সে ডলি দত্তর প্রতি দীপ্তেনের আকর্ষণটা ভাল চোখে দেখত না। এবং ডলি দত্তও মালঞ্চকে অনুরূপ সুনজরে দেখত না। ফলে সম্ভবত হয়তো পরস্পারের প্রতি একটা Jealousy দেখা দিয়েছিল দীপ্তেন ভৌমিককে ঘিরে। আর কে বলতে পারে, সেই ঈর্ষাকে মন্থন করেই হয়তো হলাহল উঠে এসেছিল, যে হলাহল মালঞ্চর মৃত্যু ঘটিয়েছে।

আর ঐ ডাক্তারটি?

আমার যতদূর মনে হয় সে ভদ্রলোকও চোরা-কারবারের একজন অংশীদার, এবং সেক্ষেত্রে ঐ মাকড়শার জালে তারও জড়িয়ে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক।

আচ্ছা রায়মশাই, আপনার কি মনে হয় মালঞ্চর স্বামী সুশান্ত মল্লিকও ঐ চোরা-কারবারে—

অংশীদার সে হয়তো ঐ চোরা-কারবারে ছিল না—আর সেটা সম্ভবও নয়।

কেন?

আর যা-ই করুক না কেন মালঞ্চ, ঐ আশ্রিত ও পোষ্য স্বামীকে যে তার চোরা-কারবারের মধ্যে নেবে—সেটা সম্ভব নয়। তবে একই বাড়িতে যখন ছিল লোকটা তখন তার পক্ষে ব্যাপারটা অনুমান করা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

আচ্ছা রায়মশাই, আপনার কি মনে হয় আমার ক্লায়েন্ট সুরজিৎ ঘোষাল ঐ চোরা-কারবারের মধ্যে ছিল?

মনে হয় না চোরা-কারবারের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল। তবে জোর করে কিছুই এই মুহূর্তে বলা যায় না ভাদুড়ীমশাই।

বাঁচালেন। আমারও তাই ধারণা রায়মশাই।

কিরীটী মৃদু হাসল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, মালঞ্চর মৃত্যুর কারণ দুটোই হতে পারে—হয় ঈর্ষার হলাহল নতুবা চোরা-কারবারের বিষময় পরিণাম।

ভাদুড়ী বললেন, সত্যি রায়মশাই, আজকের সমাজের মানুষগুলো

কিভাবে যে বদলে যাচ্ছে দিনকে দিন, মরাল বা নীতির কোন বালাই নেই।

কোথা থেকে থাকবে ভাতুড়ীমশাই, আজকের জীবনযাত্রা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যেখানে কেবল ছুটবার নেশা এসেছে। একটা অস্থিরতা, আর সেই অস্থিরতার জন্যেই তারা তৃপ্তির অনুসন্ধান করছে মদ, মেয়েমানুষ, ঘোড়দৌড়, চোরা-কারবার আর কালো টাকা জমানোর মধ্যে। ঐ মালঞ্চ মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে দেখুন না, স্বামী থাকতেও সে আর একজনের রক্ষিতা হয়েছিল। কিন্তু হতভাগিনী জানত না, লালসা লালসাকেই বাড়িয়ে তোলে, ওর মধ্যে তৃপ্তি নেই, আছে কেবল একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা। সেই অস্থিরতার বিষই আজ আনছে হত্যা ধর্ষণ চোরা-কারবার আর কালো টাকার নেশা। আচ্ছা, রাত অনেক হল, এবার উঠি ভাতুড়ীমশাই—কিরীটী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

লেক রোডে দীপ্তেনের ফ্ল্যাটে তার শোবার ঘরে মুখোমুখি বসে ছিল দীপ্তেন আর ডলি দত্ত।

তারা জানত না যে তারা যে সব কথা বলছে, সব কিছু একটা অদৃশ্য শক্তিশালী মাইক্রোফোনের সাহায্যে টেপ হয়ে যাচ্ছে।

কিরীটীর পরামর্শে-ই ব্যবস্থাটা ডি-সি ডি-ডি চট্টরাজ করেছিলেন দীপ্তেনের গৃহ ভৃত্য বামাপদকে হাত করে। দীপ্তেনের গৃহ ভৃত্য বামাপদকে পুলিশের হাত করতে কষ্ট হয়নি।

বামাপদ বৎসর খানেক হল দীপ্তেনের কাছে কাজ করছে। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। কালো মতন রোগা চেহারা, কিন্তু বোঝা যায় বেশ চালাক চতুর। সুশীল চক্রবর্তীর কথায় সেটা বুঝতে পেরেই কিরীটী বামাপদকে পুলিশের দলে টানতে পেরেছিল। ব্যাচিলার মানুষ দীপ্তেন বামাপদ ছিল তার একাধারে কুক এবং সার্ভেন্ট আবার কেয়ার টেকারও বটে। বামাপদকে পেয়ে দীপ্তেন নিশ্চিন্ত ছিল।

বামাপদকে আলাদা ভাবে জেরা করে সুশীল চক্রবর্তী থানায় নিয়ে এসে অনেক কথাই দীপ্তেন সম্পর্ক জানতে পেরেছিলেন।

ডলি দত্ত যে ইদানিং প্রায় প্রতি রাত্রেই দীপ্তেনের ফ্ল্যাটে আসে, তারপর মধ্য রাত্রি পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে যায়, সে কথা বামাপদর কাছ থেকেই সুশীল চক্রবর্তী প্রথম জানতে পেরেছিলেন। এবং

বামাপদর কাছ থেকেই আরো শুনেছিলেন মালঞ্চ দেবী আগে প্রায়ই আসত দীপ্তেনের ফ্ল্যাটে তবে ইদানীং কেন যেন সে বড় একটা আসত না।

তারপর একদিন সুশীল চক্রবর্তী দীপ্তেন ভৌমিকের অনুপস্থিতিতে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

সুশীল বলেছিলেন, শোন বামাপদ, পুলিশকে যদি তুমি সাহায্য না কর পুলিশ তোমাকে গ্রেপ্তার করে চালান দেবে। পুলিশ সংবাদ পেয়েছে তোমার বাবুর সঙ্গে তুমি চোরা-কারবার কর।

দোহাই হুজুর, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না—

জানি না বললেই তো আর তোমাকে পুলিশ ছেড়ে কথা বলবে না বামাপদ।

বামাপদ হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল। বলেছিল, বিশ্বাস করুন হুজুর, আমি কিছুই জানি না।

ঠিক আছে, তুমি পুলিশকে যদি সাহায্য কর—তবে আমি তোমাকে বাঁচাব—

বলুন হুজুর কি করতে হবে—আমি সব কিছু করব আপনার হুকুম মত।

বেশ, তাহলে আগে কয়েকটা কথার জবাব দাও আমায়।

বলুন হুজুর।

তোমার বাবুর ঘরে একটি মেয়ে আসত?

কার কথা বলছেন হুজুর, সেই যে সিনেমায় নামে?

না, সে নয়, আর একজন, মালঞ্চ তার নাম—

মালা দিদিমণি? কিন্তু তিনি তো অনেকদিন আর ওখানে আসেন না।

আসবেন কি করে, তিনি কি আর বেঁচে আছেন, তাকে খুন করা হয়েছে।

খুন! কি বলছেন হুজুর!

হ্যাঁ, তাকে খুন করা হয়েছে!

হুজুর, আপনারা কি আমার বাবুকে সন্দেহ করছেন? আমি হলফ করে বলতে পারি হুজুর, আমার বাবু ঐ দিদিমণিকে খুন করেননি।

কি করে বুঝলে যে তোমার বাবু—

কি বলছেন হুজুর, ঐ দিদিমণিকে আমার বাবু খুব ভালবাসতেন। আর দিদিমণিও বাবুকে—

জানি বামাপদ, সেইজন্যেই তো আসল লোককে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর আমাদের ধারণা সেই লোকটা তোমার বাবুর কাছে আসা যাওয়া করে। হ্যাঁ, তাকে আমরা ধরতে চাই, আর তাতে তোমার সাহায্য চাই আমরা।

নিশ্চয় হুজুর আমি আপনাদের সাহায্য করব, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

বেশী কিছু না, তোমার বাবুর বসবার আর শোবার ঘর আমরা একটু দেখব, যদি সে লোকটার কোন হদিশ পাই।

বেশ তো বাবু, দেখুন।

হ্যাঁ দেখছি, কিন্তু আমি একা একা দেখব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না।

ঠিক আছে, আমি দাঁড়াচ্ছি।

সুশীল চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একটা ভারী সোফার নীচে মাইক্রোফোন আর ছোট টেপ রেকর্ডারটা ফিট করে মিনিট কুড়ি বাদে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এলেন।

দেখলেন হুজুর?

হ্যাঁ, পাঁচ সাতদিন বাদে আবার আসব, তুমি কিন্তু তোমার বাবুকে একেবারেই বলবে না যে আমি এখানে এসেছিলাম। তোমার বাবু জানতে পারলে যদি বেফাঁস কথাটা বলে ফেলেন তাহলে সে সাবধান হয়ে যাবে, বুঝেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সুশীল ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

দীপেন ভৌমিক বলছিল, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি ডলি। ইউরোপ—

আমাকে সঙ্গে নেবে দীপু?

তোমাকে! না বাবা, ও সবের মধ্যে আমি আর নেই, শেষটায় জীবন দত্ত আমার নামে কেস ঠুকে দিক আর কি। একে সুরজিৎ ঘোষালের ঝামেলায় নাস্তানাবুদ হচ্ছি—

কেন, পুলিশ তোমাকে মালঞ্চ হত্যার ব্যাপারে খুব নাস্তানাবুদ করছে বুঝি?

আর বল কেন—

তুমি তো আমার কথা শোননি, কতবার বলেছি ওর সঙ্গে মিশ না অত, তা তুমি রোজই ওখানে যেতে—

শুধু আমি কেন, তুমি যেতে না? ডাঃ সমীর রায় যেতেন না?

তা তো সকলেই যেতাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে মালঞ্চর ঘনিষ্ঠতা ছিল—।

বাজে বকো না। একটা ক্যারেক্টারলেস উওম্যান—।

তার জন্যেই তো তুমি হেদিয়ে মরতে দীপ্তেন।

She was a fool, সে ভাবত আমি বুঝি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি, কিন্তু মোটেই তা নয়, আমি তাকে ঘৃণা করতাম।

বাজে কথা বলো না।—আমি জানি দীপ্তেন।

কি জানো?

সে রাত্রে দু-দুবার গিয়েছিলে তুমি মালঞ্চের ঘরে—

তুমি জানো?

আমি জানি। মনে আছে, সে রাত্রে আমাকে নিয়ে তোমার দি রিট্রিটে ডিনার খাবার কথা ছিল, অথচ রাত সোয়া এগারোটা পর্যন্তও যখন তুমি এলে না—

তুমি বিশ্বাস কর—আমি একটা বিশেষ কাজে আটকা পড়েছিলাম।

তাও জানি বৈকি, আর সেই বিশেষ কাজে মালঞ্চর বাড়িতেই যে আটকা পড়েছ তাই ভেবেই তো আমি মালঞ্চর বাড়ি যাই—

তুমি—তুমি মালঞ্চর বাড়িতে গিয়েছিলে ডলি!

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। রাত তখন প্রায় পৌনে বারোটা হবে। তুমি আমায় দেখনি, আমি যখন পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে বাথরুমের মধ্যে দিয়ে মালঞ্চর ঘরে গিয়ে ঢুকি, তখন She was was dead!

কি বলছ তুমি ডলি!

হ্যাঁ, তার গলায় রুমালের ফাঁস লাগানো ছিল, and she was dead, আর যে চেয়ারটায় সে বসে ছিল তারই সামনে, গল্প দূরে মালঞ্চর শয্যার ওপরে তোমার এই সিগ্রেট কেসটা আমি পাই। দেখ, চিনতে পারছ এই নাম এনগ্রেভ করা সোনার সিগ্রেট কেসটা? এটা বছর কয়েক আগে আমিই তোমার জন্মদিনে তোমাকে প্রেজেণ্ট করেছিলাম। তখুনি আমি বুঝতে পেরেছিলাম দীপ্তেন—

কি—কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?

তুমি কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিলে। রাত সাড়ে দশটায় তুমি আমাকে তোমার এই ঘর থেকে ফোন করেছিলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি ক্লাবে যাচ্ছ, আমি যেন সেইখানেই চলে যাই। আমি চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার আগে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ একবার তোমার বাড়িতে ফোন করে আমি তোমার চাকর বামাপদর কাছ থেকে জেনেছিলাম যে তুমি হিন্দুস্থান রোডে গিয়েছ। বলে গিয়েছ, তুমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবে।

কিন্তু ডলি···

শোন, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি সোয়া এগারোটা পর্যন্ত ক্লাবে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে প্রথমে এখানে আসি, এসে শুনলাম সাড়ে ন'টা নাগাদ তুমি এসে আবার বের হয়ে গিয়েছ। তোমার এখান থেকে ট্যাক্সিতে দি রিট্রিট মাত্র পনেরো মিনিটের রাস্তা, কাজেই ক্লাবে গেলে তোমার ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিৎ ছিল—

আমার অন্য জায়গায় একটু কাজ ছিল, তাই—

সে কাজ তোমার মালঞ্চর ওখানেই ছিল। সেই রকম সন্দেহ হওয়ায় আমি গাড়ি নিয়ে সেখানেই যাই এবং একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মালঞ্চর ঘরে যাই। এখন বুঝতে পারছ, তুমি যে সে রাত্রে দু'বার মালঞ্চর ঘরে গিয়েছিলে কি করে আমি বুঝেছিলাম।

কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর ডলি, আমি মালঞ্চকে হত্যা করিনি—

কিন্তু তোমার এই সিগ্রেট কেস সেখানে কি করে গেল দীপেন! আমি যদি পুলিশকে এটা জানিয়ে দিই তাদের তুমি কি বলে বোঝাবে ?

শোন, তাহলে সব কথাই তোমাকে বলছি। সে রাত্রে দ্বিতীয়বার বিশেষ একটা কারণে মালঞ্চর ঘরে আমাকে যেতে হয়। সে রাত্রে সাড়ে দশটা নাগাদ আমার ফ্ল্যাটে তার আসার কথা ছিল, কিন্তু সোয়া এগারোটা নাগাদও যখন সে এলো না, তখন আমি দ্বিতীয়বার তার ওখানেই যাই—

So you did, তুমি দ্বিতীয়বার ওখানে গিয়েছিলে স্বীকার করছ দীপেন ?

হ্যাঁ গিয়েছিলাম, but she was dead at that time, বিশ্বাস কর, I found her dead, strangled রুমালের বাঁধা তার গলায়, ঘটনার আকস্মিকতায় I was so much purturded যে আমি ধপ করে বিছানাটার ওপরে বসে পড়ি now what to do ! আর ঠিক সেই সময় ঘোরানো সিঁড়িতে আমি কার যেন পদশব্দ পাই, পাছে কেউ এসে আমাকে ঐ সময় ঘরের মধ্যে দেখতে পায় সেই ভয়ে আমি খাটের নীচে ঢুকে পড়ি।

A nice story—বল—বলে যাও।

Story ! It's a fact, সত্যি। তুমি ঘরে এলে, মালঞ্চকে মৃত দেখে তুমি অর্ধস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে উঠলে, তারপরেই বের হয়ে গেলে ঘর থেকে, যে পথে এসেছিলে সেই পথে। আমিও সেই পথে তোমার পিছু পিছু বের হয়ে আসি। তারপর সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে রাত বারোটার দু'চার মিনিট আগে ক্লাবে যাই, তুমি তখন সেখানে বসে ড্রিংক করছিলে। বিশ্বাস কর ডলি, আমি তোমাকে যা বললাম তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। কি হল, উঠছ কেন—ডলি, সত্যিই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, ডলি শোন—

টেপটা বাজিয়ে শুনছিলেন মিঃ চট্টরাজ, কিরীটী ও সুশীল চক্রবর্তী—লালবাজারে মিঃ চট্টরাজের অফিস কামরায়।

শুনলেন তো সব মিঃ চট্টরাজ, কিরীটী বলল. এ থেকে অন্তত দুটো ব্যাপার প্রমাণিত হচ্ছে—প্রথমত, সওয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই কোন একসময় মালঞ্চ দেবীকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়। আর দ্বিতীয়ত, সে রাত্রে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা বা পৌনে বারোটা পর্যন্ত দীপ্তেন ভৌমিকের movement suspicious, ঐ সময়টা ওকে ঘিরে একটা সন্দেহের কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে।

আপনি কি মনে করেন মিঃ রায়, চট্টরাজের প্রশ্ন, ঐ দীপ্তেন ভৌমিক ডলি দত্তর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে ?

শুধু সে কেন, ডলি দত্তও মিথ্যা বলে থাকতে পারে। যাক্ গে সে কথা, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছি একটু।

কি রকম ?

দেখা যাচ্ছে সে রাত্রে অকুস্থলে প্রথমে সুরজিৎ ঘোষালের

আবির্ভাব ও নাটকীয় ভাবে প্রস্থান, তার আগে দীপ্তেন ভৌমিকের প্রথম আবির্ভাব ও পরে রাত্রি সোয়া এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে দ্বিতীয়বার আবির্ভাব ঘটেছিল, ঐ সময়েই আবির্ভাব ঘটেছিল আরো একজনের, যেটা আমরা শুনেছিএকটু আগে টেপ থেকে শ্রীমতী ডলি দত্তর এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দ্বিতীয়বার দীপ্তেন ভৌমিক ও ডলি দত্তর আবির্ভাব ঘোরানো সিঁড়ির পথে। এখন আমাদের দেখতে হবে সে রাত্রে ঘোরানো সিঁড়ি পথে ঐ তিনজন ছাড়া আর কার ঐ ঘরে আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো জানবেন that is the person we are searching for, তাকেই আমরা খুঁজছি, মালঞ্চ হত্যারহস্যের মেঘনাদ।

ঐ তিনজন ছাড়া সে রাত্রে ঐ ঘরে আর কে যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়? হঠাৎ সুশীল চক্রবর্তী প্রশ্নটা করলেন।

কিরীটী সুশীল চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় সুশীল, Who else—সুরজিৎ ঘোষাল?

না, তিনি যাননি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার ঐ তালিকা থেকে তাকে বাদ দিতে পারো। দেখ সুশীল, সাধারণ কমন সেন্স অনুযায়ী ভেবে দেখ—সেটা সুরজিৎ ঘোষালের রক্ষিতার ঘর, এবং মালঞ্চ সুরজিৎ ঘোষালেরই রক্ষিতা ছিল। সেক্ষেত্রে নিজের রক্ষিতাকে হত্যা করার প্রয়োজন হলে প্রথমত ঐ রকম crude ভাবে তিনি মালঞ্চকে হত্যা করতেন না এবং দ্বিতীয়ত সেজন্য নিজের রুমালটা তিনি নিশ্চয়ই ব্যবহার করতেন না। অন্যতম exhibit হিসাবে যেটি আদালতে পেশ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত ঐ ধরণের একটা কাজ সুরজিৎ ঘোষালের মত একজনকে দিয়ে সম্ভব হতে পারে বলে আমার মন সায় দেয় না। না, তুমি অন্য কাউকে ভাবো—

তবে কি ঐ ডাঃ সমীর রায়?

সুশীল চক্রবর্তীর কথা শেষ হল না, তাকে এক প্রকার বাধা দিয়েই কিরীটী বললে, He is a doctor, মানুষকে হত্যা করবার অনেক উপায় জানা আছে তার, সুতরাং একজনকে ঐ ভাবে গলায় ফাঁস দিয়ে সে মারবে না।

তবে কি ডলি দত্ত?

হতে পারে। She had a strong motive also, তার দিক থেকে motive provocation দুই ছিল—তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কিরীটী।—

মিঃ চট্টরাজ, আমি চলি, সুশীল, তুমি যেমন এগোচ্ছিলে এগিয়ে যাও, ব্যাপারটা আদৌ খুব একটা কিছু জটিল নয়—

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আদালত কারোরই জামীন দেয়নি।

তদন্তসাপেক্ষ সুরজিৎ ঘোষাল ও মানদাকে জেল হাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে আদালত এবং পরবর্তী শুনানীর তারিখ পড়েছে আবার দশ দিন পরে।....

সোমনাথ ভাদুড়ীর চেম্বারে বসে কিরীটীর সঙ্গে সোমনাথ ভাদুড়ীর আলোচনা হচ্ছিল মালঞ্চর হত্যা মামলা নিয়েই।

সোমনাথ বলছিলেন, রায়মশাই, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, দীপ্তেন ভৌমিক আর ডলি দত্তকে কেন আপনি সুশীল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করবার পরামর্শ দিচ্ছেন না।

প্রথমত, ওদের গ্রেপ্তার করলে, উপযুক্ত প্রমাণ ও তথ্যাদির অভাবে ওদের আপনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবেন না।

কিন্তু ঐ টেপটা—

ওতে কেবল প্রমাণ করতে পারবেন দুর্ঘটনার দিন রাত্রে আগে ও পরে দীপ্তেন ভৌমিক দু'বার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে গিয়েছিল আর ডলি দত্ত একবার গিয়েছিল—তার দ্বারা প্রমাণ হবে না তারাই দুজন অথবা দুজনের একজন হত্যাকারী। ওদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে চোরা-কারবারী বলে চিহ্নিত করে, এবং তারপর ঐ চোরা-কারবারকে কেন্দ্র করে হত্যার ব্যাপারে আপনি আসতে পারবেন বটে, কিন্তু তখনো ঐ একই কথা থেকে যায়, প্রমাণ কই?

আমার কিন্তু ওদের দুটিকেই সন্দেহ হয়, হত্যারহস্যের সঙ্গে ওরাও লিপ্ত।

সেটা হতে পারে একমাত্র যদি প্রমাণ করা যায় যে ঐ চোরা-কারবারকে কেন্দ্র করেই ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

সেটা কি আদালতে প্রমাণ করা যাবে না?

সবটা আপনার জেরার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু একটা কথা তো আমাদের ভুললে চলবে না ভাদুড়ীমশাই, দীপ্তেন ভৌমিক, ডাঃ সমীর রায় এবং ডলি দত্ত—কাউকেই এখনও আমরা চোরা-

কারবারী বলে প্রমাণ করবার মত উপযুক্ত তথ্যাদি পাইনি।

আচ্ছা রায়মশাই, আপনি সুশান্ত মল্লিককে একেবারে বাদ দিচ্ছেন কেন?

না, বাদ দিইনি! বরং বলতে পারেন আমার একটি চোখ সর্বক্ষণ তার ওপর রয়েছে। যেহেতু তার দিক থেকে হত্যার মোটিভ অত্যন্ত strong ছিল তেমনি তার দিক থেকে possibilityও যথেষ্ট ছিল, সর্বশেষে ওর একটা strong alibi রয়েছে—হত্যার দু'দিন আগে থাকতে ভদ্রলোক হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই ছিলেন না, পুনরায় আবির্ভাব হয় তার হত্যার পরদিন সকালে রীতিমত নাটকীয় ভাবে—

লোকটা এখন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই আছে, তাই না রায়মশাই?

মৃদু হেসে কিরীটী বললে, যাবেই বা কোথায়, তার কোন আস্তানা নেই, সংস্থান নেই দু'মুঠো পেটের ভাতের, নেই কোন ভবিষ্যৎ, completely wrecked!

॥ চোদ্দ ॥

সোমনাথ ভাদুড়ীর ওখান থেকে ফিরতে বেশ রাতই হয়ে গিয়েছিল কিরীটীর, প্রায় পৌনে এগারোটায় ঘরে ঢুকেই থমকে পড়ে কিরীটী—একটা চেয়ারে বসে ডাঃ সমীর রায়—

কি ব্যাপার ডাঃ রায়, কতক্ষণ?

তা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তো হবেই।

কিন্তু বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি তো দেখলাম না—

না, আমি গাড়ি নিয়ে আসিনি, ট্যাক্সিতে এসেছি—ম্লান কণ্ঠে বললেন ডাঃ রায়, আমি আপনার সঙ্গে বিশেষ কারণে দেখা করতে এসেছি কিরীটীবাবু।

বলুন—

যা আমি পুলিশের কাছে বলতে পারিনি তা আপনার কাছে বলব।

বেশ তো, যা বলবার বলুন। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার বা সাহায্য করা সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করব।

মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় বুঝবেন, মালঞ্চর হত্যা মামলার সঙ্গে আজ যদি আমার নামটা জড়িয়ে পড়ে তাহলে আমার পক্ষে আর এ

শহরে বাস করা সম্ভব হবে না। তারপর একটু থেমে বললেন, আজ সকালে আমার বাড়ি ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা raid করেছে এবং সেটা যে পুলিশেরই নির্দেশে, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। সে জন্যে অবশ্য আমি ডরাই না, ইনকাম করে ট্যাক্স হয়তো পুরোপুরি দিইনি তার জন্যে হয়তো punishment হবে, তা হোক, কিন্তু ঐ scandal-এর সঙ্গে আমার নাম জড়ালে My future will be doomed ! তাই ভেবে দেখলাম আপনাকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

তা বলুন না—

মালঞ্চর সঙ্গে পেসেন্ট আর ডাক্তারের সম্পর্ক ছাড়াও অন্য সম্পর্ক ছিল আমার—বলতে শুরু করলেন সমীর রায়, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে সম্পর্কটা কোন ভালবাসা বা প্রেমের সম্পর্ক নয়, She had a tremendous sex, প্রচণ্ড একটা যৌন আবেদন ছিল মালঞ্চর, আর বলতে সংকোচ করব না, তাতেই আমি trapped হয়েছিলাম। প্রায়ই রাত বারোটার পর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে হিন্দুস্থান রোডে ওর বাড়িতে যেতাম, তারপর পিছনের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যেতাম। বুঝতে পারতাম কি জঘন্য নেশায় আমি জড়িয়ে পড়েছি, but I could'nt get out of it ! হত্যার রাত্রে ক্লাব থেকে বের হয়ে সোজা আমি হিন্দুস্থান রোডে মালঞ্চর বাড়িতে যাই—

রাত তখন ক'টা হবে ডাঃ রায় ?

ঠিক মনে নেই, তবে round about সাড়ে বারোটা পৌনে একটা হবে, যে পথে আমি রোজ যাই সেই পথেই ওপরে গেলাম—

বাথরুমের দরজাটা খোলাই পেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

বাথরুম অন্ধকার ছিল, চেনা পথ, ঘরে পা দিয়ে দেখি ঘরও অন্ধকার—

পরের দিন সকালে দরজা ভেঙে কিন্তু সুশীল চক্রবর্তী ঘরের আলোটা জ্বলছিল দেখতে পায়—

আমিই ঘরের আলোটা জ্বালাই এবং জ্বালাতেই দেখলাম মালঞ্চ চেয়ারে বসে আছে আর তার গলায় ফাঁস, বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি She was dead ! বুঝতেই পারছেন আমার তখনকার মনের অবস্থা, কিভাবে যে ঘর থেকে বের হয়ে বাথরুমে ঢুকেছি জানি না—তারপর

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখি সদরে একজন দাঁড়িয়ে আছে—

কে সে ?

জানি না, ভাল করে তাকাইনি, তবে সে যে আমায় ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠতে দেখেছিল সেটা ঠিকই—

দরজার কাছে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে পুরুষ না নারী ?

পুরুষ।

মনে হল কিরীটী যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি বুঝি ভাবছে—

রাত সোয়া বারোটার সময়ও বাথরুমের দরজাটা তাহলে খোলাই ছিল—পরে some one সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল—আশ্চর্য, কথাটা আমার মাথায় আগে আসেনি কেন—কিরীটী কথাগুলো যেন কতকটা আত্মগতভাবে বলে।

কিছু বলছেন, কিরীটীবাবু ?

একটা চাবির কথা ভাবছি।

চাবি !

হ্যাঁ, মালঞ্চর শয়নকক্ষের ইয়েল লকের ডুপলিকেট চাবিটার কথা ভাবছি ডাঃ রায়।

সেটাও ছিল সুরজিৎ ঘোষালের কাছে ?

হ্যাঁ, তার কাছেই থাকত সেটা। ঠিক আছে ডাঃ রায়, আপনি এখন বাড়ি যান—

পরের দিনই কিরীটী চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে হাজতে গেল সুরজিৎ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা গেল সুরজিৎ ঘোষাল একটা খাটিয়ার ওপর বসে আছেন। প্রচণ্ড গরম ঘরটার মধ্যে, ঘামছিলেন সুরজিৎ ঘোষাল। এই কয়দিনেই তার চেহারার যেন অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

মিঃ ঘোষাল—

কিরীটীর ডাকে সুরজিৎ ঘোষাল বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

হিন্দুস্থান রোডের বাড়ির সদরের আর মালঞ্চর ঘরের ইয়েল লকের ডুপলিকেট চাবি দুটো আপনার কাছেই থাকত, না ?

হ্যাঁ। কিন্তু যে চাবির রিংয়ে ঐ চাবি দুটো ছিল সেটা ঐ ঘটনার দিন সাতেক আগে হারিয়ে যায়—

কি করে হারাল ?

জানি না। আমার মনে হয় যাতে আমি যখন তখন সেখানে না যেতে পারি, surprise visit না দিতে পারি সেইজন্যে মালঞ্চই রিংটা সরিয়ে ছিল।

কেন আপনি surprise visit দিতেন ?

আগে কখনও দিতাম না, দেবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু মানদার কাছ থেকে যখন জানতে পারলাম আমি চলে আসার পর প্রায়ই রাত্রে মালঞ্চর ঘরে দীপ্তেন ভৌমিক আসে, তখন আমি দু'চার বার surprise visit দিয়েছি।

আপনি কোনদিন কি দীপ্তেন ভৌমিককে মালঞ্চর ঘরে পেয়েছেন ?

না, কিন্তু আমি দু' রাত্রে অন্তত টের পেয়েছি, তার ঘরে লোক ছিল—কথাবার্তা শুনেছি, ঘরে আলো জ্বলতেও দেখেছি। কিন্তু নিঃশব্দে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখেছি ঘরের আলো নেভানো— মালঞ্চ ঘুমাচ্ছে।

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, চোরের ওপর বাটপাড়ি—

আপনি কি বলতে চান, তাহলে—

হ্যাঁ, আপনার আসার আগেই তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যেত যে আপনি আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের লোক বাথরুম পথে পিছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সট্‌কে পড়ত, আপনি তাই কোনদিনই পাখিকে খাঁচার মধ্যে দেখেননি।

কি বলছেন মিঃ রায় !

If I am not wrong মিঃ ঘোষাল, ঐ মানদাই দু'পক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে দু'পক্ষের দৌত্যগিরি করত—

মানদা ! মানদার এই কাজ !

আচ্ছা মিস্টার ঘোষাল, আপনিই কি ডাঃ সমীর রায়কে ঐ বাড়িতে প্রথম নিয়ে যান ?

হ্যাঁ, ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। মাঝে মধ্যে মালঞ্চর পেটে প্রচণ্ড কলিক হত, তাই আমি একবার ডাঃ রায়কে ডেকে আনি, ডাঃ রায় তাকে তখন পেথিডিন ইনজেকশন দেন, ক্রমশ সেই পেথিডিনে মালঞ্চ এ্যাডিক্টেড হয়ে যায়—

আপনি তাহলে পেথিডিনের ব্যাপারটা জানতেন ?

জানতাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি কি করে মালঞ্চ পেথিডিন জোগাড় করত।

শুনলে আপনি হয়তো অবাক হবেন মিঃ ঘোষাল, কিরীটী বলল, আমার ধারণা, আপনার ঐ বন্ধু ডাক্তার সমীর রায়ই তাকে পেথিডিন সাপ্লাই করতেন।

না না মিঃ রায়, এ আপনি কি বলছেন। এ্যাবসার্ড। আমি জানি ডাঃ রায় ওকে পেথিডিনের অভ্যাস ছাড়াবার জন্যে সর্বদাই চেষ্টা করতেন, ওকে বকা-ঝকা করতেন—

আবার গোপনে তিনিই পেথিডিন যোগাড় করে দিতেন মালঞ্চকে। কারণ ডাঃ সমীর রায়ের মালঞ্চকে প্রয়োজন ছিল।

কি বলছেন আপনি!

ঠিকই বলছি। যদিও আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু ঐ পেথিডিন রহস্যর চাইতেও আরও বড় রহস্য আপনার অজ্ঞাতে ঐ হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেই দানা বেঁধে উঠেছিল।

বড় রহস্য!

হ্যাঁ, চোরা-কারবার—হাসহিসের চোরা-কারবার।

না না, তা কখনই হতে পারে না কিরীটীবাবু।

ঐ হিন্দুস্থান রোডের নীচের একটা ঘর সর্বদা তালা দেওয়া থাকত, আপনার নজরে পড়েনি? কিরীটীর প্রশ্ন।

পড়েছে। কিন্তু আমি ভেবেছি এমনিতেই বুঝি তালা দেওয়া থাকে ঘরটায়।

সেই ঘরেই একটা দেওয়াল আলমারির মধ্যে থাকত চোরাই মাল। ঐখানেই এসে মাল জমা হত তারপর ওখান থেকেই পাচার হত তার উদ্দীষ্ট পথে।

মালঞ্চ ঐ সব করত?

একা মেয়েমানুষ কি তা করতে পারে, না তাই সম্ভব! ঐ দলে আরো কে কে আছে জানি না, তবে তাদের মধ্যে দুজনকে আমরা জানতে পেরেছি। তারা হলেন দীপ্তেন ভৌমিক আর শ্রীমতী ডলি দত্ত। আর যারা আছে এখনও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তাই—তাই ইদানীং টাকার কথা কখনও বলত না মালঞ্চ, আমি ভেবেছি দীপ্তেন ভৌমিক ওকে টাকা দিচ্ছে দু'হাতে। উঃ, এখন মনে হচ্ছে আমিই যদি ওকে খুন করতে পারতাম—

জেল হাজত থেকে একসময় বের হয়ে এলেন কিরীটী ও চট্টরাজ। এবং চট্টরাজের গাড়িতেই লালবাজারে যেতে যেতে কিরীটী বললে,

বর্তমান হত্যা মামলার একটা জটিল পয়েন্টের সমাধান আজ পেয়ে গিয়েছি মিঃ চট্টরাজ।

কি করে সমাধান হল? চট্টরাজ শুধালেন।

ঐ ডুপলিকেট চাবি।

যেটা হারিয়েছেন ঘোষাল?

হারায়নি।

তবে?

সেটা চুরি গিয়েছে।

কে চুরি করেছে, মালঞ্চ?

হ্যাঁ। এক ফাঁকে সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে মালঞ্চই সরিয়ে ফেলেছিল চাবিটা কিন্তু বেচারী ভাবতেও পারেনি যে ঐ চাবিই শেষ পর্যন্ত হবে তার মৃত্যুবাণ।

তাহলে কি মিঃ রায়—

হ্যাঁ মিঃ চট্টরাজ, ঐ চাবির সাহায্যেই হত্যাকারী সে রাত্রে কোন এক সময়ে মালঞ্চর ঘরে ঢুকে তার কাজ শেষ করে বের হয়ে এসেছিল সকলের অলক্ষ্যে—যখন সম্ভবত সে পেথিডিনের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল—

সত্যি বলছেন!

হ্যাঁ। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সাড়ে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে কোন এক সময় ব্যাপারটা ঘটেছিল। মালঞ্চ নিশ্চিন্ত ছিল সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে, কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে, যে নাগরের হাতে সে চাবিটা তুলে দিয়েছিল সে সেই চাবির সাহায্যেই তার ঘরে ঢুকে তার গলায় মৃত্যু ফাঁস দেবে। চলুন মিঃ চট্টরাজ, একবার হিন্দুস্থান রোডের বাড়িটা হয়ে যাওয়া যাক। সুশান্ত মল্লিককে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

চট্টরাজকে নিয়ে কিরীটী যখন হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে পৌঁছাল তখন সুশান্ত মল্লিক তার ঘরেই খাটের উপর বসে একা একা নিশ্চিন্ত মনে সিগ্রেট টানছিল। ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

বসুন, বসুন সুশান্তবাবু, আপনার কাছ থেকে একটা জিনিস নিতে এসেছি।

জিনিস! কি জিনিস?

এই বাড়ির সদরের আর মালঞ্চর ঘরের দরজার ডুপলিকেট চাবি কি দুটো ?

ডুপলিকেট চাবি ?

হ্যাঁ, যেটা মালঞ্চ হাতিয়েছিল সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে, তারপর চোরের ওপর বাটপাড়ি করে তার কাছ থেকে আপনি যেটা হাতিয়েছিলেন !

কি বলছেন আপনি ! আমি সে চাবি সম্পর্কে কিছুই জানি না।

অস্বীকার করে কোন লাভ নেই প্রশান্তবাবু, আমি জানি সে চাবি আপনিই হাতিয়েছিলেন কোন এক সময়—

বিশ্বাস করুন, সত্যিই সে চাবি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল—চলুন মিঃ চট্টরাজ। তারপর একটু এগিয়েই কিরীটী ফিরে দাঁড়াল, হ্যাঁ একটা কথা সুশান্তবাবু, মিঃ চট্টরাজ কিন্তু জানতে পেরেছেন মালঞ্চর হত্যাকারী কে ?

কে ? কে মালঞ্চকে হত্যা করেছে ?

আপনি তো জানেন।

আমি জানি !

হ্যাঁ, আপনি জানেন সুশান্তবাবু, কিরীটীর গলার স্বর গম্ভীর। আপনি বলতে চান সে রাত্রে আপনি তাকে দেখেননি ?

আমি দেখব কি করে, আমি তো সে সময় এ বাড়ির ত্রিসীমানাতেও ছিলাম না।

You are telling lie—আপনি মিথ্যা কথা বলছেন সুশান্তবাবু, আপনি ঐ সময়টা এই বাড়িরই আশেপাশে বা বাড়ির মধ্যেই কোথাও ছিলেন, নচেৎ আপনি জানলেন কি করে যে মালঞ্চকে হত্যা করা হয়েছে ? সে আর সাড়া দেবে না ?

বিশ্বাস করুন, আমি তাকে হত্যা করিনি।

তবে সে রাত্রে আপনি কেন ঘোরানো সিঁড়িপথে চোরের মত মালঞ্চর ঘরে ঢুকেছিলেন ?

হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু She was dead at that time—she was dead.

সে রাত্রে চোরের মত কেন এসেছিলেন এ বাড়িতে ?

সেদিন তাকে আমি দুপুরে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম তার প্রস্তাবেই আমি রাজি, আপাতত দশ হাজার টাকা পেলে এই

বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যেতে প্রস্তুত আছি। সে বলেছিল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে টাকাটা নিয়ে যেতে। আর ওই পিছনের সিঁড়ি দিয়েই ওপরের ঘরে গিয়ে সে টাকা নিয়ে আসতে বলেছিল আমায়। কিন্তু ঘরে ঢুকে যখন দেখলাম সে মৃত, তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে পালাই....

হুঁ। তাহলে আপনিও সে রাতে তাকে ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখেছেন ?

হ্যাঁ।

মিঃ চট্টরাজ, ওকে এ্যারেস্ট করুন, কিরীটী গম্ভীর গলায় বললে।

বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি বলছি, মলিকে আমি খুন করিনি—খুন করিনি। কান্নায় ভেঙে পড়ল সুশান্ত মল্লিক।

॥ পনেরো ॥

পরের দিন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হল—মালঞ্চ মল্লিকের স্বামী সুশান্ত মল্লিক স্ত্রী হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার।....

বেলা তখন সকাল সাড়ে নটা। লালবাজারে মিঃ চট্টরাজের অফিস ঘরে এসে ঢুকল কিরীটী।

আসুন মিঃ রায়, চট্টরাজ বললেন, দেখেছেন বোধহয়, আজ নিউজ পেপারে নিউজটা ফ্ল্যাশ করা হয়েছে ?

দেখেছি। কিন্তু আপনাকে যেমন বলেছিলাম ফোন করেছিলেন ?

হ্যাঁ, এখুনি হয়তো আসবেন ওরা—

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রথমে ডাঃ সমীর রায় এবং তার পৌঁছবার মিনিট দশেক পরেই দীপ্তেন ভৌমিক এসে পড়লেন।

কিরীটীই বললে, মিঃ ভৌমিক, ডাঃ রায়, খুব অবাক হচ্ছেন বোধহয় আপনারা, কেন এ সময় ফোনে আপনাদের জরুরী তলব দিয়ে মিঃ চট্টরাজ এখানে ডেকে আনিয়েছেন, তাই না ? শুনুন, উনি মালঞ্চর হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন দুজনেই একসঙ্গে অর্ধস্ফুট প্রশ্ন করলেন, কে—কে ?....

যখন আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে জানতে পারবেন বৈকি। একটু ধৈর্য ধরুন। এরপর গম্ভীর কণ্ঠে কিরীটী বলল, ডাঃ রায়, সে রাত্রে চিনতে পারেননি আপনি কাকে হিন্দুস্থান রোডের সদরে দেখেছিলেন ?

না।

যার কাছে ঐ বাড়ির সদর দরজা আর দোতলায় মালঞ্চর ঘরের ডুপলিকেট চাবি দুটো ছিল তাকেই আপনি দেখেছিলেন।

ডুপলিকেট চাবি ?

হ্যাঁ, আপনাকে মালঞ্চ দেবী দেননি সে চাবিটা ?

না।

দীপ্তেনবাবু—আপনাকে ?

না।

মিথ্যা বলছেন দীপ্তেনবাবু, সুরজিৎ ঘোষালের পকেট থেকে হাতিয়ে মালঞ্চ আপনাকেই দিয়েছিল ডুপলিকেট চাবিটা, যাতে আপনি যে কোন সময়েই ঐ ঘরে আসতে পারেন।

বলতেই হবে আপনার মস্তিষ্ক সত্যিই রীতিমত উর্বর—ব্যঙ্গ ভরা গলায় দীপ্তেন ভৌমিক বললেন।

দীপ্তেনবাবু, আমি কিরীটী রায় এবং কিরীটী রায় বলতে যে কি এবং কতখানি বোঝায় তা আপনার সম্ভবত জানা নেই বলেই এখনো আপনি পালাবার পথ খুঁজছেন। আপনি জানেন না যে আপনার ফাঁদে আপনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন—

ফাঁদে !

হ্যাঁ। পরে কোন এক সময় এসে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঐ চাবির সাহায্যেই আবার পরে এক সময় রাত্রে এসে প্রথমে সদর ও পরে মালঞ্চর শোবার ঘর খুলে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন আপনার ফেলে যাওয়া সিগ্রেট কেসটা নেবার জন্য, কিন্তু আপনি ভাবতেও পারেননি ইতিমধ্যে সেটা ডলি দত্ত এসে নিয়ে গিয়েছে। আর সিগ্রেট কেসটা না পেয়েই আপনি ফিরে যাবার সময় বাথরুমের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে যান, and that was your second thought. একবারও আপনার মনে হল না যে, যে মালঞ্চকে হত্যা করল সে কোন্ পথে বের হয়ে যাবে—এবং সে ব্যাপারটা প্রথমেই পুলিশের মনে জাগতে পারে।

চট্টরাজের ঘরের মধ্যে যেন একটা শ্বাসরোধকারী স্তব্ধতা নেমে আসে। দীপ্তেন ভৌমিক স্থিরদৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকেন। ডাঃ সমীর রায়ও স্তব্ধ।

কিরীটীর ঋজু কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, আপনি হত্যাকাণ্ডটা

যথেষ্ট কুল ব্রেনেই পরিকল্পনা করে ছিলেন and it was pre-planned murder—সুরজিৎ ঘোষালের নাম লেখা একটা রুমাল সেই কারণেই আপনি হাতিয়ে ছিলেন পূর্বাহ্নে, যদিও জানি না কি করে সেটা আপনার হস্তগত হয়েছিল, আশ্চর্য হব না যদি শুনি যে আপনার প্রেয়সীই সেটা আপনার হাতে তুলে দিয়ে ছিল। সবই প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু আপনার second thought অনুযায়ী over cautious হতে গিয়ে আপনি যদি ঐ ঘরে ফিরে এসে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে না যেতেন তাহলে ঐ চাবির প্রশ্নটি আমার মাথায় হয়তো এত সহজে উঁকি দিত না, আর আপনিও ঐ একটিমাত্র ভুলের জন্যে এত সহজে exposed হয়ে যেতেন না।

ঐ একটি মাত্র ভুলই আপনার গলায় ফাঁস দিয়েছে দীপ্তেনবাবু—উঁহু দরজার দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না, ওখানে ৩৩ জন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছে। মিঃ চট্টরাজ প্রস্তুত হয়েই আপনাকে আজ এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন, আর আপনার মনে নিশ্চয়তা আনবার জন্যেই আজকের সমস্ত কাগজে সুশান্ত মল্লিকের গ্রেপ্তারের সংবাদটা ফ্ল্যাশ করা হয়েছিল। আপনি হয়তো ভাববেন দীপ্তেনবাবু, মালঞ্চকে আপনিই যে হত্যা করেছেন পুলিশের হাতে তার কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু মালঞ্চ হত্যার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুলিশের হাতে না থাকলেও হ্যাসহিস সিগ্রেটের চোরা-কারবারের সঙ্গে যে আপনি লিপ্ত ছিলেন তার অনেক প্রমাণই পুলিশের হাতে এসেছে। আদালতে যখন আপনি সোমনাথ ভাদুড়ীর সওয়ালের সামনে দাঁড়াবেন তখন দেখবেন মুক্তির কোন রাস্তাই খোলা নেই—

থামল কিরীটী তারপর চট্টরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ চট্টরাজ, আপনার কাজ এখন আপনিই করুন।

মিঃ চট্টরাজ বললেন, You are under arrest মিঃ ভৌমিক—

দীপ্তেন ভৌমিক নিঃশব্দে চট্টরাজের দিকে তাকালেন।

———

The Online Library of Bangla Books

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

নীল সমুদ্র

॥ এক ॥

সরিৎশেখর কল্পনাও করতে পারে নি। পুরীতে এসে হঠাৎ ঐ ভাবে ঐ অবস্থায় তার আবার অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

অবিশ্যি আবার অনুরাধার সঙ্গে দেখা হবার একটা প্রত্যাশা সরিৎশেখরের অবচেতন মনের মধ্যে কোথায় যেন ছিল। এবং দেখা যে হবেই সে বিশ্বাসও ছিল সরিৎশেখরের—

পথ চলতে চলতে কতদিন অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক তাকিয়েছে সরিৎশেখর নিজের অজ্ঞাতেই—তার মনটা যেন কার প্রত্যাশায় সর্বক্ষণই প্রতীক্ষা করেছে।

তাই বুঝি আজ পুরীতে এসে—অনুরাধাকে দেখে ও থমকে দাঁড়িয়েছিল। সত্যি!—এমনি আকস্মিক ভাবে দীর্ঘ দুই বৎসর পরে যে আবার অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সরিৎশেখর ভাবতেও পারেনি।

জীবনের দু' দুটো বৎসর তো নেহাৎ একটা কিছু কম সময় নয়। অকস্মাৎ একদিন অনুরাধা সরিৎশেখরের জীবন থেকে সরে গিয়েছিল। এবং যাবার আগে বলে গিয়েছিল—আজও সরিৎশেখরের অনুরাধার সে কথাগুলো মনে আছে। ভোলেনি, ভুলতে পারেনি সরিৎশেখর।

ভেবে দেখলাম সরিৎ—

তখনো জানে না, কল্পনাও করতে পারেনি সরিৎশেখর, কি বলতে চায় অনুরাধা তাকে।

সকাল থেকেই শরীরটা ভালো ছিল না বলে সরিৎশেখর কলেজে পড়াতে যায়নি। ডিকেন্সের একটা উপন্যাস নিয়ে শয্যায় শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। বাইরে সেদিন যেন বাতাসে একটা অগ্নির জ্বালা। একটি মাত্র জানালা খোলা ঘরে হঠাৎ অনুরাধা ঢুকল।

সরিৎ—

এ কি! তুমি এই প্রচণ্ড গরম দুপুরে—

হ্যাঁ, কলেজেই গিয়েছিলাম তোমার, গিয়ে শুনলাম তুমি কলেজে যাওনি, তাই সোজা অফিস থেকে এখানেই চলে এলাম।

মনে হচ্ছে খুব জরুরী প্রয়োজন, তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বোস রাধা।

ঐ নামেই ডাকত সরিৎ অনুরাধাকে পরিচয় হবার কিছুদিন পর থেকে।

ভেবে দেখলাম—মানে, অনুরাধা যেন কেমন একটু ইতস্ততঃ করতে থাকে।

যে তাগিদে কথাটা বলবার জন্য সরিতের কলেজ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে সেখানে তাকে না পেয়ে এখানে এসেছে সে তাগিদটা যেন আর অনুভব করছে না, অনুরাধা।

মনের মধ্যে কি কোন দ্বন্দ্ব ছিল তার তখনো।

হয়ত ছিল—অনেকবার কথাটা মনে হয়েছে গত এই দুই বৎসরে সরিৎশেখরের। মনে হয়েছে সেদিন যে কথাগুলো বলেছিল তাকে অনুরাধা—তার জন্য কোন স্থির পূর্ব সংকল্প ছিল না।

যা বলেছিল সে সেদিন সেটাই তার সেদিনকার হয়ত শেষ কথা ছিল না।

অনুরাধা কিন্তু বসল না। একটু থেমে আবার বললে, ভেবে দেখলাম সরিৎ—

কি ব্যাপার? কি আবার ভেবে দেখলে? মৃদু হাসি সরিতের ওষ্ঠ প্রান্তে।

তোমার আমার সম্পর্কের এইখানেই শেষ হয়ে যাওয়া ভালো।

কথাটা শুনেই সরিৎশেখর শয্যার উপর উঠে বসে, কয়েকটা মুহূর্ত অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুরাধা তখনও বসেনি দাঁড়িয়েই আছে।

আজও মনে আছে স্পষ্ট সেদিনের অনুরাধার চেহারাটা—পরণে তার সবুজ পাড় একটা দামী তাঁতের শাড়ি, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা গায়ের ব্লাউজ। মাথার চুলগুলো আলগা ভাবে একটা খোঁপা করা—খোঁপাটা কাঁধের ওপর ভেঙে পড়েছে। ডান হাতটা খালি, বাঁ হাতে ছোট একটা রিস্টওয়াচ। চোখে সরু সোনালী দামী ফ্রেমের চশমা। পায়ে চপ্পল।

সরিৎশেখর চুপ করেই ছিল, অনুরাধা আবার বলল, ভেবেছিলাম একবার একটা চিঠি লিখে তোমাকে কথাটা জানিয়ে দেব, কিন্তু পরে মনে হল আমার যা বলবার সামনা সামনিই তোমাকে জানিয়ে দেওয়া ভালো। আমি চললাম—

এটুকু বলবার জন্যই কি এতটা পথ এই দুপুর রোদে ছুটে এসেছ?

তাই।

আর কিছুই তোমার বলবার নেই রাধা?

না।

কেন এভাবে এতদিনকার সম্পর্কটা শেষ করে দিয়ে যাচ্ছ তাও বলবে না?

কোন প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন নেই?

না। কারণ তুমি তো সবই জানো। জানা কথাটা নতুন করে আবার আমারই বা বলবার কি আছে, আর তোমারই বা শোনবার কি আছে বল।

কিন্তু বিশ্বাস কর—

থাক, মিথ্যা কতকগুলো কথা আর নাই বা বললে, বানিয়ে বানিয়ে—

ঐ শেষ কথা অনুরাধার। আর সে দাঁড়ায়নি। ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ দুই বৎসর পরে আজ অকস্মাৎ পুরীর সমুদ্রতটে অনুরাধার মুখোমুখি সে।

বেলা তখন আটটা কি সাড়ে আটটা হবে সকাল।

হোটেল থেকে বের হয়ে সরিৎশেখর সমুদ্রের দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ কানে এলো তার একটা হাসির উচ্ছ্বাস, অনেক দিনের অনেক পরিচিত সেই হাসি, যে হাসি আজও ভোলেনি। তার কানের পর্দায় এসে ঝংকার তুলতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সামনের দিকে তাকিয়েছিল।

পরনে সুইমিং কস্টিউম, একটা বিরাট টাওয়েল গায়ে জড়ানো—স্নান সেরে বালুর ঢালু পাড় ধরে অনুরাধা ও বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বা তারও হয়ত কিছু বেশীই বয়সের এক ব্যক্তি উপরের দিকে উঠে আসছিল সমুদ্রের জল থেকে।

একেবারে মুখোমুখি—মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান। অনুরাধার দৃষ্টি কিন্তু সামনের দিকে নয়, অন্য দিকে প্রসারিত।

সরিৎশেখরের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠ হতে বের হয়ে এসেছিল নামটা, অনুরাধা—অনুরাধাও সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়েছিল, উচ্চারিত ডাকটা তার কানে যেতেই বোধ হয় সরিতের দিকে তাকিয়ে ছিল।

অনুরাধা! সরিতের অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

সরিৎ! অনুরাধার কণ্ঠেও বিস্ময়।

অনুরাধার সঙ্গী লোকটি সেই সময় সামনের দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে সরিৎশেখরের মনে হয়, অনুরাধার সঙ্গীর সঙ্গে তার পরিচয় না থাকলেও ভদ্রলোককে সে যেন ইতিপূর্বে দেখেছে—কোথায় দেখেছে অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে না সরিৎশেখরের, তবে তাকে পূর্বে দেখেছে।

অনুরাধা কিন্তু অতঃপর সরিৎশেখরের দিকে এগিয়েও আসে না বা তার সঙ্গে আর কোন কথাও বলে না।

সরিৎশেখরও সে চেষ্টা করে না। সরিৎশেখর অন্য পথ ধরে ধীরে ধীরে বালুবেলায় নেমে যায়। সমুদ্রে তখন অনেক স্নানার্থীর ভিড়।

নানা বয়েসী নারী পুরুষ সমুদ্রের জল তোলপাড় করছে।

সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলো এসে বালুবেলায় একটার পর একটা অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে একটানা গর্জন তুলে।

সরিৎশেখর পাড়ের দিকে তাকাল—একটু আগে যেখান দিয়ে অনুরাধা ও সেই ভদ্রলোক হাত ধরাধরি করে চলে গেল তার দৃষ্টির সামনে দিয়েই।

সরিৎশেখর দেখল যে হোটেলে সে উঠেছে ওরা সেই হোটেলেই গিয়ে ঢুকল। তাহলে অনুরাধা সে যে হোটেলে উঠেছে সেই হোটেলেই উঠেছে।

আজই সকালে পুরী এক্সপ্রেসে সরিৎশেখর পুরী এসে পৌঁচেছে। হোটেলে পৌঁছেই সে বের হয়ে পড়েছিল। সমুদ্রের জলে স্নান করার চাইতে ধীরে ধীরে ভেজা বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে তার অনেক ভালো লাগে।

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে আবার অনুরাধাকে দেখল সরিৎশেখর। হ্যাঁ, মনে মনে হিসাব করে সরিৎশেখর—ঠিক দুই বৎসর পরেই, সময়টা না ভোলার কথা নয়, জীবনের একটা পরিচ্ছেদে অকস্মাৎ যেখানে দাড়ি পড়েছিল—সে সময়টা কি কেউ ভুলতে পারে।

সরিৎশেখরও পারে নি। সরিৎ ভেবেছিল অনুরাধা নিশ্চয়ই কলকাতায় নেই। নচেৎ পথে কখনও না কখনও নিশ্চয়ই দেখা হত, বিশেষ করে কলেজে যাতায়াতের পথে। ঠিক ভেবেছিল নয়, মনে হয়েছিল বুঝি তার অনুরাধা হয়তো কলকাতায় নেই। কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায়ও হয়ত সে চলে গিয়েছে।

কাউকে বিবাহ করে হয়ত সংসারও পেতেছে। অনুরাধা এখন অন্যের।

তাছাড়া কলকাতায় থাকলে কখনো না কখনো নিশ্চয়ই তাদের একের সঙ্গে অন্যের দেখা হতোই—বিশেষ করে কলেজে যাতায়াতের পথে।

কারণ ঐ পথ দিয়েই অনুরাধাও কলেজে যেত এবং প্রথম আলাপ তাদের ঐ পথ ধরে যেতে যেতেই এক হঠাৎ আসা দুর্যোগের মধ্যে।

তার আগেও অবিশ্যি সরিৎ দেখেছে অনুরাধাকে ঐ পথ ধরে যাতায়াত করতে। প্রথম আলাপের সেই দিনটা—

সময়টা জুলাইয়ের শেষাশেষি, কলকাতা শহরে বর্ষা নেমে গিয়েছে। যখন তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে আকাশ কালো করে। কখনও বা কম সময় কখনও বা বেশি সময় সে বৃষ্টি।

ছাতা নিয়ে সরিৎ কখনো বড় একটা বের হত না, কারণ বেরুবার সময় ছাতার কথাটা তার মনেই পড়ত না। কিন্তু সেদিন ছাতা নিয়েই সরিৎ বের হয়েছিল। আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিল, বোধ করি সেই আশংকাতেই।

মাত্র দুটো ক্লাস ছিল সরিতের সেদিন। বেলা তিনটের মধ্যেই কলেজ থেকে সে বের হয়ে পড়েছিল—গড়িয়াহাটার মোড়ে বাস থেকে নেমে ও লেকের দিকে হাঁটছিল—রজনী সেন ষ্ট্রীটে তার বাড়ি।

প্রচণ্ড গরম সেদিন। আকাশে কেমন যেন একটা থম্‌থমে মেঘলা মেঘলা ভাব। বৃষ্টি যে কোন মুহূর্তেই নামতে পারে।

রাস্তায় বড় একটা তেমন লোকজন নেই। দোকান পাট অবিশ্যি খোলা, মধ্যে মধ্যে বাস প্রাইভেটকারগুলো এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামল।

হাতে ছাতা থাকা সত্ত্বেও সরিৎ ছাতাটা খুলবার সময় পায় না, ভিজেই যায়। তাড়াতাড়ি একটা দোকানের মধ্যে উঠে পড়ে। কারণ ও বুঝেছিল ছাতা দিয়ে ঐ বৃষ্টির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

তার পিছনে পিছনে অনুরাধাও উঠে পড়েছিল। ছাতা সঙ্গে ছিল না তার। একটা মোটা বই ও একটা মলাট দেওয়া খাতা। চোখে সরু সৌখিন সোনালী ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচে জলের ছিটে লেগে আছে।

দুজনের চোখাচোখি হতেই অনুরাধা মৃদু সলজ্জ হাসি হাসল।

সরিৎশেখরের ওষ্ঠ প্রান্তেও হাসি জাগে।

অনুরাধা চশমাটা চোখ থেকে খুলে শাড়ির আঁচলে কাচটা মুছতে থাকে।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে তখন।

দোকানে কিছু ক্রেতা ছিল, ঐ বৃষ্টিতে তারাও আটকে পড়েছে।

সরিৎশেখর ও অনুরাধা সেদিন তখন কেউ কারো নাম জানে না। জলের প্রবল ছাটে দুজনেই ভিজে যাচ্ছিল। আর একটু দোকানের ভিতর ঢুকে গেল তারা। বৃষ্টি ধরবার নাম গন্ধ নেই।

আপনাকে প্রায়ই দেখি এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে—সরিৎশেখরই প্রথমে কথা বললে।

অনুরাধা বললে, আপনাকেও দেখি আমি। আপনি বুঝি কাছেই থাকেন ?

সরিৎশেখর বললে, রজনী সেন স্ট্রীটে।

ও মা, তাই নাকি ! আমিও তো ঐ রাস্তাতেই থাকি। অনুরাধা বললে, আপনার বাড়ির কত নম্বর বলুন তো ?

সরিৎ যে বাড়ির নম্বরটা বললে তার পাঁচটা নম্বর পরে হলেও মাঝ পথে একটা ছোট গলির বাঁক আছে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িটা দেখা যায় না অবিশ্যি।

অনুরাধা আবার বললে, এ পথে যাতায়াতের সময় ছাড়াও আপনাকে আমি আর একটা বাড়িতে দেখেছি—

কোথায় বলুন তো ? সরিৎ শুধাল।

কেতকীদের বাড়িতে, ডোভার লেনে।

বুঝেছি, আমার পিসিমার বাড়ি। কেতকী আমার পিসতুতো বোন।

সেদিন কেতকীর জন্মদিন ছিল, অনুরাধা বললে, আমিও গেছিলাম। আপনার হাতে ছিল একটা বইয়ের প্যাকেট ও একগোছা রজনীগন্ধা।

রজনীগন্ধা কেতকীর খুব প্রিয় ফুল।

জানেন, আমিও সেদিন রজনীগন্ধা নিয়ে গিয়েছিলাম। অনুরাধা বলল।

দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে হাসল।

বৃষ্টি থামার কিন্তু কোন লক্ষণই নেই। পথে বেশ জল জমেছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অনুরাধাই প্রথমে উৎকণ্ঠার সঙ্গে

বললে, তাই তো, বাড়ি যাব কি করে বুঝতে পারছি না। রাস্তায় তো দেখছি এক হাঁটু জল জমে গেল।

জল ভেঙে যাবেন কি করে, এখান থেকে বেশ কিছুটা পথ—সরিৎশেখর বললে।

বুঝতে পারছি না ঠিক কি করব। চিন্তিতভাবে অনুরাধা বললে।

সেদিন শেষ পর্যন্ত একটা রিক্‌শা ডেকেই দুজনে উঠে বসেছিল। সরিৎ প্রথমে রিক্‌শায় উঠতে চায়নি কিন্তু অনুরাধা তার কোন কথা শোনেনি। সেই আলাপ এবং সেই দিনই ওরা জানতে পারে পরস্পরের নাম।

ডঃ সরিৎশেখর সেন। কলেজের প্রফেসার ইকনমিক্সের। আর অনুরাধা সোম। ডিগ্রী কোর্সের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রী। অনুরাধার সাবজেক্টও ছিল ইকনমিক্স।

তারপর থেকে দুজনার দেখা হলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পথের মধ্যে বা পথ চলতে চলতেই কথা বলত। কলেজে যাতায়াতের পথেই বেশীর ভাগ।

সেই আলাপই ক্রমশ উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এনে দিয়েছিল।

তারপর অনুরাধা বি এ পাশ করে একটা অফিসে চাকরী পেয়ে গেল যেন হঠাৎই।

অনুরাধার চাকরির প্রয়োজন ছিল সত্যিই একটা। বিধবা মা, ছোট একটি বোন ও সে নিজে, তিনজনের সংসার! রজনী সেন স্ট্রীটের বাড়িটা ছিল দোতলা, উপরে নীচে খানচারেক মাত্র ঘর, অবিশ্যি রান্নাঘর ও বাথরুম আলাদা। অনুরাধার বাবা দ্বিজেন সোম চাকরি করতে করতে হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়েন একটা এ্যাক্সিডেণ্টে। কমপেনসেসান ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড যা পেয়েছিলেন রজনী সেন স্ট্রীটের ঐ বাড়িটি তাই দিয়ে তৈরি করেছিলেন। অনুরাধার বয়স তখন সতেরো। সবে কলেজে ঢুকেছে। দ্বিজেন সোম মারা গেলেন।

অনুরাধার মা বাড়ির দোতলাটা ভাড়া দিতে কতকটা বাধ্য হলেন। হাতে সামান্য যা অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়েই সংসার চলতে লাগল, আর অনুরাধার কলেজে পড়া ও ছোট বোন মধুছন্দার স্কুলের পড়া। কিন্তু সঞ্চিত অর্থ তখন প্রায় শেষ। কাজেই পাশ করার পর অনুরাধার একটা চাকরির প্রয়োজন ছিল।

পাশ করার পরই চাকরি পাওয়া এত সহজ নয়—আর পাবেও না হয়ত জেনেও অনুরাধা একটার পর একটা চাকরির এ্যাপ্লিকেশন করে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক বিরাট ফার্মের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার মিঃ সলিল দত্ত মজুমদারের কাছে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েই চাকরি হয়ে গেল তার। অনুরাধার খুশির অন্ত ছিল না সেদিন।

সংবাদটা এসে সেই দিনই সন্ধ্যার পর সরিৎশেখরকে সে দিয়েছিল।

সরিৎ একটা Surprise দেবো তোমাকে।

সারপ্রাইজ—

হ্যাঁ—বলত—কি হতে পারে?

কেমন করে বলবো—আমি ত আর গণৎকার নই?

তবু গেস্ কর।

তার চাইতে তুমিই বল রাধা।

পারলে না তো?

না।

জানো আমার একটা চাকরি হয়ে গেছে আজ।

চাকরি! কোথায় চাকরি পেলে? কি চাকরি রাধা?

একটা মস্ত অফিসে জানো। মাইনে আড়াইশো টাকা, আর মিঃ দত্ত মজুমদার বলেছেন, শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ রাইটিংটা শিখে নিতে পারলে আরও বেশী মাইনে পাব। পারব না শিখে নিতে শর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিংটা?

কেন পারবে না।

জানো সরিৎ, ইণ্টারভিউতে আমাকে কিছুই তেমন জিজ্ঞাসা করেননি মিঃ দত্ত মজুমদার। কেবল আমার বাড়িতে কে কে আছে, বাবা মারা গেছেন এবং আর্নিং মেম্বার আর ফ্যামিলিতে কেউ নেই শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দিলেন। সত্যি ভদ্রলোক ভারি ভালো—

সরিৎশেখর চুপ করে ছিল।

ঐ চাকরিটা পাবারই মাসচারেক বাদে, হঠাৎ এক দ্বিপ্রহরে সরিতের বাড়িতে এসে পরস্পরের মধ্যে সমস্ত সম্পর্কের ছেদ করে দিয়ে গিয়েছিল অনুরাধা।

ভিজে বালির উপর দিয়ে সাগরের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ঐ সব কথাই মনে পড়ছিল আজ সরিৎশেখরের। গত দুই বৎসরের মধ্যে

আর তার অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়নি কখনো। দুই বৎসর পরে আজ আবার সাক্ষাৎ হল।

অনুরাধার সঙ্গের ভদ্রলোকটি কে? কথাটা সরিতের মনের মধ্যে তখন আনাগোনা করছে।

বেশ মোটাসোটা ভারিক্কী চেহারা। ভদ্রলোকটির পরনেও ছিল সুইমিং কস্টিউম, গায়ে জড়ানো ছিল একটা বড় টাওয়েল। স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে অনেকটা হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক ভাবে চলে গিয়েছিল সরিৎশেখর।

হঠাৎ যেন তার মনে হল মাথার উপরে রোদটা বেশ চড়া। পায়ের নীচে বালিও গরম হয়ে উঠেছে, সরিৎশেখর ফিরল আবার হোটেলের দিকে।

দোতলায় একেবারে সমুদ্রের মুখোমুখি একটা ঘর নিয়েছে সরিৎশেখর। ১৮ নম্বর ঘর। ঘরটি একেবারে শেষ প্রান্তে। দোতলায় সর্বসমেত চারটি ঘর ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নম্বর।

ঘরের চাবি খুলে ঢুকতে যাবে, ১৬ নম্বর ঘর থেকে বের হয়ে এলো অনুরাধা। আবার দুজনে চোখাচোখি। সরিৎশেখর থমকে দাঁড়ায় নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয়।

একবার সরিৎ ভাবল ডাকে অনুরাধাকে, কিন্তু কি ভেবে ডাকল না, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরজাটা কিন্তু খোলাই রইল।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সরিৎশেখর।

হু হু করে খোলা জানালা পথে হাওয়া আসছে।

সরিৎ—

ফিরে তাকাল সে ডাকে সরিৎশেখর। দরজার উপরে দাঁড়িয়ে অনুরাধা। পরনে একটা হালকা সবুজ রঙের মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ী।

কি—আমাকে কি চিনতে পারছ না? অনুরাধা বললে।

চিনব না কেন।

তাহলে ভিতরে আসতে তো কই একবারও বললে না—

বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছিলাম। সরিৎশেখর বললে।

কেন? বললে অনুরাধা।

সেটাই কি স্বাভাবিক নয় অনুরাধা?

অনুরাধা অন্য কথা বললে, এভাবে এই হোটেলে তোমার সঙ্গে

দেখা হবে—আমি প্রায়ই তো পুরীতে আসি, আর এই হোটেলের এই ঘরটিতেই উঠি—

তাই নাকি।

যাক সে কথা, তা তুমি পুরীতে বেড়াতে এসেছ বুঝি ?

হ্যাঁ—তারপরই অনুরাধা হঠাৎ প্রশ্ন করলো আজ জুলাই মাসের কত তারিখ জানো ?

জানি। ২৯শে জুলাই।

সেদিন কলকাতায় সেই বৃষ্টির সন্ধ্যায়—সেই তারিখটাও ছিল ২৯শে জুলাই।

সেদিন বুঝি ২৯শে জুলাই ছিল ? সরিৎশেখর প্রশ্ন করল।

অনুরাধা বললে, হ্যাঁ। আচ্ছা, আজও যদি সেদিনকার মতো বৃষ্টি নামে—

তাতে কি হবে ?

না। তাই বলছিলাম, যদি বৃষ্টি নামে।

তা দাঁড়িয়ে কেন অনুরাধা—বস না। সরিৎশেখর বললে।

ঐ সময় দরজার বাইরে থেকে একটি মোটা গম্ভীর পুরুষের গলা শোনা গেল, অনুরাধা—

তোমাকে ডাকছে যেন কে—সরিৎশেখর বললে।

অনুরাধা কোন জবাব দিল না। আবার ডাক শোনা গেল, অনুরাধা—

কি ?

শুনে যাও। গলার স্বর রুক্ষ, সামান্য অসন্তোষও বুঝি প্রকাশ পায় সে কণ্ঠস্বরে।

আমি ঘরের মধ্যে আছি, ঘরে এসো। অনুরাধা বললে।

সকালের সেই সমুদ্রের ধারে দেখা ভদ্রলোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সরিৎশেখরের দিকে না তাকিয়েই বললেন, বেড়াতে যাবে না ?

না। তুমি যাও—অনুরাধা বললে।

সরিৎশেখর আড় চোখে দেখল ভদ্রলোকের পরনে টেরিকটের প্যাণ্ট, দামী টেরিলিনের হাওয়াই শার্ট গায়ে।

তুমি যাবে না ?

না। বললাম তো, তুমি যাও—

অকস্মাৎ যেন ভদ্রলোকের চোখের মণি দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে। মুহূর্তকাল অনুরাধার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক সরিৎশেখরের দিকে তাকাল এবং বলল, একে তো চিনলাম না।

চিনবে না তুমি, ওর নামটা তোমার জানা থাকলেও কখনো ওকে তুমি দেখোনি। জবাব দিল অনুরাধা।

তা আগে পরিচয় ছিল বুঝি?

অনেক দিনের পরিচিত।

তা তো বুঝতেই পারছি।

তবে ওকে না দেখলেও ইতিপূর্বে ওর নামটা তোমার ভাল করেই জানা!

তাই বুঝি—

হ্যাঁ—যার কথা তুমি দিনের পর দিন বলতে—যার সম্পর্কে তোমার সেদিন কৌতূহলের অন্ত ছিল না যাক পরিচয় করিয়ে দিই—উনিই ডঃ সরিৎশেখর সেন—

অ—

আর সরিৎ ইনিই—

বুঝতে পারছি—মিঃ সলিল দত্ত মজুমদার।

সত্যিই তুমি বেড়াতে যাবে না?

না, বললাম ত।

যাবে না।

না, যাব না। অনুরাধার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সরিৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। বলে, যাও অনুরাধা—

কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, তুমি যাও—অনুরাধা আবার বললে ভদ্রলোককে।

তাহলে তুমি যাবে না অনুরাধা—সলিল দত্তর কণ্ঠস্বর যেন একটা চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ল।

বললাম তো যাব না।

অনুরাধা যাও না—সরিৎ বললে। সরিৎ সত্যিই যেন কেমন বিব্রত বোধ করছিল। আশ্চর্য, কেন অনুরাধা যেতে চাইছে না?

না। যাব না—অনুরাধা আবার বললে, তার গলার স্বরে দৃঢ়তা ফুটে উঠে।

ঠিক আছে, আমিও জানি তোমার মতো বেহায়া বজ্জাত মেয়ে-

ছেলেকে কি করে সায়েস্তা করতে হয়। কথাগুলো বলে সলিল দত্ত মজুমদার আর দাঁড়ালেন না, ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আকস্মাৎ ঘরের আবহাওয়াটাই যেন কেমন ভারি হয়ে গেল। সরিৎশেখর আরও বেশী বিব্রত বোধ করে। কি বলবে যেন বুঝে উঠতে পারে না। বিব্রত স্বরে বলে, তুমি গেলেই পারতে অনুরাধা।

না। কিন্তু তুমি এখনো ওই লোকটার কথা ভাবছ যেতে দাও—ব্যাপারটাকে যেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে অনুরাধা। সমস্ত পরিস্থিতিটাকে সহজ করে তুলবার চেষ্টা করে। অনুরাধার হাবে ভাবে মনে হয় যেন কিছুই হয়নি।

ভদ্রলোক মনে হল, অত্যন্ত চটে গিয়েছেন অনুরাধা।

কাকে ভদ্রলোক বলছ সরিৎ! ঐ অভদ্র, আনকালচার্ড একটা ব্রুটকে! যে ভদ্র ভাবে কথা পর্যন্ত বলতে জানে না—

কিন্তু উনিই—

আমাদের অফিসের জি-এম—

উনিই একদিন ইন্টারভিউ নিয়ে তোমাকে চাকরি দিয়েছিলেন না? সরিৎ বললে।

হ্যাঁ তাই, তবে তার জন্য আমাকে পরবর্তী কালে যে মূল্য দিতে হয়েছিল—

মূল্য—

যাক সে কথা। চল, সমুদ্রের ধারে যাব—

এই দুপুরে—রৌদ্রে—

তাহলে আমি একাই যাই—অনুরাধা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আরে শোন শোন, কোথায় যাচ্ছ এই প্রচণ্ড রৌদ্রে, বস—

না বসব না, আমি যাচ্ছি—অনুরাধা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সরিৎশেখর অতঃপর কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন তার কাছে, ওদের পরস্পারের সম্পর্কটা যতই এক সময় ঘনিষ্ঠ থাকুক, এখন তাতে চিড় ধরেছে।

সলিল দত্ত মজুমদার অনুরাধার অফিসের বস। এবং হয়ত ঐ ভদ্রলোকের ইচ্ছাতেই এক সময় তার অফিসে অনুরাধার চাকরি হয়েছিল—সেও বৎসর দুইয়ের কিছু আগেই হবে। এবং চাকরি পাওয়ার পরই কয়েক মাসের মধ্যেই যে কোন কারণেই হোক অনুরাধার মনটা তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। যে কারণে অকস্মাৎ একদিন

অনুরাধা এসে তাদের সমস্ত সম্পর্কের ওপর একটা ইতি টেনে দিয়ে গিয়েছিল।

তারপর এই দুই বৎসর অনুরাধা তার কাছে আর আসেনি, সেও যায়নি অনুরাধার কাছে। বস্তুত সরিৎ অনুরাধার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টাও করেনি।

সে ভুলতেই চেয়েছিল অনুরাধাকে। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে ভুলতে সে পারেনি অনুরাধাকে। কিন্তু কেন! কেন ভুলতে পারল না অনুরাধাকে?

জানালা পথে বাইরে দৃষ্টিপাত করল সরিৎশেখর। সমুদ্রের জল যেন প্রখর সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় শুভ্র ফেনার মালা। একটার পর একটা ঢেউ বালুবেলার পরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রে স্নানার্থীর ভিড় আর এখন তেমন নেই।

অনেক দূর দেখা গেল, মাথায় ঘোমটা তুলে তীর ধরে হেঁটে চলেছে অনুরাধা, স্বর্গদ্বারের দিকে।

অনুরাধা।

কত-কত দিন পরে সে আজ আবার অনুরাধাকে দেখল।

এ সেই অনুরাধা যে এক সময় তার জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।

আর মনের রেখাগুলো হতে হাসিটি পর্যন্ত তার একান্ত পরিচিত।

একদিন যার সম্পর্কে তার মনে হতো—তার জীবন থেকে অনুরাধাকে বাদ দিয়ে একটা দিনও চলতে পারে না।

একটা দিন যার সঙ্গে দেখা না হলে তার মনে হতো—কতকাল যেন অনুরাধাকে সে দেখে নি।

সরিৎশেখর জানালা পথে চেয়ে থাকে—অনুরাধা হেঁটে চলেছে স্বর্গদ্বারের দিকে।

একবার মনে হয় সরিৎশেখরের অনুরাধা এখনো বেশীদূর যায়নি—ওর পিছনে পিছনে গিয়ে ডেকে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সরিৎশেখর দু'পা এগিয়েও যায় দরজাটার দিকে কিন্তু আবার থেমে যায়।

মনে পড়লো একটু আগে সলিল দত্ত মজুমদারের কথাগুলো।

এবং সলিল দত্ত মজুমদারের কথা ভেবেই ইচ্ছাটাকে দমন করল। অনুরাধার সঙ্গে তাকে দেখলে সলিলের মেজাজটা হয়তো আবার বিগড়ে যাবে। কি প্রয়োজন তার ওদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে মাথা গলানোর। ও আজ সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি, একান্ত ভাবেই অনভিপ্রেত। কিন্তু যতই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাব না মনে করুক সরিৎশেখর, অনুরাধার চিন্তাটা যেন মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারে না। ঘুরে ফিরে কেবলই যেন অনুরাধা তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ঐ সলিল দত্ত মজুমদারের সঙ্গে সম্পর্কটা কি অনুরাধার? যে ভাবে সলিল দত্ত মজুমদার কথা বলছিল, তার মধ্যে একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার সুর স্পষ্ট ছিল। কি সে অধিকার? আর সেই অধিকার সলিল দত্ত মজুমদার কেমন করে অর্জন করল? একটার পর একটা সিগ্রেট পুড়তে থাকে।

দরজার ওদিকে পদ শব্দ শোনা গেল আবার এক সময়।

ভিতরে আসতে পারি?

গলার স্বর থেকেই মানুষটাকে চিনতে সরিতের অসুবিধা হয় না, সলিল দত্ত মজুমদার। সরিৎ বললে, আসুন।

সলিল দত্ত মজুমদার এসে ঘরে ঢুকলেন। একবার ভালো করে তাকাল সরিৎ।

ভদ্রলোকের দিকে—আটত্রিশ উনচল্লিশ বৎসর বয়স মনে হয় ভদ্রলোকের। সামনের দিকে মাথায় বিস্তৃত টাক, সেই টাক পাশ থেকে চুল টেনে এনে সযত্নে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। চোখে চশমা, দামী ফ্রেমের চশমা। সকাল বেলার সেই পোশাকই পরিধানে।

বসুন মিঃ দত্ত, সরিৎ বললে।

আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে এলাম, ডঃ সেন—

আমাকে! কি কথা?

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে আপনার সঙ্গে আলাপ ছিল অনুরাধার জানতাম। এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে রীতিমত একটা ঘনিষ্ঠতা একসময় হয়েছিল তাও আমার জানা।

কতটুকু আপনি জানেন বা শুনেছেন আমি জানি না সলিলবাবু, তবে এমন কিছু ছিল না যা মনে রাখার মতো—

কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, বেশ একটু—

সে সব অনেক দিন চুকে বুকে গিয়েছে, আপনি যা বলতে এসেছেন তাই বলুন—

জানেন কি, ও একটা জঘন্য চরিত্রের মেয়েমানুষ—

এই কথাটাই কি বলতে এসেছেন ?

হ্যাঁ। আমি ঠকেছি বলেই আপনাকে সাবধান করে দিতে এলাম।

ধন্যবাদ।

আমার আর একটা কথা আপনার জানা বোধহয় দরকার ডঃ সেন। ওকে আমি বিয়ে করেছি—She is my wife.

বিয়ে করলে তো উনি স্ত্রীই হবেন, তার মধ্যে নতুনত্বের কি আছে—

মনে হচ্ছে আপনি যেন আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন না, ডঃ সেন—

কেন, বিশ্বাস করব না কেন !

তাই বলছিলাম একদিন ওর সঙ্গে আপনার যে সম্পর্কই থাক, ও আজ পরস্ত্রী।

কথাটা কেন বলছেন বুঝতে পারলাম না—

পারবেন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন। আচ্ছা চলি—সলিল দত্ত মজুমদার যেমন হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকেছিলেন তেমনিই হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

॥ দুই ॥

হোটেলের ম্যানেজার-প্রোপ্রাইটার দেবেশ অধিকারীর সঙ্গে তার ঘরে বসে কিরীটীর কথা হচ্ছিল।

কিরীটীর বয়স হয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে।

দেবেশ বলছিলেন, সত্যি বলতে কি এবারে কিন্তু আপনাকে দেখে প্রথমটায় ভালো চিনতে পারিনি –

কিরীটী হেসে বললে, কেন, বয়েস হলেও আমার চেহারাটা তো খুব একটা পালটায়নি।

তা প্রায় বছর পাঁচেক বাদে এখানে এলেন, তাই না ? দেবেশ বললেন।

পাঁচ বছর ! বোধ হয় ঐ রকমই হবে—

তা ক'টা দিন থাকছেন তো পুরীতে ?

থাকব বলেই তো এসেছিলাম, কিন্তু ১৮নং ঘরটা তো কে একজন দখল করে আছে দেখছি—

হ্যাঁ, সরিৎবাবু এসেছেন। উনি এখানে প্রায়ই আসেন, আর এলে ঐ ১৮নং ঘরেই ওঠেন। অবিশ্যি আপনি আসছেন জানতে পারলে ঘরটা ওকে দিতাম না। ১৫নং ঘরটা খালি আছে—দু'দিক খোলা, প্রচুর হাওয়া পাবেন। ঘরটা দেখবেন ?

না। ওই ঘরেই আমার ব্যবস্থা করুন।

তা করছি। নিশ্চয়ই কোন কাজে এসেছেন কিরীটীবাবু, তাই না ?

না, সে রকম কিছু না। তবে একটা অনুরোধ, আমি যে এসেছি যেন জানাজানি না হয়।

সে কি আর চাপা থাকবে ?

যতটা চেপে রাখা যায়।

দেবেশ অধিকারী বললেন, তা বলেছেন যখন আমি কাউকে বলব না। তবে আপনি যে কেবলমাত্র সমুদ্রের হাওয়া খেতেই আসেননি তা আমি জানি।

সে কথা যাক, কিরীটী বললে, দোতলায় বুঝি ঐ ১৫নং ঘরটাই খালি আছে ?

না ১৭নং ঘরটাও খালি আছে। তবে ঐ ঘরটা ভাড়া দেওয়া হয় না।

কেন ?

ঐ ঘরে একবার এক ভদ্রলোক নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আত্মহত্যার কারণটা জানা যায় নি ?

না।

কিরীটী আর প্রশ্ন করলো না।

দেবেশ বলতে লাগলেন। সেই থেকে রাত্রে প্রায়ই ঘরের মধ্যে নানা রকমের আওয়াজ নাকি শোনা যায়। মধ্যে মধ্যে ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপর এক ছায়ামূর্তিকে বসে থাকতে দেখা যায়। পর পর দুবার ঐ ঘরে যারা এসে উঠেছিলেন তারা ভয় পেয়েছিলেন।

তাহলে এক কাজ করুন—ঐ ১৭নং ঘরটাই আমাকে দিন।

কিন্তু—

আপনি তো জানেন, ভূতের ভয় আমার নেই। যদিও ভূত আমি দু-একবার দেখেছি এবং আমি ভূত বিশ্বাসও করি।

ভূত বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ। আপনি ঐ ১৭নং ঘরেই আমার থাকবার ব্যবস্থা করুন। আচ্ছা ১৬নং ও ১৮নং ঘরে কারা আছেন?

বললামই তো, ১৮নং ঘরে আছেন অধ্যাপক ডাঃ সেন, ব্যাচিলার মানুষ। আর ১৬নং ঘরে মিঃ দত্ত মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী এসে উঠেছেন। ইউনিভারসাল ইলেকট্রিক কোম্পানির কলকাতা অফিসের জি-এম।

ইউনিভারসাল ইলেট্রিক কোম্পানির জি-এম?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের বয়েস কত হবে বলুন তো।

উনচল্লিশ, চল্লিশ হবে হয়ত।

মাথার সামনের দিকে টাক আছে?

আছে—চেনেন নাকি ভদ্রলোককে মিঃ রায়—

না, ঠিক চিনি না।

তবে এত কথা বলছেন কি করে?

কিরীটী পকেট থেকে একটা খাম বের করে খাম থেকে একটা ফটো বের করে বললে, দেখুন তো দেবেশবাবু, এই ভদ্রলোক কি?

দেখি। হ্যাঁ এই তো—দেবেশ বললেন।

আপনি—

দেবেশের কথা শেষ হল না, সলিল দত্ত মজুমদারকে দেখা গেল। তার অফিস ঘরে ঢুকতে। দত্ত মজুমদার ঘরে ঢুকে সোজা দেবেশের দিকেই এগিয়ে গেলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট কিরীটীর দিকে তাকালেনও না।

দেবেশ বললেন, কিছু বলছিলেন মিঃ দত্ত মজুমদার?

হ্যাঁ, আজ বিকেলের দিকে আমাকে একবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে। ট্রেনে যাব না, একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা হতে পারে কি?

কেন হবে না। আমার জানাশোনা একটা ট্যাক্সি আছে, যদি ভাড়ায় না গিয়ে থাকে এখুনি খবর পাঠাচ্ছি। তা কখন যেতে চান?

বেলা পাঁচটা নাগাদ বেরুব ভাবছি।

আপনার স্ত্রীও যাবেন তো আপনার সঙ্গে ?

না, সে থাকবে। আমি তো আবার কালই ফিরে আসছি। আপনি তাহলে খবরটা পাঠান, আমি আমার ঘরেই আছি। দত্ত মজুমদার চলে গেলেন।

কিরীটী বললে, এই ভদ্রলোক ?

হ্যাঁ—দেবেশ বললেন।

তাহলে দেবেশবাবু, ১৭নং ঘরটা খুলে দেবার ব্যবস্থা করুন।

হোটেলের চাকর ও ঝিকে ডেকে পাঠালেন দেবেশ।

গুপী সামনে এসে দাঁড়াল।

গুপী, ১৭নং ঘরটা খুলে দাও—

কাঁই কি বাবু, কঁড় হবো ?

এই বাবু থাকবেন—

কথাটা শুনে মনে হল গুপী যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছে। সে প্রথমে দেবেশের মুখের দিকে তাকাল তারপব তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে এবং মৃদু কণ্ঠে বললে, সে বাবু ১৭নং কামরাতে রহিব ?

জবাব দিল কিরীটী, হ্যাঁ গুপী, ঐ ঘরেই আমি থাকব, ভূতের ভয় আমার নেই। তুমি ঘরটা পরিষ্কার করে দাও—

গুপী বললে, গত বছরে আগের বাবুরও ভূতের ভয় ছিল না বলে ঐ ঘরেই থেকেছিলেন, কিন্তু মাঝ রাত্রে সিঁড়ির কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

ভয় নেই তোমার গুপী, আমি অজ্ঞান হব না। তুমি ব্যবস্থা কর।

দেবেশ ঘরের চাবিটা গুপীর হাতেই তুলে দিলেন।

গুপী যেন কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই চাবি নিয়ে চলে গেল।

আচ্ছা দেবেশবাবু, ১৭নং ঘরে যে আত্মহত্যার কথা একটু আগে বলছিলেন, সেটা কত দিন আগেকার ব্যাপার ?

তা বছর তিনেক হবে, ঠিক এমনি এক জুলাই মাসে। হোটেলের প্রত্যেকটি ঘরে যাত্রী সেযে কি হুজ্জত কিরীটীবাবু, ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন, তারপর থানা পুলিস। ভদ্রলোক নাকি এসেছিলেন জামসেদপুর থেকে। টিসকোতে কাজ করতেন, রিটায়ার করবার পর পুরীতে বেড়াতে এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য। বয়স হয়েছিল তা প্রায় বাষট্টি তেষট্টি। একাই এসেছিলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম সংসারে

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছে কিন্তু কারো সঙ্গেই ভদ্রলোকের বনিবনা হতো না।

কেন, বনিবনা হতো না কেন ?

ভদ্রলোকের নিজের স্বভাবেরই জন্য নাকি সংসারে কারও সঙ্গে বনত না।

তা কেন হঠাৎ এখানে এসে আত্মহত্যা করলেন কিছু জানা গিয়েছিল ?

না। তবে তার স্ত্রী বলেছিলেন, বাড়ী থেকে নাকি ঝগড়া করে চলে এসেছিলেন। পুরীতে যে এসেছেন তাও তিনি জানতেন না। আসার সময় কিছু বলেও আসেননি কাউকে। না বলে কয়ে হঠাৎ চলে এসেছিলেন।

আর কিছু জানা যায়নি—ঐ পারিবারিক কলহ ছাড়া ?

না।

কোন চিঠিপত্র রেখে গিয়েছিলেন ?

না। কোন চিঠি বা লেখা-টেখা কিছুই ঘরে পাওয়া যায়নি।

ভদ্রলোকের নামটা আপনার মনে আছে দেবেশবাবু ?

মনে আছে বৈকি ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নামটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

আচ্ছা দেবেশবাবু, ভদ্রলোকের মাথায় বেশ বড় একটা টাক ছিল কি ?

কই না তো, বরং মনে আছে আমার মত ঘন চুলই ছিল ভদ্রলোকের মাথায়।

খুব বড় বড় কথা বলতেন কি ? এবং রীতিমত ভোজনপটু ছিলেন ?

হ্যাঁ, যে কয়দিন ছিলেন তা প্রায় দুজনের মিল একাই খেতেন। অবিশ্যি তার জন্য এক্সট্রা চার্জ দিতে চেয়েছিলেন।

খুব দরাজ গলায় যখন তখন হাসতেন কি ?

অত শত মনে নেই, তা ভদ্রলোক সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন তো রায়মশাই ? আপনি ভদ্রলোকটিকে চিনতেন নাকি ?

দেবেশের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিরীটী বললে, সেটাই তো যাচাই করছি।

কি ব্যাপার ? দেবেশ অধিকারীর কণ্ঠস্বরে রীতিমত আগ্রহ প্রকাশ পায়।

ভদ্রলোক নামের সঙ্গে যে পদবীটা এখানকার খাতায় লিখিয়েছিলেন, তা সত্য নয়—কিরীটী বললে।

সে কি রায়মশাই ? কিন্তু তার স্ত্রী যিনি এসেছিলেন এখানে পরে—

তিনিও তার স্ত্রী নন।

এ সব কি বলছেন রায়মশাই ! তাই বোধ হয় ডেড বডির সংকার না করেই ভদ্রমহিলা চলে গিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছি—

২৯শে জুলাই ঘটনাটা ঘটেছিল এই হোটেলে, তাই তো ?

হয়তো তাই হবে, জুলাই মাস আপনাকে তো আগেই বললাম, তবে তারিখটা—

২৯শে জুলাই এবং ২৮শে জুলাই এখানে সে রাত্রে খুব একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তাপাঙ্ক নেমে যায়—কিরীটী বললে।

কিন্তু কি ব্যাপার রায়মশাই ? দেবেশ প্রশ্ন করলেন।

আরো একটা কথা আছে দেবেশবাবু—

কি কথা বলুন তো ? দেবেশ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

আমার মনে হয়, কিরীটী বললে, তিনি আত্মহত্যা করেননি, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এবং তিনি আদৌ জামসেদপুর থেকে আসেননি এসেছিলেন কলকাতা থেকে। আর তার আসল পরিচয় ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নয়।

এসব কি বলছেন রায়মশাই !

আমার অনুমানের কথাটাই আপনাকে বলছি।

কিন্তু পুলিস—পুলিস কি কিছুই জানতে পারেনি ?

কিরীটী বললে, জানতে পারত নিশ্চয়ই যদি ভালো করে লোকটা সম্পর্কে খোঁজখবর করত। ব্যাপারটা এক ভদ্রলোকের, যিনি এখানকার হোটেলে এসে উঠেছিলেন, তাই কেসটা আত্মহত্যা বলে হাত ধুয়ে ফেলেছিল পুলিস। এবং পুলিসের ফাইলে আত্মহত্যাই থেকে যেত যদি না বছর তিনেক পরে হঠাৎ ক্ষিতিন্দ্রবাবুর স্ত্রী মালতী দেবী তার তিন বছর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজ খবর শুরু করতেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার দ্বারস্থ না হতেন। আর কিছু ছিন্ন সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালাতে চালাতে আমি এখানে এসে না উপস্থিত হতাম।

আপনি তবে রায়মশাই ঐ ব্যাপারেই—

হ্যাঁ, কলকাতা থেকে অনুসন্ধান শুরু করে এখানে এসেছি।

সমস্ত ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করছে রায়মশাই।

পুলিসের খাতায় যা লেখা আছে তা হচ্ছে, তিন বছর আগে ক্ষিতীন্দ্রবাবু ঝগড়া-ঝাঁটি করে বাড়ী থেকে চলে আসেন, এই পর্যন্ত সত্যি, কিন্তু তারপর—

তারপর ?

যে ক্ষিতীন্দ্রবাবু এখানে এসে এই হোটেলে ওঠেন তিনি আদৌ ক্ষিতীন্দ্রবাবু নন, কোন তৃতীয় ব্যক্তি। এখন কথা হচ্ছে কোন তৃতীয় ব্যক্তি কেন ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পরিচয়ে এখানে এসে উঠলেন, তার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল ? আর সেই সময়ে আসল ক্ষিতীন্দ্রবাবুই বা কোথায় ছিলেন ?

দেবেশ বললেন, এবং আত্মহত্যাও করলেন—

না, কেউ তাকে হত্যা করেছিল।

কে সে ? আপনি বলছেন মিঃ রায় ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পরিচয়ে যিনি এখানে এসে উঠেছিলেন তিনি আদৌ আত্মহত্যা করেননি—তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল—

হ্যাঁ।

কে—কে তাকে হত্যা করলো আর কেনই বা হত্যা করেছিল—

হয়তো ক্ষিতীন্দ্রবাবুই তাকে হত্যা করেছিলেন, না হয় অন্য কেউ।

বলেন কি !

বলছি তো সবটাই আমার একটা অনুমান মাত্র। যাক সে কথা, ঘটনাটা মনে করুন। হোটেলের ১৭নং ঘরে সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। পুলিস এলো, তারা যতটুকু অনুসন্ধান করবার করল। জামসেদপুরে তার স্ত্রী মালতী দেবীকে সংবাদ দেওয়া হল। তিনি এলেন সনাক্ত করলেন তাঁর স্বামী বলেই, কিন্তু সৎকার না করেই চলে গেলেন—

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে দেবেশবাবু।

কি বলুন—

যাকে হত্যা করা হয়েছিল তিনি আমার অনুমান আগেই বলেছি আসল ক্ষিতীন্দ্রবাবু নন—তাহলে সত্যিকারের ক্ষিতীন্দ্রবাবুর জামসেদপুরের ঠিকানা পুলিস কেমন করে কোথা থেকে পেল—

সত্যিই তো।

রহস্যটা ঐখানেই জট পাকিয়ে আছে।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, এত দিন পরে হঠাৎ তার মনে সন্দেহ জাগল কেন যে যাকে তিন বছর আগে তিনি তাঁর স্বামী বলে সনাক্ত করেছিলেন তিনি তাঁর স্বামী নন—দেবেশ বললেন।

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো, অনুসন্ধান তিনি আবার করতেন না কখনও যদি না মোটা টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিটের ব্যাপারটা অকস্মাৎ জটিল না হয়ে উঠত। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পঁচাত্তর হাজার টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট ছিল জামসেদপুরে টিসকোর একাউন্টে--যে টাকাটা রিটায়ার করবার পর ক্ষিতীন্দ্র পেয়েছিলেন, ঐ পঁচাত্তর হাজার তারই একটা অংশ—ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছিলেন কোম্পানিতে পাঁচ বছরের মেয়াদে মোটা সুদে। কিরীটী বলতে লাগল, কিছু দিন আগে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ায় মালতী দেবী টাকাটা তোলার যখন ব্যবস্থা করছেন একটা চিঠি এলো তার নামে।

চিঠি?

হ্যাঁ।

কার কাছ থেকে চিঠি এলো?

ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সই করা চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—আমি মরিনি। ঐ ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা তুলবার চেষ্টা করো না, তাহলে আমি জানিয়ে দেব পুলিসকে, যে পুরীতে গিয়ে অন্য এক ব্যক্তির মৃতদেহ তোমার স্বামীর বলে মিথ্যা সনাক্ত করে এসেছ। —ইতি ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধায়।

কি সর্বনাশ!

কাজেই বুঝতে পারছেন মালতী দেবীর অবস্থাটা। টাকা তোলার আর চেষ্টা করলেন না। প্রথমে নানা ভাবে স্বামীর অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোন কিছুর হদিশ করতে পারলেন না। তার তখন মনে একটা জেদ চেপে গিয়েছে—যে ভাবেই হোক সত্য ব্যাপারটা তাকে জানতেই হবে। তিনি সোজা চলে গেলেন তখন তাঁদের পূর্ব-পরিচিত এক রিটায়ার্ড পুলিস কমিশনারের কাছে। তিনি সব শুনে মালতী দেবীকে আমার কাছে আসতে পরামর্শ দিলেন। সব শুনে—কিরীটী বলতে লাগল, আমার মনে হল বিচিত্র একটা রহস্য ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে আছে।

কবে এসেছিলেন তিনি আপনার কাছে ? দেবেশ শুধাল।

তা দিন কুড়ি আগে হবে।

॥ তিন ॥

কলকাতা শহরে তখন প্রচণ্ড তাপদাহ চলেছে কয়েক দিন ধরে একটানা। জুনের সেটা গোড়ার দিক। আটত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সকাল যেন দেখতে দেখতে গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়।

দুপুরের দিকে যেন পশ্চিমের মতো লু চলে, রাস্তায় বেরুলে হাত পা মুখ ঝলসে যায়। কিরীটীর বাড়ির কলিং বেলটা ডিং ডং শব্দে বেজে উঠল।

জংলীই এসে দরজাটা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি একটা, এক ভদ্রমহিলা নামছেন ট্যাক্সি থেকে। পরনে সরু কালো পাড় একটা শাড়ি, মাথায় ঘোমটা টানা। দু'হাতে তিনগাছা করে ক্ষয়ে যাওয়া সোনার চুড়ি, মাথায় বা সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বয়স হয়েছে আগন্তুক ভদ্রমহিলার, তিপ্পান্ন থেকে চুয়ান্ন হবে। কিরীটীর সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে জংলী তো প্রথমটায় কিছুতেই সম্মত হয় না। বলে, না, এখন দেখা হবে না।

মহিলা কাকুতি মিনতি করতে থাকেন। বিশেষ প্রয়োজনে এসেছেন, একটিবার তাকে দেখা করতেই হবে। জংলী অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহিলাকে বাইরের ঘরে এনে বসাল।

কিরীটী জেগেই ছিল তার মেজোনিন ফ্লোরের বসবার ঘরে। ডিভানে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। জংলী এসে ঘরে ঢুকল।

বাবু—।

কি রে ?

একজন মেয়েছেলে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এই দুপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে কেউ যে দেখা করতে আসতে পারে, বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে—বুঝতে পারে কিরীটী, তাই জংলীকে ঐ ঘরেই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসতে বলল।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকতেই কিরীটী তার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তার বুঝতে কষ্ট হয় না, এখন বয়স হলেও আগন্তুক মহিলা যৌবনে দেখতে মোটামুটি সুন্দরীই ছিলেন। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সামান্য লম্বাটে ধরনের মুখের গঠন, চোখে মুখে বয়সের ছাপ অনিবার্য ভাবেই

পড়েছে। কিন্তু তা সত্বেও চেহারার প্রতি যে তার একটা সযত্ন প্রয়াস আছে সেটা ওর দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

বসুন—

মহিলা সামনের সোফাটার উপরে বসে ব্যাগ থেকে ছোট একটি রুমাল বের করে তার মুখের ঘামটা মুছে নিলেন।

মিঃ রায়, আমি আপনাকে চিনি না, কেবল আপনার নামের সঙ্গেই আমার যা পরিচয়। একটা বিশ্রী রকম সংকটে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, আপনি যদি দয়া করে আমাকে সাহায্য করেন।

কি হয়েছে ?

ভদ্রমহিলা তখন সংক্ষেপে তার স্বামীর তিন বছর আগে পুরীর এক হোটেলে আত্মহত্যার কথা বললেন, ও সেই সঙ্গে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিলেন।

বললেন, তিন বছর আগে যে দুঃখের ও লজ্জার ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল, এত বছর পর যে আবার সেই ব্যাপারটায় এমনি করে একটা সঙ্কট সৃষ্টি হবে ভাবতেও পারিনি। যাকে এই তিনটে বছর জেনে এসেছি মৃত বলে তারই কাছ থেকে যে এমন একটা চিঠি পাব কেমন করে ভাবব বলুন।

চিঠিটা আপনার সঙ্গে আছে ?

আছে, এই যে—মালতী ব্যাগ থেকে মুখ ছেঁড়া টিকিট লাগানো সাদা খাম বের করে কিরীটীর হাতে তুলে দিলেন।

জামসেদপুরের ঠিকানা ও মালতী দেবীর নাম লেখা খামটার উপরে হাতের লেখায়। খাম থেকে চিঠিটা বের করে কিরীটী পড়ল। সংক্ষিপ্ত একটা হাতে লেখা চিঠি—লেখাটা পুরুষের হাতের বলেই মনে হয়।

এ চিঠি আপনি বলছেন আপনারই স্বামীর লেখা ? প্রশ্নটা করে কিরীটী তাকাল মালতী দেবীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, তারই হাতের লেখা।

লেখাটা চিনতে আপনার কোন রকম ভুল হয়নি তো মালতী দেবী ?

না, ওটা আমার স্বামীরই হাতের লেখা। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার স্বামীর লেখা অন্য কোন চিঠি-পত্র আপনার কাছে আছে ?

আছে। আমি নিজেও মিলিয়ে দেখেছি, আপনিও দেখুন—বলে গোটা দুই পুরাতন চিঠি মালতী কিরীটীর হাতে তুলে দিলেন।

কিরীটী সব চিঠিগুলো দেখে বুঝতে পারে একই ব্যক্তির লেখা প্রত্যেকটি চিঠি। আপনি মালতী দেবী তাহলে বিশ্বাস করেন আপনার স্বামী আজও বেঁচে আছেন? অর্থাৎ তিন বছর পূর্বে পুরীর হোটেলে যিনি ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি—

মালতী দেবী বললেন, ঐ চিঠিটা পাবার পর তা ছাড়া আর অন্য কি ভাবতে পারি বলুন। আপনিও তো চিঠিগুলো দেখলেন, আপনারও কি তাই মনে হয় না?

হ্যাঁ। তাই মনে হয় বটে, তবে কথা হচ্ছে—

কি বলুন?

আপনি একটু আগে তিন বছর আগে পুরীর এক হোটেলের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটেছিল বললেন, সে সময়ে আপনিই তো নিজে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করে বলে এসেছিলেন মৃত ব্যক্তি আপনারই স্বামী—

হ্যাঁ, বলে এসেছিলাম।

তাহলে কি ভাবব,আপনি যে কারণেই হোক সত্য কথাটা পুলিসকে বলেননি?

সত্যিই বলেছিলাম।

সত্য বলেছিলেন?

হ্যাঁ, সেদিন যেমন মৃতদেহ দেখে বলেছিলাম সে-ই আমার স্বামী, আজও ঐ চিঠি যে তারই লেখা তাও বলছি। সেদিন যেমন আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম আজও তেমনি আমি নিঃসন্দেহ।

মৃতদেহটা আপনার স্বামীরই ছিল?

হ্যাঁ। শান্ত দৃঢ় গলায় জবাব দিলেন মালতী দেবী।

কিন্তু এই চিঠি যদি সত্যি সত্যিই আপনার স্বামীরই লেখা হয় তাহলে কি ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে না যে সেদিন যে মৃতদেহকে আপনার স্বামীর বলে সনাক্ত করে এসেছিলেন তিনি নিশ্চয় আপনার স্বামী নন,কারণ মৃত ব্যক্তি তো আর চিঠি লিখতে পারেন না—সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি অবিকল আপনার স্বামীর মতো দেখতে ছিলেন বলেই আপনার ঐ ভুলটা হয়েছিল।

মালতী দেবী কোন জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

মালতী দেবী, আপনি সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখুন—

চিঠিটা পেয়েছি আমি প্রায় মাস দেড়েক আগে, তারপর আমার স্বামী সত্যি সত্যিই আজও বেঁচে আছেন কিনা—কিংবা আমারই হয়তো সেদিন ভুল হয়েছিল সেই কথা ভেবেই সমস্ত রকম অনুসন্ধান করবার পর ব্যাপারটার একটা মীমাংসায় পৌঁছবার জন্যই শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে এসেছি।

কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে হলে কতকগুলো আবশ্যকীয় প্রশ্নের জবাব আমার একান্ত দরকার।

বলুন কি জানতে চান।

আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার—মানে বুঝতেই পারছেন—পরস্পরের সম্পর্কটা কেমন ছিল যদি বলেন—

কি বলব বলুন, বলতে লজ্জাও হয় দুঃখও হয়, আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা আদৌ সুখের বা শান্তির ছিল না। অথচ আপনি শুনলে হয়তো অবাকই হবেন, পরস্পরকে ভালোবেসেই আমাদের বিবাহ হয়েছিল।

বিবাহের পূর্বেই আপনাদের জানাশোনা হয়েছিল তাহলে?

হ্যাঁ, আমার শ্বশুরমশাই এবং শাশুড়ী জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমার স্বামী তার কাকার কাছেই মানুষ—

আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী আজও বেঁচে আছেন কি?

জানি না, তাদের কখনো দেখিনি। আমার স্বামীও তার মা-বাবা সম্পর্কে কখনও কোন কথা বলতেন না বলে আমি কখনও সে সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি বা তাদের নিয়ে কখনও কোন আলোচনা করিনি। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে কারণেই হোক তিনি তার মা-বাবা সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে চান না। অবিশ্যি আমারও কোন দিন কোন আগ্রহই ছিল না সে সম্পর্কে জানবার।

আপনার মা-বাবাও ক্ষিতিন্দ্রবাবুর মা-বাপ সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর নেননি?

মা-বাবা আমার ছিল না, আমি আমার বড়দিদির কাছেই মানুষ। খুব ছোটবেলায় তাঁরা মারা যান। আমার জামাইবাবু অসুস্থ মানুষ ছিলেন, অল্প বয়সেই সব কাজকর্ম ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এ্যাক্সিডেণ্টের পর—কলকাতা শহরের ওপর খান দুই বাড়ি ছিল, তার আয় থেকেই

তাদের চলে যেত ভালো ভাবেই—দিদির পক্ষেও অত খোঁজখবর নেওয়া সম্ভব ছিল না

হুঁ! আপনার স্বামীর কাকা বেঁচে আছেন?

না, বছর চারেক আগে তিনি মারা গেছেন।

তার ছেলে মেয়ে স্ত্রী?

স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন, কোন সন্তানাদি ছিল না তাদের। তার যা কিছু জমি-জমা টাকা-পয়সা আমার স্বামীই পেয়েছিলেন।

আপনার স্বামী তো টিসকোতে বেশ ভালো চাকরিই করতেন?

মালতী দেবী বলতে লাগলেন, তাঁর এডুকেশন বা কোয়ালিফিকেশন বলতে যা বোঝায় তা তো সে-রকম ছিল না, সে আন্দাজে চাকরি জীবনে শেষের দিকে বেশ ভালো মাইনেই পেতেন। শুনেছি শুরু করেছিলেন ৭৩ টাকা হপ্তা থেকে পরে মাহিনা বৃদ্ধি পেয়ে শেষ জীবনে ঠিক কত হয়েছিল আমি ঠিক জানি না।

কত মাইনে পেতেন শেষের দিকে আপনি জানেন না তাহলে?

না। সত্যি কথা বলতে কি অমন একটা বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। এক কথায় অমন স্বার্থপর, অমন লোভী ও আত্মকেন্দ্রিক তার ওপারে চোখে মুখে ডাইনে বাঁয়ে মিথ্যা বলতেন। অথচ যখন আমাদের আলাপ হয়, দেড় বছরের আলাপে এতটুকু বুঝতে পারিনি মানুষটাকে, বুঝতে পারলাম বিয়ের পরে একটু একটু করে, মানুষটাকে মানিয়ে নেবারই চেষ্টা করতে লাগলাম, মনকে বোঝাতাম, ভাগ্য আমারই, কি আর করা যাবে। একটার পর একটা সন্তান হতে লাগল আমাদের—

ক'টি ছেলেমেয়ে আপনাদের? কিরীটীর প্রশ্ন।

চার মেয়ে দুই ছেলে—মালতী একটু থেমে বললেন।

বড় ছেলের বয়স কত আপনাদের? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

ছাব্বিশ হবে।

ছোট ছেলে?

চব্বিশ বছর হবে।

তারা—মানে আপনার সন্তানদের বাপের প্রতি মনোভাব কেমন?

ঐ প্রকৃতির মানুষের প্রতি মনোভাব যেমন হওয়া উচিৎ স্বাভাবিক ভাবে তার সন্তানদেরও ঠিক তেমনি।

মেয়েরা—

তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

ছেলেমেয়েদের এই চিঠির কথা আপনি বলেছেন?

না। ঠিক করেছি সমস্ত কিছু ভালো করে না জেনেশুনে তাদের আমি কিছু বলব না। মিঃ রায়, আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক দেবার মতো ক্ষমতা আমার নেই, তবু আপনার শরনাপন্ন হয়েছি—

টাকা পয়সার জন্য আপনি ভাববেন না। আমাকে দুটো দিন একটু ভাবতে দিন। এই চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে পারি কি?

রাখুন।

দু'দিন বাদে আপনার স্বামীর বর্তমানের কোন ফটো থাকলে সঙ্গে আনবেন।

ঠিক আছে। নমস্কার জানিয়ে মালতী দেবী প্রস্থান করলেন।

তিন তিনটে বছর কম নয়। কিরীটী মনে মনে ভাবতে শুরু করেছে তখন।

তিন বছর আগে যে মানুষটা আত্মহত্যা করেছে, এবং যার মৃতদেহ তার নিজের স্ত্রী পর্যন্ত ঘটনাস্থলে গিয়ে সনাক্ত করে এসেছে, তিন বছর পরে তারই এক চিঠি এলো এবং সে চিঠি তার স্বামীরই লেখা বলে গেলেন মালতী দেবী।

ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, যে মানুষটা পুরীর এক হোটেলে তিন বছর পূর্বে আত্মহত্যা করেছে বা মারা গিয়েছে যাই হোক এবং যার অবিসংবাদী প্রমাণও পুলিসের দপ্তরে আজও রয়েছে, সে আজ আবার কেমন করে চিঠি লিখতে পারে? যদি মৃত্যুটা তার সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে কি আগাগোড়াই ব্যাপারটার মধ্যে কোন সত্য নেই, সবটাই গোড়া থেকে সাজানো? না কি ব্যাপারটার মধ্যে অবিশ্বাস্য কোন ভৌতিক রহস্য আছে? শেষের সম্ভাবনাটা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে নাকি যে তিন বছর আগে যে মানুষটিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আদৌ সে মরেনি। সে আজও বেঁচে আছে। কিংবা এমন কি হতে পারে—সম্পূর্ণ কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ পত্র-প্রেরক? যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তিই হবে, তাহলে সে ফিক্সড ডিপোজিটের কথাটা জানল কি করে? শুধু তাই নয়, সেই ফিক্সড ডিপোজিটের মেয়াদ কবে পূর্ণ হচ্ছে তাও সে জানে।

আরো একটা কথা মনে হয় কিরীটীর ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই যদি

আত্মহত্যা না করে থাকেন এবং বেঁচেই ছিলেন—সে কথাটা কাউকে না জানতে দেবার কি কারণ থাকতে পারে। অন্য কাউকে না জানালেও স্ত্রীকেও অন্তত জানাতে পারতেন।

এমনও হতে পারে স্ত্রীকে তাঁর বেঁচে থাকার কথাটা জানতে দেবেন না বলেই হয়তো অন্য কাউকেই কথাটা জানতে দেননি।

স্ত্রীর সঙ্গে তার কোন দিন যাকে বলে মনের মিল তা ছিল না। বিবাহিত জীবনে ভদ্রলোক সুখী ছিলেন না, আর সেই কারণেই হয়তো চুপচাপ ছিলেন। তাই চিঠিপত্রও দেননি স্ত্রীকে হয়তো। ঐ সঙ্গে এই চিন্তাটাও মনের মধ্যে আসে—এতদিন চুপচাপ থেকে হঠাৎই বা আজ কথাটা স্ত্রীকে জানালেন কেন?

কোন নির্দিষ্ট কারণ ছিল কি এতদিন কথাটা চেপে রাখার। তার চাইতেও বড় কথা—ভদ্রলোক পুরীর হোটেলে গিয়ে আত্মহত্যাই বা করতে গেল কেন, যদি অবিশ্যি সত্য সত্যিই আত্মহত্যা করেই থাকেন।

পারিবারিক জীবনে ভদ্রলোক সুখী ছিল না সত্যি। সেটাও তার স্ত্রীর মতে চরিত্রের জন্যই। মানুষটা বরাবর স্বার্থপর, লোভী। প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়ে এসে প্রৌঢ় বয়সেই বা এমন কি ঘটনা ঘটল যে তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হবে। তাও নৃশংসভাবে গলায় ক্ষুর চালিয়ে, অবশ্য যদি ঘটনাটা সত্যি বলেই ধরে নেওয়া যায়। তাও সব যেন কেমন গোলমেলে।

না, কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঐ ভাবে ভদ্রলোকের আত্মহত্যা করবার। কিংবা এও হতে পারে পুরী যাবার পর এমন কোন ঘটনা হয়তো ঘটেছিল যে লোকটা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পেয়েছে। কিন্তু কি-ই বা এমন এক প্রৌঢ়ের জীবনে ঘটতে পারে, যে শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মহত্যা করতে হল? লোকটার অতীত জীবনে এমন কিছু ছিল না তো, যে কারণে তাকে প্রৌঢ় বয়েসে চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর আত্মহত্যা করতে হয়েছিল?

কিরীটী কোন সূত্রই খুঁজে পায় না। যে সূত্র ধরে সে এগুতে পারে।

॥ চার ॥

দিন দুই বাদে মালতী দেবী আবার এলেন কিরীটীর গৃহে। কিরীটী বললে আসুন মিসেস চ্যাটার্জী, বসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম এ দু'দিন।

মালতী আসন গ্রহণ করলেন।

কিরীটী বললে, মিসেস চ্যাটার্জী, আমরা যদি ধরে নিই যে আপনার স্বামী ক্ষিতীন্দ্রবাবু তিন বছর আগে পুরীর হোটেলে আত্মহত্যা করেননি, আজও বেঁচে আছেন এবং কোথাও আত্মগোপন করে আছেন সেক্ষেত্রে স্বভাবতই যে প্রশ্নটা সর্বাগ্রে আমাদের মনে জাগে, সেটা হচ্ছে নাই যদি মারা গিয়ে থাকেন তবে আত্মগোপন করে আছেন কেন ? আচ্ছা, তাঁর অতীত জীবনের এমন কোন ঘটনা কি আপনার জানা আছে যেটা বরাবর তিনি সকলের কাছ থেকে গোপন করে এসেছেন বলে আপনার মনে হয় ?

না। আর সে রকম কিছু থাকলেও আমার জানা নেই, তা ছাড়া সে নিজে প্রয়োজন ছাড়া আমাদের কারও সঙ্গে বিশেষ কোন কথাই বলত না, নিজের জামা-কাপড় আহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কিছু ভাবত বলে আমার মনে হয় না।

টাকা পয়সার প্রতি কেমন আকর্ষণ ছিল আপনার স্বামীর ?

ছিল তবে সেটা এমন কিছু একটা উল্লেখযোগ্য নয়।

আচ্ছা মিসেস চ্যাটার্জী, আপনার স্বামীর এ ফিক্সড্ ডিপোজিটের টাকাটা ছাড়া আর কোন টাকা ছিল না। অতদিন চাকরি করেছিলেন বলছেন এবং শেষের দিকে ভালই মাইনা পেতেন বললেন।

মালতী কিরীটীর প্রশ্নের উত্তরে বললে, মনে হয়ে ছিল। তবে সে সম্পর্কে আমি কিছুই কোনদিন জানতে পারিনি। এমন কি ঐ যে ফিক্সড্ ডিপোজিটের টাকাটার কথা বললাম তাও সে যদি একদিন নিজে থেকে আমাকে না বলত তো জানতেও পারতাম না হয়তো।

কোন লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল না ক্ষিতীন্দ্রবাবুর ? কিরীটি পুনরায় প্রশ্ন করে।

ছিল কিনা জানি না, আসলে ঐ সব মানে টাকা পয়সার ব্যাপারে কখনও আমি মাথা ঘামায়নি। ও বারবার ওর নিজের মর্জিমত চলত, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতাম।

কেন ?

পারিবারিক জীবনটা ক্রমশ ওর স্বার্থপর ব্যবহারে এমন বিষিয়ে তুলেছিল যে,আমার কোন দিন প্রবৃত্তি হয়নি দু'জন একত্রে বসে দু'দণ্ড কথা বলবার।

স্নেহ মমতা কেমন ছিল ? ভালোবাসা—

সাধারণত এগুলি ওর ছিল বলে আমার মনে হয় না, থাকলেও তা নিজের পরেই—

কিন্তু বিবাহের পূর্বে তো আপনি—

তাকে জানতাম। ঠিকই—কিন্তু পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে বিবাহের পূর্বে সেটা একটা অভিনয় ছিল বোধহয়। ভালবাসার একটা অভিনয়—তাই প্রথমটায় না বুঝতে পারলেও, বলতে লজ্জা ঘৃণা হয়, আমাকে তার বোধ হয় একমাত্র প্রয়োজন ছিল রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য আমার দেহটার—

সংসারে তাহলে আপনাদের কোন শান্তি ছিল না বলুন—

কেমন করে থাকবে বলুন, এমন একটা মানুষের সঙ্গে ঘর করলে কোন শান্তি বা সুখ থাকে কি?

মিসেস চ্যাটার্জী, এবারে বলুন তো, তিন বছর আগে পুরীর হোটেলে যে মৃতদেহটা আপনি সনাক্ত করেছিলেন, ভালো করেই ডেড বডিটা তো দেখেছিলেন, না কি স্বামীর প্রতি যে অবজ্ঞা ঘৃণা ও বিরক্তি দীর্ঘকাল পোষণ করে এসেছেন মনে মনে সেই সব নিয়েই মানে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখেছিলেন—

মালতী দেবী চুপ করে রইলেন।

আমার কি মনে হয় জানেন, মৃতদেহটা সেদিন নিশ্চয় আপনি ভালো করে দেখেননি। দেখলে হয়তো চেনার মধ্যে আপনার সেদিন কোন ফাঁক থাকত না। মনে মনে যদি আমার বুঝবার না ভুল হয়ে থাকে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে আপনি যে মুক্তি চাইছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি যখন আপনার সামনে এসে অকস্মাৎ দাঁড়াল আপনি সেই মুক্তিকেই স্বাগত জানালেন—এমনকি পরবর্তী আপনার বৈধব্য জেনেও।

আমি—

নচেৎ সেদিনকার তার সেই মৃত্যু আর পরবর্তী কালের এই চিঠি—জানবেন কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঠিক আছে মালতী দেবী এ রহস্যের মীমাংসা কষ্টসাধ্য হবে না বলেই মনে হয়।

তাহলে কি মিঃ রায়, আপনি বিশ্বাস করেন সে আজও জীবিত?

তাই আমার মনে হচ্ছে—

তাহলে—আমি, আমি সকলকে কি বলব?

দেখুন স্বামীর ভয়াবহ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে যে কোন স্ত্রীই ঐ ধরনের ভুল করতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। তাছাড়া আপনি কেন

একমাত্র আপনার দিকটাই ভাবছেন, ক্ষিতীন্দ্রবাবুর দিকটাও ভাবুন same problem তো বেঁচে উটলে তাকেও face করতে হবে। সেটা নিশ্চয় তার পক্ষে খুব একটা কিছু সুখের হবে না। কিন্তু তার মধ্যেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—অর্থাৎ তিনি যদি হঠাৎ আজ আবার সত্যিই বেঁচে উঠতে চান—তো কেন। আবার বেঁচে উঠবার নতুন করে তার কি কারণ থাকতে পারে, কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কেবলমাত্র ঐ ফিক্সড ডিপোজিটের টাকাটার জন্য তিনি আজ আবার বেঁচে উঠতে চাইছেন আমার মন মেনে নিতে পারছে না। নিশ্চয়ই আরো কোন কারণ আছে। সেটা কি, কি হতে পারে। তারপর একটু থেমে কিরীটী বলল, সে যাই হোক, আপনি জানতে চান সত্যি সত্যিই আজ আপনার স্বামী বেঁচে আছেন কিনা—মনে হয় আপনার সেই প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব।

মালতী দেবী বললেন, আসল সত্যটুকু আমাকে জানতেই হবে মিঃ রায়। বলতে আমার কোন দ্বিধা বা লজ্জা নেই—যে মানুষটা দীর্ঘ একটা যুগ কেবল আমাকে মানসিক পীড়নই করে গিয়েছে, সে মরেও আবার বেঁচে উঠে আমাকে কেন যে অপদস্থ করতে চায় সেটা আমার জানা আজ খুব বেশী প্রয়োজন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কত বড় দুঃখে কোন এক স্ত্রীর মুখ থেকে তার স্বামী সম্পর্কে এই কথাটা বের হতে পারে—

যদি সত্যিই তিনি বেঁচে থাকেন, আপনাকে তিনি অপদস্থ করতে চাইছেন তাই বা ভাবছেন কেন মিসেস চ্যাটার্জী?

কেন ভাবছি—তাই না, আমি মানে আমার মতো করে তো কেউ ঐ মানুষটাকে চেনেনি চিনবার সুযোগও পায়নি। যাকগে সে কথা, আজ আমি উঠি। আপনি তাঁর একটা ফটো চেয়েছিলেন, এই নিন—বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দিন-দশেক আগে তোলা এই ফটোটা। চলি—ফটোটা কিরীটীর হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মালতী দেবী।

আসুন—

মালতী চলে গেলেন।

কিরীটী মনে মনে মানুষটাকে কল্পনা করবার চেষ্টা করে ফটোটা সামনে ধরে। বেশ বোঝা যায় মাথার সামনের দিকে বিস্তৃত টাক, কিন্তু টাকটা ঢাকা দেওয়া হয়েছে এক দিককার বড় বড় চুল অন্য দিকে সযত্নে এনে।

চোখ দুটো ছোট ছোট, বর্তুলাকার। চোখের চাউনি দেখে মনে হয়, যেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষটি, কিন্তু স্ত্রী মালতী যে পরিচয় তার দিয়ে গেলেন সেটা ঠিক বিপরীত। চোখের দৃষ্টি থেকে মনের গতিবিধি বোঝা সত্যই অনেক সময় দুষ্কর।

কৃষ্ণা এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

কার ফটো নিয়ে তন্ময় হয়ে আছো গো?

কিরীটী মৃদু হেসে ফটোটা স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরল। দেখ তো কৃষ্ণা, মানুষটিকে কেমন বলে মনে হয় তোমার এই ফটো দেখে।

কৃষ্ণা স্বামীর হাত থেকে ফটোটা নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, সযত্নে চুল দিয়ে টাক ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে, আত্মসচেতন—মনে হয় চোখ দুটো মিথ্যা বলছে—আদৌ সহজ সরল নয় মানুষটি। বরং একটু লোভী। তা এ কে?

ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাল রাত্রে তোমাকে যার কথা বলছিলাম। লোকে জানে বছর তিনেক আগে পুরীর এক হোটেলে আত্মহত্যা করেছেন—

বাজে কথা, আত্মহত্যা করেনি, করতে পারে না। তার প্রমাণ তো ঐ চিঠিটাই—

চিঠিটা অন্য কারো লেখাও তো হতে পারে, হাতের লেখা নকল করে চিঠি দিয়েছে। না, একই লোকের হাতের লেখা চিঠিগুলো, আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত কৃষ্ণা। কিরীটী বললো।

তাহলে—

যদি অনুমান আমার না ভুল হয়ে থাকে। তাহলে এই তিন বছর চুপচাপ ছিল কেন ভদ্রলোক?

কারণ কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই ঐ নিস্তব্ধতার পিছনে, হয়তো যে হোটেলে তিন বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল তারই সঙ্গে ঐ নিস্তব্ধতার কোন ঘনিষ্ঠ কার্য-কারণ রয়েছে। তবে এটাও ঠিক, আজও যদি সে বেঁচেই থেকে থাকে। মালতী দেবীর কাছ থেকে দূরে থাকলেও তার সমস্ত খবরাখবর ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাখতেন বরাবরই।

এ কথা বলছ কেন?

নচেৎ মালতী দেবী টাকা তুলবেন সে কথাটা জানলেন কি করে ক্ষিতীন্দ্রবাবু। না কৃষ্ণা, প্রথম দিকে সব শুনে ব্যাপারটা যত সহজ

ভেবেছিলাম এখন মনে হচ্ছে হয়তো তত সহজ নয়, সমস্ত ঘটনার মূল শিকড়টা মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আমি যখন হাত দেব স্থির করেছি, বর্তমান রহস্যের গিঁট আমি খুলবই। শোন, সর্বাগ্রে আমাকে একবার জামসেদপুর যেতে হবে।

জামসেদপুর ?

হ্যাঁ। ওখানে আমার এক বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক আছেন। অনুসন্ধান আমাকে টিসকো থেকেই শুরু করতে হবে।

বঙ্কিম সুর বহুকাল জামসেদপুর নিবাসী। চাকরির শুরু থেকেই জামসেদপুরে, যদিও দেশ তার হাওড়ায়। বঙ্কিম সুর টিসকোতেই চাকরি করত, বছর চার পাঁচ হল রিটায়ার করে ওল্ড সারকিট হাউস এরিয়াতে বাড়ি করে বসবাস করছে।

দুই ছেলে, দুটি ছেলেই কৃতি। একজন কলকাতায় চাকরি করে বিরাট একটা ফার্মে অন্যজন টিসকোতেই চাকরি করছে ছোটোখাটো রোগা পাতলা মানুষটি। দিবারাত্র যেমন পান চিবাচ্ছে তেমনি টানছে সিগ্রেট একটার পর একটা, চেন স্মোকার। হাসিখুশি রসিক মানুষ। তার কাছ থেকে অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

ট্রেন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কিরীটী সোজা নটরাজ-এ গিয়ে উঠল, হোটেলটা বেশ বড় এবং সব রকম ব্যবস্থাই আছে—

হোটেলের ঘরে বসেই ফোন করল কিরীটী বঙ্কিমকে।

কে বঙ্কিম, আমি কিরীটী—

কিরীটী ! কোথা থেকে কথা বলছ হে ? বঙ্কিম জানতে চান।

নটরাজ হোটেল। একবার চলে এসো না—

তা তুমি আমার বাসায় না উঠে হোটেলে উঠতে গেলে কেন হে ?

তুমি হোটেলে এসো, সব জানতে পারবে।

আধঘণ্টার মধ্যেই বঙ্কিম এলো, মুখে একগাল পান, হাতে সিগ্রেট। বললে, উঃ অনেক দিন পরে দেখা। তা খবর কি বল, হঠাৎ এখানে—

কিরীটী সংক্ষেপে তার আসার উদ্দেশ্য বলে গেল।

সব কথা মন দিয়ে শুনলো বঙ্কিম। তারপর বললে।

ক্ষিতীন্দ্রকে আমি বেশ ভাল করেই চিনতাম। তা সে তো বছর তিনেক আগে সুইসাইড করেছে পুরীর এক হোটেলে। ব্যাপারটা কি বল তো ?

সেই ভদ্রলোক সম্পর্কে কি জানো বল। তুমি তো তাকে চিনতে বললে।

হ্যাঁ, প্রায় সন্ধ্যাতেই একটা ভাঙা সাইকেল নিয়ে আমার বাসায় আসত, তাস খেলতে।

তাস খেলার নেশা ছিল বুঝি?

তা ছিল।

অন্য কোন নেশা?

দেখ ভাই, নেশা করতে হলে একটা দিল চাই। নেশা কি সকলে করতে পারে। তাছাড়া—লোকটা ছিল স্বভাব কৃপণ, আর সে কৃপণতার জন্য সে পারত না তুনিয়ায় এমন কোন কাজই ছিল না। তার উপরে ছিল মুখে সর্বদা বড় বড় বোলচাল। অনেকটা বলতে পারো ‘বোকা চালিয়াৎ’, বোকা এইজন্য বলছি, নিজের ভালোটা যেমন বুঝতে পারত না, তেমনি ঐ চালিয়াতির জন্য তার যে ক্ষতিটা হত সেটা বুঝবার কোন চেষ্টা করত না। কিন্তু মানুষটার অন্তরটা ছিল পরিষ্কার, কিন্তু ঐ যে বললাম, বোকা, সমস্ত গুণই তার সেটা নষ্ট করে দিয়েছিল, তা কি ব্যাপার বল তো?

দেখ বঙ্কিম, এবার একটা সত্যি কথা বল তো, তুমি লোকটার যে চরিত্র বর্ণনা করলে, তাতে করে কি মানুষটা সুইসাইড করতে পারে বলে তোমার মনে হয়? তাও গলায় ক্ষুর চালিয়ে? গলায় দড়ি দেওয়া যায়, বিষ পানও করা যায় কিন্তু গলায় ক্ষুর চালানোর জন্যে অন্য এক ধরনের নার্ভের দরকার। তাই নয় কি!

তা ঠিক, তবে momentary insansity-তে মানুষ—

কিন্তু সেটাই বা হঠাৎ তাঁর হবে কেন? চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে, তারপর পুরীতে বেড়াতে গিয়েছে। ছেলেরা মানুষ হয়ে গিয়েছে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে—

সবই ঠিক, কিন্তু পারিবারিক শান্তি তো ছিল না একেবারেই—তাছাড়া কেবল স্ত্রী কেন, ছেলেমেয়েদের ভালোবাসাও মানুষটা কোন দিন পায়নি।

কেন?

সেও তার নিজের চরিত্রের জন্য। অমন আত্মসর্বস্ব মানুষ হলে সন্তানদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পাওয়া যায় না কিরীটী। সংসারে থেকেও তো সে সংসারের কেউ ছিল না। একেবারে একা যাকে বলে!

কি জানো বঙ্কিম, কম তো বয়স হল না, কম দেখলামও না। বেশীর ভাগই দেখেছি মানুষ নিজের দুঃখ নিজেই তৈরী করে নেয়। সংসারে বাস করতে হলে একটা সততা বজায় রাখতে হয়।

তা ঠিক, বঙ্কিম স্নুর হেসে বলল, কিন্তু তুমি ক্ষিতী সম্পর্কে এত সংবাদ জানতে চাইছ কেন তা তো বললে না—

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো ভদ্রলোক আজও বেঁচে আছেন।

কি বলছ তুমি !

বলছি তিন বছর আগে পুরীর হোটেলে যে আত্মহত্যা করেছিল বা খুন হয়েছিল সে তোমাদের পরিচিত মালতী দেবীর স্বামী ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নন।

অসম্ভব ! মালতী দেবী নিজে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করে এসেছিলেন—

তার ভুলও তো হতে পারে।

ভুল ! স্ত্রী স্বামীকে চিনতে ভুল করবেন ?

ইচ্ছা করেও তো ভুলটা করতে পারেন। কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

ইচ্ছা করে ! কিন্তু কেন ?

সেই কেনর জবাবটা পেলেই তো সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যায় বঙ্কিম। তুমি জানো না বঙ্কিম, কিছুদিন আগে মালতী দেবী তার স্বামীর হাতের লেখা একখানা চিঠি পেয়েছেন।

চিঠি ! মানে ক্ষিতী চিঠি লিখেছে তার স্ত্রীকে ?

হ্যাঁ। সে চিঠি আমি দেখেছি। অন্য দু'খানা চিঠির সঙ্গে মিলিয়েও দেখেছি, সব চিঠিই যে একই হাতের লেখা সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটা যেন কেমন আমার গোলমেলে ঠেকছে—ক্ষিতী আজও বেঁচে আছে, তাছাড়া—

—কি।

এ ধরনের একটা ব্যাপার গড়ে তুলবার তার কি প্রয়োজন ছিল ?

হয়ত ছিল কিছু একটা !

কিন্তু তার পরে আমার বেচে উঠবারই যখন ইচ্ছা ছিল তখন।

এই তিন বছরে কেন সে চুপ চাপ ছিল—তাই না।

হ্যাঁ—

নিশ্চয়ই হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়নি।

না, সন্ন্যাসী হবার মতো মানুষ সে নয়। তিনজনের খাবার না খেলে যেমন তার চোরা দ্বিতীয় পাকস্থলীটা ভরতো না, তেমনি বড় বড় মিথ্যা বোলচাল না দিলে তার পেট ফাঁপে, মানে কাঁপত—আচ্ছা, মালতী কি বলছেন?

মনে হল ব্যাপারটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর হচ্ছে—

কেন, এতো আনন্দের কথা, সত্যিই যদি ক্ষিতী আজও বেঁচে থাকে—

না বঙ্কিম, আমার তো মনে হয় সেটা আনন্দ সংবাদ বহন করে আনবে না। তুমি কি ভাবতে পারো বঙ্কিম, ব্যাপারটা ক্ষিতীন্দ্রর পক্ষে কত বড় একটা নিষ্ঠুর পরিহাস—

সত্যি, মানুষটার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। সত্যিই বেচারা হতভাগ্য, যেটা হতে পারত সত্যিকারের একটা আনন্দ সংবাদ সেটাই যদি—

তবু আমি মালতী দেবীকে কথা দিয়েছি বঙ্কিম, ঐ রহস্যের একটা মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করব, কারণ ব্যাপারটা জানতে তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব। যাক সে কথা, আমার আরও কিছু জানবার আছে ক্ষিতীন্দ্র সম্পর্কে।

বঙ্কিম বললেন, কি জানতে চাও বল।

প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্রে কিছু দোষ ও গুণ থাকে, মানুষটার চরিত্রে কালো দিকটাই তোমাদের কাছে শুনেছি, মানে তার স্ত্রী ও তোমার মুখ থেকে। তার চরিত্রে কোন ভালো দিকই কি ছিল না?

তোমার ঐ প্রশ্নের জবাবে একটা কথাই বলতে পারি কিরীটী, ওকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। এমন কি আমি যতদূর জানি ওর নিজের বাপ-মাও বোধ করি ওকে কোন দিন ভালোবাসতে পারেনি।

কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বললে, আচ্ছা, উনি তো শুনেছি মানে ক্ষিতীবাবু মালতী দেবীকে ভালোবেসেই বিবাহ করেছিলেন, এবং মালতী দেবীও ভালোবেসেছিলেন একদা ঐ মানুষটিকে—

গোড়ার কথাটা অবিশ্যি তাই। কিন্তু আমার মনে হয় ক্ষিতীকে ঘিরে মালতী দেবীর স্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হয়নি। আমার কি মনে হয় জানো, ঘটনাকে তার নিজস্ব গতিতেই এগিয়ে যেতে দাও কিরীটী, তুমি দূরে সরে যাও।

কিন্তু আমি যে ভাই কথা দিয়েছি মালতী দেবীকে, কিরীটী বললে, তাছাড়া আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে বোধ হয় আমিও ফিরতে পারব না।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। বঙ্কিম একটু পরে উঠে দাঁড়াল, এবার আমি তাহলে চলি। রাত্রে তুমি কিন্তু আমার ওখানে খাবে কিরীটী।

না, না, বরং তুমিই হোটেলে এসো, একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।

ভালো কথা, একটা কথা বোধ হয় তোমার জানা প্রয়োজন কিরীটী—

কি বল তো—

ক্ষিতী হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দিন দশেক আগেই বোধ করি, এক সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে দুজনে তাস খেলছিলাম ঐ সময় এক ভদ্রলোক ক্ষিতীর খোঁজে আমার বাড়ীতে এসে হাজির—পরনে একটা দামী স্যুট, চোখে কালো চশমা। বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি। নাম বললেন জীমূতবাহন। ক্ষিতী কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোককে চিনতে পারল না।

জীমূতবাহন, বললেন সে কি হে! সত্যি সত্যিই তুমি মনে করতে পারছ না ক্ষিতীন্দ্র—জীমূতবাহন ঘোষালকে তোমার মনে পড়ছে না? রাজসাহী কলেজে একসঙ্গে দু'বছর পড়েছি—থাকতামও একই হোস্টেলে পাশাপাশি ঘরে—

না, আমি দুঃখিত। সত্যিই মনে পড়ছে না। ক্ষিতী বললে।

বঙ্কিম বলতে লাগল, যে কারণে তোমাকে ঘটনাটা বলছি কিরীটি —আমি কিন্তু তখন অপার বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের ও চেহারার দিকে তাকিয়ে আছি। এমন আশ্চর্য মিল দুজনার চেহারার মধ্যে। অবিশ্যি আগন্তুকের চোখে কালো চশমা থাকায় তার চোখ দুটো আমি দেখতে পাইনি।

চশমা চোখ থেকে খোলেনি সে?

না। কেবল বেশভূষায় দুজনের পার্থক্য, ভদ্রলোকের পরনে দামী স্যুট, যে ধরনের দামী স্যুট ক্ষিতী জীবনে কখনো পরা তো দূরে থাক তার কল্পনারও বাইরে, এবং দুজনের গলার স্বর ও দাঁড়াবার ভঙ্গীটাও সম্পূর্ণ আলাদা—

তারপর ? কিরীটীর কণ্ঠস্বরে বেশ একটা কৌতূহল।

ক্ষিতীর সে সময়কার চোখ মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, ক্ষিতী বোধ হয় সত্যিই তাকে চেনে না। তার কথার মধ্যে মিথ্যা ছিল না। যাক, তারপর যা বলছিলাম, মৃদু হেসে জীমূতবাহন বললেন, তাহলে আর কি হবে, চিনতেই যখন আমায় পারলে না কি আর বলব। মিলিও হয়তো তোমারই মতো আজ আমায় চিনতে পারবে না, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি ক্ষিতীন্দ্র, আর তাকেও না। আচ্ছা চলি ক্ষিতীন্দ্র, গুড নাইট।

জুতোর শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আগন্তুক। এতক্ষণ আগন্তুককে একদৃষ্টে দেখছিলাম, এবার আমার সামনে চৌকির উপরে উপবিষ্ট ক্ষিতীর দিকে তাকালাম। মনে হল ক্ষিতি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক, তার দু-চোখের দৃষ্টি যেন বাইরের অন্ধকারে নিবদ্ধ।

বাইরে শীতের রাত তখন ঝিমঝিম করছে। আর জামসেদপুরে শীতও সে সময় প্রচণ্ড। একেবারে যাকে বলে হাড় কাঁপানো শীত।

খেলা তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাসগুলো তখনো সামনে তেমনি ছড়ানো পড়ে আছে। হঠাৎ ক্ষিতী উঠে পড়ল, বললে, চলি রে বন্ধু—

বললাম, সে কি ! খেয়ে যাবি না ? কড়াইশুটির খিচুড়ি, ফুলকপি ভাজা করছেন তোর বৌদি।

না। আজ থাক।

আমার স্ত্রী সেদিন খিচুড়ি রেঁধেছিল, বাড়ীতে এটা ওটা রান্না হলেই আমার স্ত্রী ক্ষিতীকে বলত, ক্ষিতীবাবু, রাত্রে আজ খেয়ে যাবেন। ক্ষিতীও সানন্দে সম্মত হয়ে যেত। তাই সেদিন অবাক হলাম, আশ্চর্য ব্যাপার, ক্ষিতির আহারের ব্যাপারে ঔদাসিন্য ! কখনও আগে দেখিনি।

না না, সে কি ! চল খাবি চল—বললাম।

না, আজ চলি। আর একদিন খাওয়া যাবে—কথাগুলো বলে ক্ষিতী আর দাঁড়ালো না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তারপর ? কিরীটী শুধাল।

তারপর যা ইতিপূর্বে কোন দিন হয়নি তাই হল, দিন দশেক ক্ষিতী আর এলোই না। আমার স্ত্রী একদিন বললেন, তোমার বন্ধুর ব্যাপার কি, আর যে আসেন না।

সেইদিনই আমি ক্ষিতীর বাসায় গেলাম খোঁজ নিতে। মালতী দেবী বললেন, সে তো নেই—

নেই! কোথায় গিয়েছে?

আমার মনে হয় কলকাতাতেই গিয়েছেন—

কলকাতায়!

হ্যাঁ, তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু শিশির গুপ্ত, বোধ হয় সেখানেই গিয়েছেন—

আমিও জানতাম—বঙ্কিম বলতে লাগলেন, ক্ষিতীর দীর্ঘদিনের এক বন্ধু ছিল। ভদ্রলোক বোধ হয় সত্যিই ক্ষিতীকে ভালোবাসতেন নচেৎ কতবার যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ও ঝগড়া বাধিয়ে অকারণ অজুহাতে সম্পর্ক ছেদ করেছে, তার গোনাগুণতি নেই। আবার নিজেই গিয়ে ভাব করেছে, কারণ বোধ হয় ক্ষিতী জানত ঐ একটি মাত্র মানুষ সত্যিই তাকে ভালোবাসেন। এর দিন দুই পরেই ঐ দুঃসংবাদ পেলাম, ক্ষিতী পুরীর এক হোটেলে আত্মহত্যা করেছে গলায় ক্ষুর চালিয়ে—

কিরীটী থামল। দেবেশ অধিকারী এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। এবার ধীরে ধীরে বললেন, এ যে রীতিমত এক রহস্য রায়মশাই, আপনি তাহলে ঐ রহস্যের একটা কিনারা করতেই এসেছেন পুরীতে?

হ্যাঁ—

কিন্তু তিন বছর আগে যে ব্যাপার ঘটে গিয়েছে—

১৭নং সেই ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে আজও হয়তো অনেক কিছুই শোনা যাবে দেবেশবাবু। সে রাত্রের সেই ঘটনার সাক্ষী তো ঐ ঘরের দেওয়ালগুলোই, আর সামনে ঐ সমুদ্র নীল।

এইসব আজগুবি আপনি বিশ্বাস করেন রায়মশাই?

করি বৈকি।

ঐ সময় গোপী এসে বললে, ১৭নং ঘর পরিষ্কার করে বেডিং পেতে দেওয়া হয়েছে।

কিরীটীর সঙ্গে একটা স্যুটকেস ছাড়া বেশী কিছু মালপত্র ছিল না। সেটা গোপী হাতে তুলে নিল। কিরীটী তাকে অনুসরণ করল।

১৭নং ঘর। ঘরে পা দিতেই কিরীটীর কেমন যেন একটা বিচিত্র

অনুভূতি জাগে মনের মধ্যে। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে ঘরটার চারিদিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল কিরীটী।

তিন বছর আগে এই ঘরেই এক রাত্রে একজন নিহত হয়েছিল বা আত্মহত্যা করেছিল। মোট কথা একজনের দেহান্ত হয়েছিল। তারপর এই তিন বছরে জনা দুই এই ঘরে রাত্রিবাস করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। এবং ঐ ঘটনার পর এ ঘরে আর কোন যাত্রীকে রাখা হয়নি।

ভূতের ভয়।

ভূত ইতিপূর্বে কিরীটী দেখেনি বটে তবে তার উপস্থিতি অনুভব করেছে। এবং কিরীটীর একটা বদ্ধমূল ধারণা ভূতেরা কারো কোনো অনিষ্ট করে না।

ঘরটা আকারে বেশ বড়ই। সমুদ্রের দিকে পর পর দুটো জানালা। জানালায় মোটা মোটা শিক বসানো, বেশ একটু ফাঁক ফাঁক করেই।

খোলা জানালা পথে সমুদ্র সারাটা দৃষ্টি জুড়ে যেন এক আদিগন্ত বিস্ময়কর ছবির মতো ভেসে ওঠে। নীল আকাশ চক্রবালে নীল সমুদ্রের পর ঝুঁকে যেন নিজেকে নিজে দেখাচ্ছে আর দেখছে। দেখার বুঝি শেষ নেই। অজস্র সূর্যালোক। বহু মোচার খোলার মতো দোদুল দুলছে ইতি উতি কয়েকটা জেলে ডিঙ্গি।

১৮নং ঘরে সরিৎশেখর জানালার কাছ থেকে সরে এলো।

অনুরাধা দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে। সরিৎশেখর একটা সিগ্রেট ধরাল। খুব বেশী ধূমপান করে না। সরিৎশেখর, মধ্যে মধ্যে এক আধটা সিগ্রেট ধরায়, তা ও শেষ পর্যন্ত অর্ধেকের বেশী থাকতেই ফেলে দেয়। ভাবছিল সরিৎশেখর, অনুরাধা তাহলে বিবাহিতা। ঐ সলিল দত্ত মজুমদারকেই বিবাহ করেছে।

অনুরাধা পরস্ত্রী, একজনের গৃহিণী।

সুখী হয়েছে কি অনুরাধা সলিলকে বিবাহ করে?

প্রশ্নটা কেন জানি সরিতের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। হাতে ধরা সিগ্রেটটা পুড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

অনুরাধা হেঁটে চলছিল।

পায়ের তলার বালি ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। তপ্ত বালুকা থেকে

যেন একটা তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সমুদ্রের এলোমেলো হাওয়ায় গায়ের কাপড় ঠিক থাকে না।

আজ ২৯শে জুলাই। যেদিন প্রথম সরিতের সঙ্গে ওর আলাপ সেদিনও ছিল ২৯শে জুলাই, প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়েছিল সেদিন কলকাতা শহরে।

চলতে চলতে অন্যমনস্ক ভাবে অনুরাধা একবার আকাশের দিকে তাকাল, কয়েকটা পাতলা মেঘ ভাসছে আকাশে। ঐ ধরনের মেঘে বৃষ্টি হয় না।

বৃষ্টি নামলে কিন্তু বেশ হত। নামবে কি বৃষ্টি—কে জানে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর চলে এসেছিল অনুরাধা।

কিন্তু তবু একবারও হোটেলে ফেরার কথাটা তার মনে হয় না।

কি হবে হোটেলে ফিরে। এতক্ষণে হয়তো মানুষটা ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকলেই তো তাকে সেই মানুষটার মুখোমুখি হতে হবে। অসহ্য—অসহ্য হয়ে উঠেছে যেন।

অথচ নিষ্কৃতি নেই তার, মুক্তি নেই ঐ মানুষটার বন্ধন থেকে। আজ বুঝতে পারছে যেন অনুরাধা, ঐ লোকটাকে কোন দিন সে কামনা করেনি। কোন দিন সহ্য করতে পারেনি অথচ ওর হাত থেকে মুক্তিরও কোন পথও জানা নেই তার।

হোটেলের ম্যানেজার ভবেশ অধিকারী বড় একটা বাঁধানো খাতায় ঝুঁকে পড়ে গত মাসের হোটেলের প্রত্যেক দিনের খরচ খরচাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। রীতিমত লাভবান ব্যবসাটা, প্রতি বছর লাভের অঙ্কটা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

আজকাল প্রায়ই একটা চিন্তা ভবেশের মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে—আর একটা হোটেল খুললে কেমন হয়।

ছোট ভাই বারাণসীতে এম-কম পাশ করে ব্যাংকে একটা চাকরি পেয়েছে বটে কিন্তু কি-ই বা এমন রোজগার করে, ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে হোটেলে বসলে অনেক উপার্জন করতে পারবে।

ভবেশ ভাইকে কথাটা অনেকবার বলেছেন কিন্তু সে কান পাতেনি।

একটা জুতোর শব্দে মুখ তুলে তাকালেন ভবেশ।

দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ছোট চামড়ার স্যুটকেশ, অনেক দিনের পুরাতন। এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাকা চুল, এক মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখে মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। পরনে একটা নোংরা টেরিলিনের প্যান্ট ও গায়ে অনুরূপ একটা টেরিকটের হলদে রঙের শার্ট।

কি চাই?

এ হোটেলে একটা আলাদা ঘর পাওয়া যাবে?

কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে—ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন ভাঙা ভাঙা একটু কর্কশও।

কিন্তু এ সময় কলকাতা থেকে কিসে এলেন?

কেন ট্রেনে।

এসময় কোন্ ট্রেনে?

এত প্রশ্ন করছেন কেন বলুন তো? জায়গা আছে কিনা তাই বলুন।

কয়দিন থাকবেন? ভবেশ অধিকারী আবার প্রশ্ন করেন।

একমাস থাকতে পারি, সাত দিনও থাকতে পারি, একদিন বা একঘণ্টাও থাকতে পারি, আপনি যা চার্জ করবেন দেব—ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

ভবেশ অধিকারী তখনো তাকিয়ে আছেন আগন্তুকের দিকে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। ৬৪/৬৫ তো হবেই এক আধ বছর বেশী হওয়াও আশ্চর্য নয়। হাফ হাতা টেরিকটের শার্টের বাইরে দুটো রোমশ বাহু। তামাটে বর্ণ, এককালে হয়তো ভদ্রলোকের গায়ের রঙ ফর্সাই ছিল, এখন পুড়ে গিয়েছে।

এক সপ্তাহের ভাড়া জমা দিতে হবে—শুধু থাকবেন না খাওয়া-দাওয়া করবেন?

রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে?

আছে।

তাহলে ফুডিং লজিং, এক সপ্তাহের জন্য কত চার্জ পড়বে?

ত্রিশ টাকা করে রোজ, সাতদিনে—

দুশো দশ তো—এই নিন—ভিতরের পকেট থেকে একটা বহু পুরাতন মানিব্যাগ বের করল আগন্তুক এবং তার ভিতর থেকে একশো

টাকার ছুটো ময়লা নোট ও ততোধিক ময়লা দশ টাকার একটা নোট বের করে দিল।

মালপত্র আর নেই? খাতায় টাকাটা জমা করে ভবেশ অধিকারী বললেন।

না।

গোপী, এই গোপী—ভবেশ অধিকারী চিৎকার করে ডাকলেন।

গোপী রান্নাঘরে বসে আলু কাটছিল, এসে সামনে দাঁড়ালে। কহস্ত—

এই ভদ্রলোককে ১৫নং ঘরটা খুলে দে।

গোপী আগন্তুকের দিকে তাকাল তারপর বলল, আস্থচি—গোপী চলে গেল।

নাম ধামটা এই খাতায় লিখে দিন স্যার।

লিখতে আমি পারি না—ভদ্রলোক বললে।

পারেন না, না লেখাপড়া জানেন না?

জানি, কিন্তু লিখতে পারি না।

কেন?

নিউরস্থানিয়ায় ভুগছি, গত তিন বছর থেকে কলম ধরতে পারি না। লিখে নিন না—চন্দ্রকান্ত ঘাঁই। পুরী ফ্রম ক্যালকাটা টু ব্যাক ক্যালকাটা।

আগন্তুকের দিকে একবার তাকিয়ে খাতায় লিখে নিলেন ভবেশ অধিকারী।

গোপী এসে বললে, চল বাবু।

ভবেশ অধিকারী খাতায় সময় লিখলেন বেলা বারোটা চল্লিশ।

চন্দ্রকান্ত গোপীকে অনুসরণ করল। মাঝখানের বাঁধানো চত্তরটা পার হয়ে বাঁদিক দিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি—আগে আগে গোপী তার পশ্চাতে চন্দ্রকান্ত সিঁড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভবেশ অধিকারী কিন্তু তখনো ভাবছেন কোন্ ট্রেনে ভদ্রলোক এলেন? জগন্নাথ এক্সপ্রেস খুব ভোরে এসে পৌছায়, পুরী এক্সপ্রেস সকাল আটটা সোয়া আটটায় পৌছায় বড় জোর লেট থাকলে নয়টা। এখন পৌনে একটা বেজে গিয়েছে। ভদ্রলোক কি এ হোটেলে আসার আগে অন্যান্য হোটেলে ঢুঁ মেরে দেখছিলেন ঘর পাওয়া যায় কিনা।

সলিল দত্ত মজুমদার ১৬নং ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন আর বিরক্তির সঙ্গে চিন্তা করছিলেন।

ঐ সরিৎশেখর লোকটা হঠাৎ এখানে কেন এসে উঠল? অনুরাধার পূর্ব প্রণয়ী। ব্যাপারটা কি একান্ত আকস্মিক না পূর্বের পরিকল্পনা মতো লোকটা এখানে এসেছে, তাও রয়েছে ১৮নং ঘরে। অনুরাধা তো জানতই তারা পুরীতে আসছে, হয়তো অনুরাধাই জানিয়ে দিয়েছিল তাকে।

এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, এই দুই বছরেও অনুরাধা সরিৎশেখরকে ভোলেনি। আর সরিৎশেখরও অনুরাধাকে ভোলেনি।

একটা তিক্ত হিংসা যেন সলিল দত্ত মজুমদারের বুকের মধ্যে আঁচড়ে আঁচড়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করছে।

এখনো সরিৎশেখরের ঘরেই অনুরাধা।

অনুরাধা যদি নাই জানতো সরিৎশেখর আসবে—তবে তার ঘরে গেল কেন।

যাবে নাকি ১৮নং ঘরে, অনুরাধার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসবে?

॥ পাঁচ ॥

এক সময় থমকে দাঁড়াল অনুরাধা।

সমুদ্রের নির্জন তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ইতিমধ্যে কখন যেন সে হোটেল থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে, এখন বাঁয়ে অশান্ত কল্লোলিত সমুদ্র একখানা গর্জন করে চলেছে, অন্যদিকে ধু ধু বালিয়াড়ী, কোন লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও নেই।

ভিজে বালির উপর দিয়ে হাঁটছিল অনুরাধা। এবারে সেখানেই বসে পড়ল, পা দুটো ক্লান্ত। মধ্যে মধ্যে ঢেউগুলো এসে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মাথায় আঁচলটা ঘোমটার মতো তুলে দিয়ে চপ্পল জোড়া পা থেকে খুলে হাতে তুলে নিয়েছিল অনুরাধা।

রৌদ্রের তাপটা যেন কেমন এখন ঝিমিয়ে এসেছে। আকাশের দিকে তাকাল অনুরাধা, সেই হালকা ইতস্ততঃ ছড়ানো টুকরো টুকরো মেঘগুলো কখন যেন পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে অনেকখানি আকাশের গায়ে জুড়ে বসেছে। কি ভেবে ফিরল অনুরাধা। আর এগুনো হয়তো ঠিক হবে না।

এই দুই বছরে অনুরাধাদের সংসারেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

আকস্মিকভাবেই বছরখানেক আগে মধুছন্দার বিয়েটা হয়ে গেল। রিটায়ার্ড জজ যোগেশবাবু হাঁটিতে হাঁটিতে লেক থেকে ফিরবার পথে অনেক দিন মধুছন্দাকে দেখেছেন, কারণ তার বাড়িও ছিল ঐ রজনী সেন স্ট্রীটেই।

একমাত্র ছেলে তার ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনীয়ার, ভিলাইতে চাকরি করছিল, স্ত্রীর অনেক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল, ছেলে যেবার আই-আই-টিতে ভর্তি হয়।

সংসারে বাপ বেটা ছাড়া কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। ছেলের বিবাহ দেবেন বলে যোগেশবাবু পাত্রী দেখছিলেন, মধুছন্দাকে দেখে তার ভালো লাগে, তিনি নিজে এসে তার মা সরোজিনীর সঙ্গে দেখা করে বিবাহের প্রস্তাব তোলেন।

মা-ও হাতে স্বর্গ পান। তাছাড়া কিছু দিন থেকে পেটের একটা যন্ত্রণায় মা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হত তাকে এবং আরো একটা কথা, অনুরাধার কথা ভেবে ভেবে তার মনের সমস্ত শান্তি চলে গিয়েছিল।

মেয়ে অনু চাকরি নেবার কয়েক মাস পর থেকেই যেন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করেছিলেন ওদের মা সরোজিনী দেবী।

অনুরাধা প্রায়ই তার অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে আজ দিল্লী, পরশু বোম্বাই, তরশু মাদ্রাজ যেতে শুরু করল—কখনো সাত দিন, কখনো দশ দিন পরে ফিরত।

অবিবাহিত বয়েসের মেয়ে, আদৌ ভালো লাগছিল না ব্যাপারটা সরোজিনীর। একদিন আর না থাকতে পেরে প্রশ্নই করলেন, অনু, সরিৎকে আর দেখি না কেন রে? সেই যে যার সঙ্গে তোর পরিচয় ছিল, এখানে প্রায়ই আসত—

তা আসে না কেন আমি জানব কি করে—

সরিৎ তো তোকে বিয়ে করবে বলেছিল—

সে বিয়ে হবে না।

বিয়ে হবে না! কেন, সে বলেছে বিয়ে করবে না?

না—আমার বস দত্ত মজুমদার চান না তার সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখি?

সে আবার কি রকম কথা ?

মিঃ দত্ত মজুমদারকেই আমি বিয়ে করছি—

দত্ত মজুমদারকে বিয়ে করবি ? লোকটার তো অনেক বয়েস হয়েছে—বলছিলি।

তাতে কি হয়েছে, ব্যাচিলার এখনো।

সরোজিনীর ব্যাপারটা আদৌ ভালো লাগল না, কিন্তু তিনি আর কোন কথা বললেন না।

সরিৎশেখর যে গত তুই বছর অনুরাধাকে কখনো পথে যেতে আসতে দেখেনি তার কারণ সে দত্ত মজুমদারের গাড়িতেই সর্বদা যাতায়াত করত। সকালে দত্ত মজুমদারের গাড়ি এসে তাকে নিয়ে যেত, ফিরে আসতে আসতে প্রায়ই রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা হয়ে যেত।

সরোজিনী মেয়েকে কখনো আর কোন প্রশ্নই করেননি। অনুরাধা অফিসে চাকরি করে মোটা মাইনে পায়, নিত্য নতুন দামী দামী শাড়ি ব্লাউজ—সবই দেখতেন সরোজিনী, কিন্তু কোন কথা বলতেন না। তবে মেয়ের হালচাল দেখে অনেক কিছুই অনুমান করতে তার কষ্ট হয়নি। তাই যোগেশবাবুর প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে গেলেন সরোজিনী।

পরের মাসেই মধুছন্দার বিবাহ হয়ে গেল। সে চলে গেল তার স্বামীর কাছে দিল্লীতে। সেই মধুছন্দাই দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসে তার মাকে দিদি সম্পর্কে অনেক কথা বলে গেল।

বললে, সবাই জানে মা, দিদির দত্ত মজুমদারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি।

বিয়ে হয়নি !

না। আমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দিদি দত্ত মজুমদারের রক্ষিতার মতো আছে। দত্ত মজুমদারের স্ত্রী আছে। তাহলেই বুঝে দেখ ব্যাপারটা।

সরোজিনী অস্ফুট একটা চিৎকার করে উঠলেন, মধু—

হ্যাঁ মা, ঐ দত্ত মজুমদারটা একটা স্কাউণ্ডেল—

সরোজিনী যেন পাথর হয়ে গেলেন। অনুরাধা সে সময় কলকাতায় ছিল না। দিল্লীতেই ছিল। চার দিন পরে অনুরাধা যখন ফিরে এলো, ব্যথায় সরোজিনী শয্যাশায়ী। সলিল দত্ত মজুমদার সব শুনে অনুরাধাকে পরামর্শ দিলেন, মাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দাও—খরচপত্র যা লাগে আমিই দেব।

কি জানি কেন অনুরাধা আর কোন আপত্তি করল না। সরোজিনীও আপত্তি করলেন না। কিন্তু নার্সিং হোমে পেট ওপেন করে দেখা গেল, ক্যানসার। এবং রোগ তখন অনেক ছড়িয়ে গিয়েছে, করবার আর কিছু নেই।

তিন মাস বাদে ঐ নার্সিং হোমেই সরোজিনী শেষ নিশ্বাস নিলেন। এবং তারই কিছু দিন পরে সেই বিচিত্র ঘটনাটা ঘটল।

এক শনিবার বেলা তখন সোয়া তিনটে হবে। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে।

অনুরাধা ঘরে একা বসে একটা চিঠি টাইপ করছিল। পাশেই দত্ত মজুমদারের ঘরে একটা তর্কাতর্কি চেঁচামেচি তার কানে এলো।

কড়া গলায় দত্ত মজুমদার ও অন্য এক ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন।

আমি জানতে চাই সলিল, মুকুল কোথায়? পুরুষ কণ্ঠে প্রশ্ন।

আমি তোমার প্রশ্নের কোন জবাব দেব না জীমূতবাহন—

দিতে তোমাকে হবে, মুকুল আমার বোন। তোমার বালীগঞ্জের ফ্ল্যাটে সে নেই, সেখানে অন্য ভাড়াটে—

সে আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী সম্পর্কে সবকিছু তোমার এক্তিয়ারের বাইরে—

হ্যাঁ, স্ত্রীর মর্যাদা তো তাকে যথেষ্ট দিয়েছ—

এখান থেকে চলে যাও—

জবাব না নিয়ে আমি যাব না। আনি জানতে চাই তুমি আবার বিয়ে করেছ কি না?

আমি আবার বিয়ে করেছি! হ্যাঁ করেছি।

তবে শুনে রাখ **I shall drag you to the court!** পলিগেমির শাস্তি কি সেটা জানতে তোমার দেরি হবে না।

I say get out—দত্ত মজুমদারের হাতে পিস্তল, তার ড্রয়ারে সব সময়ই একটা পিস্তল থাকত সেটা তখন তিনি বের করেছেন—**Get out of this room!**

ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, তবে আবার আমাদের দেখা হবে, লোকটা চলে গেল।

পাশের ঘরে অনুরাধার মাথাটা তখন ঘুরছে। পায়ের তলার

মাটি সরে যাচ্ছে। একটু একটু করে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা অফিস থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিল অনুরাধা।

রাত তখন দশটা।

রজনী সেন স্ট্রীটের বাড়িতে তার ঘরে ঝিম মেরে বসেছিল অনুরাধা।

ঝি বেলার মা সেদিন আবার কাজে আসেনি, সেই রান্না করে রেখে যেত, ঐ দিন রাত্রে স্থির ছিল বাইরের হোটেলে সে ও দত্ত মজুম'ার ডিনার করবে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। দত্ত মজুমদার এসে ঘরে ঢুকলেন, অনু—

ফ্যাকাশে অসহায় বোবা দৃষ্টি তুলে তাকাল অনুরাধা দত্ত মজুমদারের দিকে।

তুমি হঠাৎ অফিস থেকে আমায় না বলে চলে এলে কেন অনু? চল চল, ডিনার খেতে যাবে না?

না! তারপরই অনুরাধা বললে, তুমি—তুমি বিবাহিত?

কে বললে?

যেই বলুক কথাটা সত্যি কিনা তাই শুধু জানতে চাইছি?

না, সত্যি নয়—

সত্যি নয়? তুমি বিবাহিতা নও—তোমার স্ত্রীর নাম মুকুল নয়?

হ্যাঁ, তার নাম মুকুলই ছিল। মানে অনেক কাল আগে একজনকে বিয়ে ঠিক নয়—লাইফ কম্প্যানিয়ান হিসাবে ছিল, সেই মুকুল।

ছিল মানে?

সে বেঁচে নেই। দু বছর আগে তার মৃত্যু হয়েছে, She is dead.

আমি কথাটা বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যুক—

আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর না রাধা?

না—না—না—করি না, তুমি চলে যাও—

কেন কেলেঙ্কারী করবে, নীচের ভাড়াটেরা সব জেনে যাবে, চল, আমার পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে চল।

না, যাব না আমি।

দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ওখানেই।

যায়নি সেদিন অনুরাধা সলিল দত্ত মজুমদারের পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। কিন্তু তারপর ক'টা দিনই বা, নিজের অপমান লজ্জা ও কেলেঙ্কারীর ভয়ে অনুরাধাকে কায়কদিন পরেই আবার সলিল দত্ত মজুমদারের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে যে চিড় খেয়েছিল সেটা আর জোড়া লাগল না। ক্রমশ সেটা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছিল। একটা অজগর যেমন তার শিকারকে গ্রাস করে দত্ত মজুমদার যেন তেমনি করেই তাকে গ্রাস করেছিল। বের হয়ে আর আসতে পারেনি অনুরাধা সেই গ্রাস থেকে।

কিন্তু আজ—আজ আবার অনেক দিন পরে সরিৎকে দেখে অনুরাধার মনের মধ্যে যেন একটা ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে। সে যেন এই দুর্বিষহ বন্দী জীবন থেকে বেরুবার একটা ইঙ্গিত পেয়েছে। মনের কোথায় যেন একটা মুক্তির বাঁশী শুনতে পেয়েছে।

তার এই দু বছরের বন্দী জীবনে কতবার ভেবেছে সরিৎশেখরের কাছে সে ছুটে যায়, কিন্তু কেন যেন সাহস হয়নি।

ঐ দত্ত মজুমদার মানুষটা হয়তো তাহলে সরিৎশেখরকেও নিষ্কৃতি দেবে না, ভয়ংকর চরিত্রের ঐ মানুষটা, ওকে বিশ্বাস নেই।

অনুরাধা মনে মনে স্থির করে, আজ সে বলবে, সরিৎকে সব কথা বলবে। বলবে, বাঁচাও আমাকে সরিৎ, আমাকে বাঁচাও।

বালুর উপর বসেছিল অনুরাধা, উঠে দাঁড়াল, হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা একটা বেজে গিয়েছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, আকাশে মেঘ জমেছে, একটা কালো শান্ত ছায়া যেন আকাশে ও সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

অনুরাধা আবার হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল!

অনুরাধা যখন হোটেলের ১৬নং ঘরে এসে ঢুকল, সলিল দত্ত মজুমদার তখন একটা চেয়ারে বসে ঐ দ্বিপ্রহরে নির্জলা হুইস্কি পান করছিল।

কাল রাত্রে যে বোতলটা খুলেছিল, আজ দুপুরের আগেই সেটা প্রায় তলানীতে এসে ঠেকেছে।

অনুরাধাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সলিল দত্ত মজুমদার ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। চোখ দুটো লাল, মাথার চুল রুক্ষ!

এতক্ষণ কোথাও ছিলে? সলিল প্রশ্ন করল।

অনুরাধা কোন জবাব দিল না।

আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন হারামজাদী? কথার জবাব দে—যেন একটা বিষাক্ত কেউটে রাগে হিস্ হিস্ করে উঠল।

অনুরাধা নির্নিমেষ চেয়ে আছে ঐ লোকটার দিকে।

পুরানো নাগর দেখে পীরিত উথলে উঠেছিল, তাই না? আবার গর্জে উঠল সলিল দত্ত মজুমদার, জবাব দে।

মনে রাখবেন এটা হোটেল। পাশের ঘরে লোক আছে।

Shut up! চেঁচিয়ে উঠল সলিল দত্ত মজুমদার।

অনুরাধা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সলিল দত্ত মজুমদার চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়া, এক পা এগুবি তো কুকুরের মত গুলি করে মারব। হারামজাদী, বেশ্যা—

কি কুৎসিত দেখাচ্ছিল দত্ত মজুমদারের মুখটা, যেন একটা কালো নেকড়ে বাঘ। রক্তাক্ত চোখের চাউনি থেকে যেন কুটিল হিংস্রতা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে অনুরাধা লোকটার মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে ছিল, ঘৃণায় লজ্জায় যেন অনুরাধা ঐ মুহূর্তে পাথর হয়ে গিয়েছে।

এইটাই বোধ করি ঐ মানুষটার সত্যিকারের পরিচয়—

পাশের ১৭নং ঘরে ছিল কিরীটী। পাশের ১৬নং ঘরের দেওয়াল ভেদ করে যেন সলিল দত্ত মজুমদারের প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট তার কানে যাচ্ছিল।

আর একজনও শুনতে পাচ্ছিল—চন্দ্রকান্ত ঘাই, একটু আগে যে ১৭নং ঘরে এসে ঢুকেছে। তারও কানে যায় কথাগুলো। সে দেওয়ালে কান পেতে দাঁড়ায়।

ঐ গলাটা তার চেনা।

তাহলে এই হোটেলের ঠিক পাশের ঘরেই ঐ লোকটা এসে উঠেছে। চন্দ্রকান্ত ঘাই মনে মনে হাসে। সংবাদটা তাহলে মিথ্যা নয়। চন্দ্রকান্ত ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি

দেশলাই দিয়ে বিড়িটা ধরাল। তারপর যেন পরম নিশ্চিন্তে বিড়িটার সুখটান দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অনুরাধা বলল, আমি আজকের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাব।

কি বললি! ফিরে যাবি?

ভদ্রভাবে কথা বলুন, অনুরাধা বলল। নতুবা এখুনি আমি নীচে গিয়ে লোক জড়ো করব—থানায় যাব—

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন হঠাৎ গুটিয়ে যায়, থানার নাম শুনে সেও যেন চুপসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বার দুই কেবল হেঁচকি তুলল উক্ উক্ শব্দে।

আমি নীচে গিয়ে লোক জড়ো করে, তাদের বলব, আপনি আমাকে জোর করে এখানে ধরে রেখেছেন—

তুমি আমার স্ত্রী—মিনমিনে গলায় সলিল দত্ত মজুমদার বললে।

না, কোন দিনই আপনার স্ত্রী ছিলাম না, আজো নই।

কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়েছে—

সে বিয়ে আইনত অসিদ্ধ, আদালতে গেলেই তা প্রমাণ হবে। অনুরাধা যেন ফুঁসছিল। আরো সে কিছু বলত কিন্তু বন্ধ দরজার গায়ে করাঘাত পড়ল।

দত্তবাবু, দত্তবাবু—

কে?

আমি চাঁদু, হোটেলের বেয়ারা।

সলিল উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল, কি চাই?

ম্যানেজারবাবু বলে পাঠালেন, আপনার ট্যাক্সি ঠিক হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করছে আপনি কখন বেরুবেন।

চল, আমি নীচে যাচ্ছি—

॥ ছয় ॥

অনুরাধা খোলা জানালাটার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল।

কালো মেঘ ক্রমশ আকাশে স্তূপীকৃত ও ঘনীভূত হচ্ছে, মনে হয়

এবারে হয়তো বৃষ্টি নামবে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাবও পাওয়া যাচ্ছিল সমুদ্রের বাতাসে।

একটা বিশ্রী তিক্ততায় অনুরাধার মনটা যেন ভরে গিয়েছে। একটা কথাই তার কেবলই মনে হচ্ছিল, এখানে এই মানুষটার সঙ্গে এক মুহূর্ত আর নয়, এখুনি, এই মুহূর্তে চলে যেতে পারলে যেন ভালো হয়।

সলিল দত্ত মজুমদার এসে ঘরে ঢুকল। অনু—

গলায় স্বর তার সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে, এ যেন সে মানুষ নয়। সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। সলিল আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো অনুরাধার—I am really sorry অনু, আমাকে ক্ষমা কর।

অনুরাধা চেয়ে আছেন নিঃশব্দে তখনো জানালা পথে বাইরের দিকে। একেবারে যেন বোবা অনুরাধা। ফিরেও তাকাল না সলিলের দিকে।

হঠাৎ যেন কেমন রাগ চড়ে গেল অনু, আমাকে ক্ষমা কর।

অনুরাধা পূর্ববৎ নীরব। জানালা পথে নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে।

আমাকে ক্ষমা কর অনুরাধা, ক্ষমা চাইছি, তোমায় কথা দিচ্ছি আর এমনটি কখনো হবে না। তাকাও, please আমার দিকে তাকাও।

অনুরাধা তথাপি ফিরে তাকায় না।

তুমি কেন ঐ লোকটার ঘরে গেলে, ওর কথা বলতে গেলে, তাইতেই তো হঠাৎ রাগ চড়ে গেল আমার, সলিল দত্ত মজুমদার আবার বললে।

অনুরাধা এতক্ষণে ফিরে তাকাল, বলল, আমি আজকের এক্সপ্রেসেই ফিরে যেতে চাই—

আমাদের রিটার্ণ টিকিট তো কালকের, আজ ফিরব কেমন করে ? তাছাড়া আমার অফিসের একটা জরুরী কাজ আছে, আমি ভুবনেশ্বরে যাচ্ছি ! কাল দশটার মধ্যেই ফিরে আসছি, কালই যাব আমরা।

অনুরাধা কোন কথা বলল না।

আমি বেরুচ্ছি, নীচে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, আর আমার সঙ্গে যদি তুমি ভুবনেশ্বরে যেতে চাও তো—

না। আমি যাব না।

অনুরাধা তখন ভাবছে অন্তত একটা রাত তাকে ঐ জানোয়ারটার পাশে শুতে হবে না, ওর পশুকামনাকে চরিতার্থ করতে হবে না তাকে।

তাহলে থাক তুমি, আমি চললাম। সলিল দত্ত মজুমদার বের হয়ে গেল।

জানালা পথে একটু পরেই অনুরাধা দেখতে পেল ট্যাক্সিটা হোটেলের সামনে থেকে চলে গেল সলিল দত্ত মজুমদারকে নিয়ে।

এতক্ষণে যেন বুক ভরে একটা হালকা নিঃশ্বাস নিল অনুরাধা।

১৮নং ঘরে সরিৎশেখর নিঃশব্দে জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশে ঘন কালো মেঘ জমেছে, কালো মেঘের ছায়া পড়েছে সমুদ্রের বুকে।

এবারে বৃষ্টি নামবে—সমস্ত আয়োজন তার শেষ। বিদ্যুৎ চমকাল।

এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া সনসন করে বয়ে এলো ঘরের মধ্যে। মনে পড়ে গেল আবার সরিৎশেখরের অনুরাধার সেই কথাটা—আজ ২৯শে জুলাই।

২৯শে জুলাই তার পরিচয় অনুরাধার সঙ্গে, দুজনে দুজনকে জেনেছিল প্রথম।

মনে পড়ে সরিৎশেখরের—সেদিনের সেই ২৯শে জুলাই ছিল মঙ্গলবার। সরিতের এক বন্ধু হিমাংশু, তার গণনার বাতিক ছিল, ওকে একদিন হিমাংশু বলেছিল মঙ্গলবারটা সব সময় এড়িয়ে যাবি সরিৎ, মঙ্গলে তোর জন্ম, সেদিন ছিল রাহু আর শনি মুখোমুখি, কোন ভালো কাজ ঐ মঙ্গলবারে করবি না, তোর পক্ষে সবচাইতে ভালো রবিবারটা।

হেসেছিল সরিৎশেখর। বলেছিল, বোগাস!

আজ হঠাৎ মনে পড়ছে সেদিনের সেই ২৯শে জুলাই ছিল মঙ্গলবার।

একটা আবছা পর্দা দুলতে দুলতে সাগরের মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে আসছে। বৃষ্টি নেমেছে, বৃষ্টির ধারা ছুটে আসছে। একটু আগে সরিৎ দেখেছে সলিল দত্ত মজুমদার একটা গাড়িতে চেপে বের হয়ে গেল।

অনুরাধা ভাবছিল, এই শেষ। সলিল দত্ত মজুমদারের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছাড়বে কি সলিল দত্ত তাকে? যেতে কি দেবে তাকে?

অনুরাধা জানে দেবে না সলিল, অত সহজে সলিল তাকে মুক্তি দেবে না। সে তার হিংস্র নিষ্ঠুর থাবা দিয়ে অনুরাধাকে তার কাছে রাখবার চেষ্টা করবে।

ঐ মানুষটার সঙ্গে তার রাতের পর রাতের স্মৃতি—সেই কামনাসিক্ত হিংস্র একটা জানোয়ারের মতো রাতের পর রাত তার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। যন্ত্রণায় সে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠেছে। একটির পর একটি রাত গিয়েছে আর মনে মনে মুক্তির জন্য হাঁস ফাঁস করেছে সে।

একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ অনুরাধার। কটক স্টেশন থেকে একটা ছুরি কিনেছে সে। সুদৃশ্য হরিণের সিংয়ের বাঁট আর ইস্পাতের ফলাটা চক চক করছে, স্যুটকেসেই আছে ছুরিটি।

স্যুটকেসটা খুলে অনুরাধা ছুরিটা বের করল। ছুরি হাতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। সলিল যদি আবার তার কাছে আসতে চেষ্টা করে, জোর-জার করে, এই ছুরিটা সমূলে সে বসিয়ে দেবে তার বুকে না হয় পেটে।

টক্ টক্ টক্। দরজার কবাটে মৃদু আঘাত একবার দুবার তিনবার।

কে? অনুরাধা প্রশ্ন করল।

অনুরাধা—আমি সরিৎ—

অনুরাধা দরজাটা খুলে দিল। হু হু করে এক ঝলক বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ছুটে এলো। ঘরের মধ্যে ঝাপসা ঝাপসা আলো।

অনুরাধা—

এই যে আমি, এসো—অনুরাধা সরিতের দিকে এগিয়ে গেল।

এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দত্ত মজুমদার কোথায় গেলেন?

ভুবনেশ্বরে—

সেখানে কি?

বলে গেল তার অফিসের জরুরী কাজ আছে। মরুক গে সে, জানো সরিৎ, একটু আগে তোমার কথাই ভাবছিলাম।

আমার কথা?

হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথাটা। সরিৎ, তুমি কি সত্যি সত্যিই আমাকে ভুলে গিয়েছ? মন থেকে তোমার একেবারে মুছে ফেলেছ?

তাইতো স্বাভাবিক অনুরাধা।

স্বাভাবিক, তাই না। আমি তো তোমাকে কই আজও ভুলতে পারিনি!

ঘরের মধ্যে ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকারটা আরো ঘন হয়েছে। বাইরের অন্ধকার যেন ঘরের মধ্যে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

শুনবে আমার সব কথা? অনুরাধা বললে।

শুনে কি লাভ—

তবু বোধ হয় সব কথা তোমার জানা দরকার সরিৎ—

সরিৎশেখর কোন জবাব দিল না!

অনুরাধা বলে গেল তার কথা। একটু একটু করে থেমে থেমে।

সরিৎশেখর একেবারে নির্বাক বোবা।

আমাকে—আমাকে তুমি মুক্তি দিতে পার না?

কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি সলিল দত্ত মজুমদারের বিবাহিতা স্ত্রী।

ও বিবাহ তো মিথ্যা, একটা প্রতারণা।

তাই যদি মনে কর তো মুক্তি তো তোমার নিজের ইচ্ছাতে।

না, তোমার হাতে সরিৎ। তোমার হাতে। আমাকে তুমি নিয়ে চল সরিৎ দূরে, অনেক দূরে কোথাও!

আজ আর তা হয় না অনু!

আবার তোমার সেই ভয়—সেদিন যে ভয় তোমার আমাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, আজও সেই ভয়? কেন—কেন সেদিন তুমি জোর করে আমাকে ধরে রাখলে না? কেন বলতে পারলে না, না, তোমাকে আমি যেতে দোব না। তবে তো এই আকণ্ঠ গ্লানির মধ্যে আমাকে ডুবে যেতে হত না।—

অনুরাধার গলার স্বরটা যেন কেমন হয়ে এলো। সরিতের মনে হল অনুরাধা যেন কাঁদছে।

হঠাৎ কিছু বুঝে উঠবার আগেই অনুরাধা ছুটে এসে সরিৎশেখরের বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, দু'হাতে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরল।

ঝড় বৃষ্টি থামেনি। থেকে থেকে সোনালী একটা চাবুকের মতো অন্ধকার আকাশটা চিরে দিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, প্রবল ধারায় বৃষ্টি, সোঁ। সোঁ হাওয়ার গর্জন।

রাত কত হল কে জানে।

ইতিমধ্যে কিরীটী তার ঘরে বসেই কিছু খেয়ে নিয়েছে।

হাতঘড়িটার দিকে তাকালো কিরীটী। রাত দশটা পনেরো।

বোঝবার উপায় নেই এত রাত হয়ে গিয়েছে, জানালার

কপাটগুলো থর থর করে কাঁপছে হাওয়ার ঝাপটায়। কি খেয়াল হল কিরীটীর, সমুদ্রের দিকের জানালাটা একবার খুলল। একটা বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো আলোর চমক।

আর সেই ক্ষণিকের আলোয় কিরীটীর চোখে পড়ল একটা মনুষ্যমূর্তি হোটেলে প্রবেশ করল। এই রাত্রে—এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে হোটেল থেকে কে বাইরে গিয়েছিল? না কি কেউ এলো?

কিরীটী তাড়াতাড়ি জানালার কপাট চেপে এঁটে দিল ছিটকিনিটা।

॥ সাত ॥

সারাটা রাত্রি বর্ষণ ও ঝড়ের বিরাম ছিল না। শেষ রাত্রির দিকে ঝড় ও বৃষ্টির প্রকোপ কমে এলো ধীরে ধীরে। কিন্তু বাতাস তখনো বেগে বইছে।

শেষ রাতের দিকে বোধ করি সামান্য সময়ের জন্য চোখে একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল কিরীটীর, তন্দ্রাটা ভেঙে গেল দরজায় করাঘাত শুনে—

রায়মশাই, রায়মশাই দরজাটা খুলুন।

হোটেলের মালিক ভবেশ অধিকারীর গলা, কিরীটী উঠে দরজাটা খুলতেই যেন একটা দমকা হাওয়ার মতো ভবেশ অধিকারী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

কি ব্যাপার ভবেশবাবু?

খুন।

খুন! কিরীটীর বিস্ময় প্রশ্ন।

হ্যাঁ খুন। ১৬নং ঘরে—

মানে আমার এই পাশের ঘরে? কিরীটী পুনরায় প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ—

কে খুন হয়েছে?

অনুরাধা দেবী।

সে কি!

চলুন।

মেঝেতে পড়ে আছেন ভদ্রমহিলা, গলাটা দু' ফাঁক করে কাটা।

কিরীটী কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আপনি কখন দেখলেন ?

সবে ঘুম ভেঙে উঠে—ভবেশ অধিকারী বললেন, ঘরের বাইরে বের হয়েছি চাকর-বাকরকে জাগাব বলে, হঠাৎ ওপরের দিকে তাকাতে নজর পড়ল ১৬নং ঘরের দরজা খোলা, দরজার পাল্লা দুটো হাওয়ায় পড়ছে আর খুলছে ! তাড়াতাড়ি ওপরে এলাম, ভদ্রমহিলার স্বামী নেই, কাল কাজে ভুবনেশ্বর গিয়েছেন, উনি একা ছিলেন তাই আমাকে বলে গিয়েছিলেন একটু নজর রাখতে ওর ওপরে। এখন কি হবে রায়মশাই—

ওর স্বামী রাত্রে ফেরেননি ?

না, আজ দুপুরে ফিরবার কথা, আজকের এক্সপ্রেসেই চলে যাবেন ওরা।

ভবেশ অধিকারী আবার বলতে লাগলেন, এবারে আর হোটেলটা টিকিয়ে রাখতে পারব না। হোটেল এবার উঠেই যাবে। তিন বছর আগে এক ভদ্রলোক গলায় ক্ষুর চালিয়ে ১৭নং মানে এই ঘরে আত্মহত্যা করেছিলেন, সেই ঘটনার পর হোটেল প্রায় উঠেই যেতে বসেছিল, এবার হয়েছে খুন—

দুর্ঘটনার জন্য তো আর আপনি দায়ী নন ভবেশবাবু, কিরীটী বলল।

সে কথা লোক কি বুঝবে। হোটেলের নামে দুর্নাম রটে যাবে। এতদিনের ব্যবসা—সর্বনাশ হয়ে গেল আমার রায়মশাই।

চলুন একবার পাশের ঘরে—কিরীটী বলল।

আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি না থামলেও হাওয়া বইছে এলোমেলো। সমুদ্র আথালি পাথালি করছে, বড় বড় ঢেউ তীরের উপর এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। হোটেলের বাসিন্দারা তখনও কেউ ওঠেনি।

পাশের ঘরে অর্থাৎ ১৬নং ঘরে এসে ঢুকল কিরীটী খোলা দরজা পথে। হাওয়ার দাপটে দরজার পাল্লা দুটো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ঘরের মধ্যে আলোটা জ্বলছে। সেই আলোতেই কিরীটীর ভয়াবহ সেই দৃশ্যটা নজরে পড়ল।

ঘরের মেঝেতে জমাট বাঁধা রক্তের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে অনুরাধার দেহটা, ঘাড়ে একটা চার ইঞ্চি পরিমাণ গভীর ক্ষত, হাঁ হয়ে আছে। বুঝতে কষ্ট হয় না কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আততায়ী

পশ্চাৎ দিক থেকে মেয়েটিকে মোক্ষম আঘাত হেনেছে। এবং সে আঘাতের ফলেই মৃত্যু ঘটেছে।

পরনের শাড়িটা অগছালো। ব্লাউজের পিঠের দিকে ছেঁড়া—শুভ্র পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত অনেকটা। বাম হাতটা প্রসারিত, ডান হাতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি, মুঠো করে ধরা।

ঘরের চারপাশে তাকাল কিরীটী! একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, শয্যাটা এলোমেলো, চাদরটা নীচের দিকে ঝুলছে। ঘরের সর্বত্র একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন।

কি নাম ভদ্রমহিলার! কিরীটী প্রশ্ন করল।

অনুরাধা দত্ত মজুমদার, সলিল দত্ত মজুমদারের স্ত্রী।

কবে এসেছিলেন এখানে?

চারদিন আগে। কথা ছিল দিন দশেক থাকবেন, কিন্তু হঠাৎ মত পাল্টান দত্ত সাহেব। আজই যাবার কথা ছিল, আমিই টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

আপনি বলছেন ভদ্রমহিলা দত্ত মজুমদারের স্ত্রী, কিন্তু মাথায় সিঁদুর দেখছি না তো। হাতেও শাঁখা বা লোহা দেখছি না। দু'গাছা করে মাত্র সোনার চুড়ি।

হয়তো পরেন না। আজকাল তো অনেকই ও সব ব্যবহার করেন না।

তা বটে, তা আপনি ঠিক জানেন তো ভবেশবাবু, ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন?

খাতায় তো তাই লিখেছেন।

১৫নং ঘরে কেউ আছেন?

কালই এসেছেন এক ভদ্রলোক, নাম চন্দ্রকান্ত ঘাই—

আমি তো কাল রাত্রে পাশের ঘরেই ছিলাম, কোন চেঁচামেচি বা গোলমালও আমার কানে আসেনি। কিরীটী বলল।

যা ঝড় জল গিয়েছে রাত্রে, তা শুনবেন কি!

তা ঠিক। ভালো কথা, এখানকার থানা অফিসার কে? চেনেন তাকে?

খুব চিনি। হেমন্ত সাহু। বছরখানেক হল এখানে এসেছেন।

ঠিক আছে, থানায় একটা খবর পাঠান।

ভবেশ অধিকারী যেন একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই ঘর থেকে বের হয়ে

যাবার জন্য পা বাড়াতেই কিরীটী বললে, এই ঘরটায় একটা তালা দিয়ে দিন।

আরো মিনিট কুড়ি পরে।

নীচের তলায় অফিসে কিরীটী বসে ছিল। সামনে এক কাপ চা।

ভবেশ অধিকারীও সামনে এক কাপ চা নিয়ে ঝিম মেরে চেয়ারটার ওপরে বসে। তার মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় বইছিল। বোর্ডাররা এখনো কেউ ব্যাপারটা জানে না। কিন্তু আর কতক্ষণ, সাহু এসে পড়বেন হোটেলে, সঙ্গে সঙ্গে জানাজানি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। তারপর যে কি ঘটবে ভাবতেও ভবেশ অধিকারীর হাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

সরিৎশেখর এসে অফিসে ঢুকল।

এই যে ম্যানেজারবাবু, সরিৎ বললে, আপনি এখানেই আছেন, আমার বিলটা তৈরি রাখবেন, আমি আজই চলে যাব।

চলে যাবেন! কেমন যেন বোকার মতোই প্রশ্ন করলেন ভবেশ অধিকারী।

এমন বিশ্রী ওয়েদার শুরু হল, এখানে থাকার আর কোন মানে হয় না। এক্সপ্রেসে তো রিজার্ভেশন পাব না, ভাবছি ভুবনেশ্বর থেকে প্লেনেই যাব।

এই দুর্যোগে প্লেন কি ছাড়বে? কিরীটী বলল।

ছাড়বে না? কিরীটীর কথায় ওর মুখের দিকে তাকাল সরিৎশেখর।

মনে হয়, ছাড়বে না। দেখুন, আবার বৃষ্টি শুরু হল, বলল কিরীটী।

তা আর কি করা যাবে। ভুবনেশ্বরেই না হয় একটা দিন থাকব। হোটেল তো সেখানে আছেই, আপনি বিলটা রেডি করে বরং আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন।

কথাগুলো বলে সরিৎশেখর আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। কিরীটী সরিতের গমন পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কেমন যেন একটা ব্যস্ততা, একটা অস্থিরতা ভদ্রলোকের কথাবার্তায়, হাবে ভাবে। কেন জানি না কিরীটীর মনে হল, কেবল কি এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যই ভদ্রলোক চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন?

ভবেশবাবু—ভদ্রলোক দোতলায় কোন্ ঘরে থাকেন?

১৮নং ঘরে, আপনার ঠিক পাশের ঘরে। দেখলেন তো রায়মশাই, আপনাকে বলেছিলাম না, আমার সর্বনাশ শুরু হল, সবাই চলে যাবে—

ভদ্রলোক তো এখনো ব্যাপারটা জানেন না। কিরীটী বললে।

জানেন না কি, নিশ্চয়ই জেনেছেন, দোতালারই একটা ঘরে যখন খুন হয়েছে—

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলেন, আচ্ছা ভবেশবাবু, হোটেলের তো সবাই জাগছে, কিন্তু ১৫নং ঘরের ভদ্রলোকটি তো এখনো জাগেননি, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছেন নাকি?

ভবেশ অধিকারী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। হোটেলের সামনে সাইকেল রিক্শা থেকে থানার দারোগা হেমন্ত সাহুকে নামতে দেখা গেল।

ঐ যে দারোগাবাবু—শুকনো গলায় বললেন ভবেশ অধিকারী।

হেমন্ত সাহু রিক্শা থেকে নেমে একটা কোলাব্যাঙের মতো থপ থপ করে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন।

মোটা বেঁটে থলথলে চেহারা, ঠোঁটের উপরে ভারী একজোড়া গোঁফ। চোখ দুটো ছোট, বর্তুলাকার মুখ বসন্তের দাগে ভর্তি, পরনের ইউনিফর্ম টাইট হয়ে গায়ে বসেছে।

কি ব্যাপার ভবেশবাবু কে খুন হল?

ভবেশ অধিকারীর গলার স্বর বসে গিয়েছে। তিনি বললেন, ১৬নং ঘর।

১৬নং ঘরে খুন হয়েছে—

না, ঐ ঘরে এক ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন।

ঘরে আর কেউ ছিল না?

না, ওর স্বামী গতকাল জরুরী কাজে ভুবনেশ্বর গিয়েছেন, এখনো ফেরেননি, বললে কিরীটীই এবারে।

আপনি? কথাটা বলে সাহু তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

জবাব দিলেন ভবেশ অধিকারী, উনি স্যার, কিরীটী রায়—নামকরা একজন সত্যসন্ধানী, মানে ডিটেকটিভ।

হুঁ, তা উনি এখানে কেন?

আমি এই হোটেলেই গতকাল এসে উঠেছি।

হুঁ ! চলুন, ডেড বডি কোথায় ? ১৬নং ঘরে বললেন না। কাল রাতে যখন অত ঝড় বৃষ্টি চলছিল তখনই বুঝেছিলাম একটা অঘটন কিছু ঘটবে। কে জানত একেবারে যাকে বলে আমার নাকের ডগাতেই, আপনার হোটেলেই সেটা ঘটে বসে আছে। আর শালা এস পি-ও কাল থেকে থানায় এসে বসে আছে, তা ১৬নং ঘরটি কোথায় ?

দোতলায়, ভবেশ বললেন।

চলুন, যত সব ঝুট ঝামেলা, খুড়দা রোডে বেশ ছিলাম, ছিঁচকে চোরের কিছুটা উৎপাত ছিল বটে কিন্তু এমন খুন জখম ছিল না।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসছিল নিঃশব্দে। সেদিকে নজর পড়ায় সাহু বললেন, হাসছেন যে, হাসির কথাটা কি হল জানতে পারি কি ?

আপনাদের এস পি মিঃ নির্মল বড়ুয়া না ?

চকিতে ফিরে তাকালেন সাহু—হ্যাঁ, তার নাম জানলেন কি করে ?

তার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, থানায় ফিরে গিয়ে আমার নামটা বললেই তিনি চিনতে পারবেন।

কি যেন আপনি করেন ভবেশবাবু বলছিলেন ?

তিন বছর আগে এই হোটেলেই ঐ দোতলায় ১৭নং ঘরে একটা খুন হয়েছিল, সেই ব্যাপারেই—

খুন হয়েছিল তিন বছর আগে এই হোটেলে ?

হ্যাঁ, ওকেই মানে ভবেশবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন না মিঃ সাহু। তাই এখানে আসার আগে মিঃ বড়ুয়াকে ট্রাংকলে আমি কটকে আসার কথাটা জানিয়েছিলাম, তার এবং আপনার সাহায্যের হয়তো আমার প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আমায় বলেছিলেন, আপনি একজন খুব কমপিটেণ্ট অফিসার—

তা এ সব কথা আমাকে আগে বলবেন তো।

সাহুর ব্যবহার তো বটেই গলার স্বর কথাবার্তাও যেন পাল্টে গিয়েছে।

ভেবেছিলাম আজ সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব থানায়—

হ্যাঁ হ্যাঁ, গত রাত্রেই সাহেব আমাকে বলছিলেন বটে—কিন্তু আপনি যে ঘটনার কথা বলছেন সে সব গত রাত্রেই থানার পুরাতন ডাইরি উল্টে-পাল্টে আমি দেখছিলাম, সেটা তো একটা সুইসাইড কেস।

না। হোমিসাইড—খুন—ডায়াবলিকাল মার্ডার, আর এখানে এই হোটেলে গত রাত্রে ১৬নং ঘরে যা ঘটেছে সেটাও তাই, মার্ডার—নৃশংস খুন।

আপনি ডেড বডি দেখেছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ। পিছন থেকে আকস্মিকভাবে কোন ধারালো অস্ত্র চালিয়ে এমন আঘাত করা হয়েছে যে তাতেই ভদ্রমহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে আমার ধারণা।

অস্ত্র কি—কাটারী?

না, ধান কাটা হয় যে কাস্তের সাহায্যে, আমার অনুমান সেই ধরনেরই কোন অস্ত্র আততায়ী ব্যবহার করেছিল। তারপর মৃতের হাতে একটা ধারালো ছুরি গুঁজে দিয়ে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বুঝলেন কি করে?

ওটা উণ্ডের পজিসন ও ডেপথ্ দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন মিঃ সাহু।

কিন্তু ভদ্রমহিলাকে কে খুন করল?

হত্যাকারীর মোটিভ বা উদ্দেশ্য একটা কিছু ছিল বৈকি। বিনা মোটিভে তো খুন হয় না। কিরীটী বললে।

আসুন না, চলুন উপরে আমার সঙ্গে। সাহু অনুরোধ জানালেন।

বেশ। চলুন।

সেই ১৬নং ঘর, সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ। চারপাশে মেঝেতে জমাট বাঁধা কালো চাপ চাপ রক্ত। সাহু সেই দৃশ্যটা দেখে যেন থমকে গেলেন। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, উঃ, কি ভয়ানক!

বাইরে তখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মেঘে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে গিয়েছে।

মেয়েটার বয়স কত হবে বলুন তো মিঃ রায়। সাহুর প্রশ্ন।

বছর ২৮/২৯ তো হবেই।

বলছিলেন না ভবেশবাবু, মেয়েটি বিবাহিতা, কিন্তু মাথায় বা কপালেও সিঁদুর দেখছি না। বউ-টউ সাজিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তি করতে—

না না। ওরা স্বামী-স্ত্রীই, প্রফেসারও তাই বলছিলেন গতকাল

সকালে। প্রোফেসারও ভদ্রমহিলাকে চিনতেন। ভবেশ অধিকারী প্রতিবাদ জানালেন।

অধ্যাপক? কে অধ্যাপক?

অধ্যাপক সরিৎশেখর সেন, ঐ তো দোতলাতে ১৮নং ঘরে উঠেছেন।

আমার বাম দিককার ঘরে, কিরীটী বললেন, আমি ১৭নং ঘরে আছি।

সাহু বললেন, এ ঘরের ডানদিকের ১৫নং ঘরে কেউ নেই ভবেশবাবু?

আছেন। গতকালই এসেছেন। চন্দ্রকান্ত ঘাই নামে এক ভদ্রলোক।

মিঃ রায়, আপনি তো বললেন আপনি ১৭নং ঘরে আছেন। কাল রাত্রে আপনি কিছু শোনেননি?

না। কাল—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, ঘরের বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। সকলেই দরজার দিকে তাকাল। ঘরে এসে ঢুকল সলিল দত্ত মজুমদার।

ঘরে পা রেখেই ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার, আমার ঘরে ভিড় কেন ভবেশবাবু—

কারো মুখে কোন কথা নেই।

আপনিই মিঃ দত্ত মজুমদার? প্রশ্ন করলেন সাহুই সর্বপ্রথম।

হ্যাঁ—

উনি আপনার স্ত্রী? ঐ যে মেঝেয় পড়ে—

মেঝের দিকে তাকিয়ে একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল সলিল দত্ত মজুমদার, how horrible! এ কি! অনুরাধাকে এমন করে খুন করল কে? না কি অভিমান করে অনুরাধা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করল?

আত্মহত্যা নয় মিঃ দত্ত মজুমদার, its a simple case of murder—diabolical murder! কিরীটী ধীরে ধীরে দত্ত মজুমদারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে গেল।

কিন্তু কে—কে হত্যা করল? কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সলিল দত্ত মজুমদার।

সাহু এবারে বললেন, উনি আপনার স্ত্রী ?

স্ত্রী। না মানে ঠিক—

স্ত্রী নন ! পুনরায় সাহুর প্রশ্ন।

মানে ঠিক বিবাহিত না হলেও······স্ত্রীর মতো ছিল, we used to live together।

সাহু অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা। বললেন, মানে উনি তাহলে আপনার রক্ষিতা ছিলেন বলুন।

হ্যাঁ, মানে—স্ত্রীর মতোই—

ইতিমধ্যে অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখ ১৬ নং ঘরের দরজার সামনে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল।

সলিল দত্ত মজুমদার বললেন, এখন আমি কি করি—অসহায় গলার স্বর।

সাহু বললেন, ইনভেস্টিগেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এ হোটেল ছেড়ে কোথাও এক পা বাইরে যাবেন না।

কেন ?

কারণ মৃত্যুর সঙ্গী ছিলেন আপনি—একমাত্র কাছের মানুষ এবং আপনারা দুজন স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে এই হোটেলে এসে উঠেছিলেন।

না না, আমি একাই নয়, সলিল দত্ত মজুমদার বললেন, আরো একজন এই হোটেলে আছেন ১৮নং ঘরে—অনুরাধার পূর্বতন প্রেমিক।

কার কথা বলছেন ?

প্রফেসার সরিৎশেখর সেন। কাল তো সকালের দিকে অনেকক্ষণ ১৮নং ঘরে দুজনে ঢলাঢলি করছিল। আর কাল তো সারাটা দুপুর ও রাত্রের দিকে আমি হোটেলেই ছিলাম না। ওরাই ছিল—

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল সলিল দত্ত মজুমদারকে, হঠাৎ এবার বলল, আপনার সারা জুতো ও প্যাণ্টের নীচে অত বালি এলো কোথা থেকে ?

সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে এসেছি তো তাই বোধ করি।

আপনি তো গাড়িতে ভুবনেশ্বর গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন কি সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে ?

না না, তা কেন। গাড়িতেই ফিরেছি, তবে হোটেলের কাছাকাছি এসে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে এলাম।

কাল কখন ভুবনেশ্বর পৌঁছেছিলেন—কখন সেখান থেকে রওনা হয়েছেন ?

ভোর বেলা রওনা হয়েছি—

এখানে আসতে কতক্ষণ সময় লাগল ?

তা ঘণ্টা দুই প্রায়। কিন্তু এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? আর আপনি বা কে ?

সাহুই জবাব দিলেন সলিল দত্ত মজুমদারের কথাটার, বললেন, উনি আমাদের লোক। যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দিন ওকে।

কিরীটী বললে, ওকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই মিঃ সাহু। আপনার যদি কিছু জানবার থাকে—

না, আমি আর কি জিজ্ঞাসা করব—হেমন্ত সাহু বললেন।

ভবেশবাবু, ঘরের দরজায় তো দেখছি গডরেজের তালা লাগানো—কিরীটী বলল।

হ্যাঁ, এই হোটেলের সব দরজাতেই গডরেজের তালা লাগানো—ভবেশ বললেন।

দুটো করে নিশ্চয়ই চাবি আছে প্রত্যেক তালার ?

হ্যাঁ। একটা অফিসে থাকে অন্যটা বোর্ডারকে দেওয়া হয়।

একটা চাবি তো দেখছি তালায় লাগানো, অন্যটা—

নীচে অফিসে আছে, কি বোর্ডে টাঙানো, আনব—

নিয়ে আসুন। আর ঐ সঙ্গে সরিৎবাবুকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যান।

ভবেশ অধিকারী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী আবার সলিল দত্ত মজুমদারের দিকে তাকাল—মিঃ দত্ত মজুমদার, আপনি অনুরাধা দেবীর প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন ?

মেয়েমানুষকে কেউ পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন কি ? মেয়েমানুষ জাতটাই--

অবিশ্বাসিনী হয়—তাই কি আপনার ধারণা ?

তাই। নচেৎ দেখুন না, হঠাৎ পুরোনো প্রেমিককে দেখেই অনুরাধার পূর্ব স্মৃতি জেগে উঠল—

প্রফেসারকে কি আপনি সন্দেহ করেন ?

ঠিক ঐ মুহূর্তে প্রথমে ভবেশ অধিকারী ও তার পশ্চাতে সরিৎশেখর

ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরে পা দিয়েই সরিৎশেখর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, এ কি! অনুরাধা—এভাবে ওকে কে খুন করলে! উঃ কি ভয়ানক!

আপনি তো চেনেন সরিৎবাবু, ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল—

হ্যাঁ এক সময় ছিল ঠিকই, পরে অনুরাধা মিঃ দত্ত মজুমদারকে বিবাহ করেছিল।

আপনি সে কথা কার কাছে শুনলেন—অনুরাধা দেবী বলেছিলেন নাকি?

না, সলিল দত্ত মজুমদারই বলেছিলেন কাল। শুধান না ওকে—

কিন্তু ওদের বিয়েতো হয়নি। অনুরাধা দেবী ওর কিপিংয়েছিলেন—

এখন মনে পড়ছে বটে, অনুরাধা ঐ রকম কিছু একটা গতকাল আমাকে বলেছিল। এবং এও বলেছিল ওর স্ত্রী আছেন—

কি মিঃ দত্ত মজুমদার, কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ ছিল, বাট সি ইজ ডেড। অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছে মনে হয়।

কথাটা ঠিক বুঝলাম না—কিরীটী বলল।

মানে অনেক বছর সে নিরুদ্দিষ্টা—হঠাৎ প্রায় চার বছর আগে আমাকে ছেড়ে সে চলে যায়, তারপর থেকে তার অনেক সন্ধান করেছি আমি কিন্তু কোন সন্ধান তার পাইনি।

আচ্ছা। তাকে আপনি কবে বিবাহ করেছিলেন?

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে চাকরিতে ঢোকার পর।

ঐ সময় সরিৎশেখর বললে, ওর পূর্বতন স্ত্রী, যাকে উনি লণ্ডন থেকে ফিরে এসে বিবাহ করেছিলেন বলছেন, সেই মহিলা অর্থাৎ মুকুল রায়কে উনি আদপে বিবাহই করেননি। উনি মিথ্যা বলছেন।

চকিতে সলিল দত্ত মজুমদার সরিৎশেখরের মুখের দিকে তাকাল এবং বলল,নিশ্চয় আপনার প্রেমিকা অনুরাধা আপনাকে বলেছেকথাটা?

যেই বলে থাকুক, কথাটা সত্যি কিনা?

না, সত্য নয়।

জীমূতবাহন রায়কে আপনি চেনেন—না। তাকেও চেনেন না? সরিৎশেখর আবার প্রশ্ন করেন।

কে জীমূতবাহন রায়?

মুকুল রায়ের দাদা, এককালে যার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

জীমূতবাহন বলেও কাউকে আমি চিনি না।

অথচ ঐ জীমূতবাহন—সরিৎশেখর বললে, একদিন ওর অফিসে এসে ওকে threaten করে গিয়েছিলেন—অনুরাধাই কথাটা আমাকে কাল বলেছিল।

সি ওয়াজ এ র‍্যাম্প, স্বৈরিণী। চাপা ক্রুদ্ধ স্বরে সলিল দত্ত মজুমদার বললে।

কিরীটী ওদের তর্ক বিতর্ক শুনছিল, এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। এবার বললে, ডঃ সেন, আপনিও পুলিসের এনকোয়ারী পর্ব সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই হোটেল ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

কিন্তু আমি যে আজই চলে যাব। সরিৎশেখর বললে।

সাহু বললেন, আপনি যেতে পারবেন না।

কেন, আমাকে কি হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছেন? সরিৎশেখর বললে।

কিরীটী বললে ঘটনা পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে কেউই আপনারা সম্ভাব্য সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন না। আপনি ও মিঃ দত্ত মজুমদার তো বটেই, ১৫নং ঘরে যিনি আছেন তিনিও না।

ভবেশবাবু বললেন, হয়ে গেল। আমার হোটেলই এবার উঠে গেল।

কিরীটী বললে, আপনি এ ঘরের ডুপলিকেট চাবিটা এনেছেন ভবেশবাবু?

না। একটা ছোট্ট ঢোক গিলে হতাশার ভঙ্গীতে ভবেশ অধিকারী বললেন, চাবিটা কি-বোর্ডে নেই রায়মশাই।

নেই মানে কি?

খুঁজে পেলাম না। ভবেশ শুকনো গলায় বললেন, চাবিটা কাল সকালেও কি-বোর্ডে ছিল কিন্তু দেখতে পেলাম না।

তবে চাবিটা গেল কোথায়? চাকর বাকরদের জিজ্ঞাসা করেছেন?

না।

কিরীটী বললে, মিঃ সাহু, চলুন পাশের ঘরের ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলা যাক। ডঃ সেন, আপনি আপনার ঘরে যান।

প্রথমে সাহু ও তার পশ্চাতে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সরিৎশেখর ও সলিল দত্ত মজুমদারও পিছনে পিছনে এলো, সকলের পশ্চাতে ভবেশ অধিকারী। বাইরে আকাশ তখনো মেঘে মেঘে কালো।

থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তবে হাওয়াটা কিছুটা স্তিমিত। সূর্যের মুখ মেঘের আড়ালে চাপা পড়ে আছে।

॥ আট ॥

১৫নং ঘরের দরজা বন্ধ তখনো।

সাহুই বন্ধ দরজার গায়ে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে চেঁচালেন, দরজাটা খুলুন, শুনছেন মশাই, দরজাটা খুলুন।

কিন্তু সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সাহু আবার ধাক্কা দিলেন, আরো জোরে।

প্রায় মিনিট তিনেক ধাক্কাধাক্কির পর ঘরের দরজা খুলে গেল।

কে? কি চাই? কিন্তু ঐ পর্যন্তই, আর কথা বেরুল না চন্দ্রকান্তর গলা থেকে।

এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁচা পাকা এলোমেলো চুল, মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি, পরনে একটা মলিন স্ল্যাকস ও গায়ে একটা ততোধিক ময়লা ও ছেঁড়া গেঞ্জী। গেঞ্জীটা যে কতদিনের পুরানো ও ময়লা কে জানে।

সাহুই প্রশ্ন করলেন, কি নাম আপনার?

আপনার নাম দিয়ে কি হবে?

সাহু এবার বেশ একটু কড়া গলাতেই বললেন, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন—বলে চন্দ্রকান্তকে আর জবাবের অবকাশ না দিয়ে তাকে ঠেলেই যেন একপ্রকার সকলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরের মধ্যে এলোমেলো একটা শয্যা, গোটা দুই খেনো মদের শূন্য বোতল মেঝেতে গড়াচ্ছে, এখানে ওখানে মেঝেতে আধপোড়া সিগ্রেটের টুকরো ছড়ানো।

একপাশে মেঝেতে একটা ছোট স্যুটকেশ, দেওয়ালের আলনায় একটা ময়লা হাফ হাতা হলদে রংয়ের ময়লা টেরিকটের শার্ট ঝুলছে।

সাহু আবার প্রশ্ন করলেন, কি নাম আপনার?

চন্দ্রকান্ত ঘাই। ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে জবাব এলো।

কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে।

তা কি করা হয়?

কাজকর্ম কিছু করি না, তবে পেলে করি—

কিছু করেন না—

রিটায়ার করেছি বছর কয়েক হল, রিটায়ার করার পর থেকে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

কিরীটী একদৃষ্টে চন্দ্রকান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ থাকলেও কেন যেন তার মনে হচ্ছিল ঐ মুখের সঙ্গে কোথায় একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে তার দেখা কোন একটা মুখের। কিন্তু কিরীটী ঠিক যেন স্মরণ করতে পারে না ঐ মুহূর্তে।

চন্দ্রকান্ত বললে এবারে, কিন্তু এভাবে ডাকাডাকি করে আমার ঘুমটা ভাঙালেন কেন দারোগা সাহেব বলবেন কি?

আপনার ঠিক পাশের ঘরেই একজন ভদ্রলোক ও একজন স্ত্রীলোক থাকতেন নিশ্চয়ই জানেন মিঃ ঘাই? সাহুর প্রশ্ন।

না।

জানেন না!

না। হোটেলে উঠেছি, আজ না হয় কাল চলে যাব, আমার পাশের ঘরে কে আছে না আছে সে খবর জেনে আমার কি হবে—আর তার দরকারটাই বা কি।

আপনার পাশের ঘরের মহিলাটিকে কাল রাত্রে কেউ হত্যা করেছে—

কি! কি বললেন—খুন!

হ্যাঁ খুন। নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, কিরীটী বললে। কথাটা বলে কিরীটী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে। চন্দ্রকান্তর দু'চোখের তারায় একটা স্পষ্ট ভীতি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল চন্দ্রকান্ত, তারপর একটা ঢোক গিলে বলল, তা আমার কাছে কেন এসেছেন আপনারা?

কাল রাত্রে আপনি তো পাশের ঘরেই ছিলেন—

দোহাই আপনাদের, আমি কিছু জানি না।

কিরীটী ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে, হঠাৎ প্রশ্ন করল, ঐ স্যুটকেশটা আপনার?

হ্যাঁ, আমার—

কি আছে ওটার মধ্যে?

জামাকাপড়, বোধ হয় একটা রামের বোতল, আর কিছু টুকিটাকি জিনিস।

দেখতে পারি?

হ্যাঁ, দেখুন না।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে স্যুটকেশের ডালাটা খুলতেই থমকে দাঁড়াল। জামাকাপড়ের উপরে একটা তীক্ষ্ণধার রক্তমাখা ভোজালী।

এটা কার?

ভোজালী! সে কি? ওটা কোথা থেকে এলো আমার স্যুটকেশের মধ্যে।

কিরীটী রুমাল বের করে সন্তর্পণে ভোজালীটা তুলে নিল। মিঃ সাহু, দেখুন—হেমন্ত সাহু কিরীটীর হাতের দিকে তাকালেন। মাঝারি সাইজের সুন্দর চমৎকার হরিণের সিঙয়ের তৈরি বাঁটওয়ালা একটা ভোজালী।

কিরীটী বললে, দেখুন, এখনো রক্তের কালো দাগ শুকিয়ে আছে ভোজালীটার গায়ে। আর দেখছেন—

হ্যাঁ, একটা কালো লম্বা চুল। সাহু বললেন।

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো—কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, এই ভোজালীটার সাহায্যেই হত্যাকারী অনুরাধা দেবীকে হত্যা করেছিল।

সাহু চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে এবার যেন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

চন্দ্রকান্ত স্থির পাষাণের মত দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ফারিত দু'টি চক্ষুর দৃষ্টি স্থির, ঠোঁটটা যেন ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে।

চন্দ্রকান্তবাবু—সাহু প্রশ্ন করলেন, এটা কার?

জানি না? শুকনো গলায় যেন ফিস ফিস করে জবাব দিল চন্দ্রকান্ত।

জানেন না?

না। একটু—একটু জল—

সাহুই এগিয়ে গিয়ে এক কোণে ছোট্ট একটা টুলের উপরে রাখা কাচের জাগ থেকে গেলাসে জল ঢেলে চন্দ্রকান্তর সামনে ধরলেন।

কম্পিত হাতটা বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে চোঁচোঁ করে সবটুকু জল পান করে নেয় চন্দ্রকান্ত, এবং তার পর মুহূর্তেই

চন্দ্রকান্তের কম্পিত শিথিল হাত থেকে শূন্য কাচের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে ঝন ঝন করে ভেঙে গেল।

চন্দ্রকান্ত কেমন বোকা বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকাল ওদের মুখের দিকে।

তা যেন হল, কিন্তু অস্ত্রটা আপনার স্যুটকেশের মধ্যে কোথা থেকে এলো?

কি করে বলব। আমি কিছুই জানি না।

আপনি তো ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে শুয়েছিলেন?

চাবি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাবি। দরজার গডরেজের তালার চাবিটা কোথায়?

কোথায় চাবিটা! কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতো চন্দ্রকান্ত উচ্চারণ করলে।

দেখুন তো, আপনার পকেটেই হয়তো আছে।

পকেটে হাত দিয়ে চন্দ্রকান্ত বললে, পকেটে? কই পকেটে তো নেই!

আরে এই তো চাবিটা—বলতে বলতে হেমন্ত সাহু দরজার এক পাশে মেঝে থেকে গডরেজের চাবি তুলে নিলেন—দেখুন তো মিঃ রায়, এই চাবিটা বোধ হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেল ঐ চাবিটাই দরজার চাবি।

কিরীটী আবার বললে, তাহলে চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি বলতে পারছেন না, আপনার স্যুটকেশের মধ্যে এই ভোজালীটা কি করে এলো?

আমি আগে কখনো এটা দেখিনি, বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করুন আপনারা। চন্দ্রকান্তের গলার স্বরে করুণ মিনতি।

সাহু কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি স্থির নিশ্চয় করে বলতে পারি মিঃ রায়, এই লোকটিই কাল রাত্রে কোন এক সময় পাশের ঘরে গিয়ে অনুরাধা দেবীকে হত্যা করেছে।

চন্দ্রকান্ত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, না না, আমি কাউকে খুন করিনি।

সাহু উচ্চ কণ্ঠে দরজার বাইরে প্রহরারত জমাদারকে ডাকলেন। রঘুনন্দন—জমাদার ঘরের মধ্যে ঢুকে সেলাম দিল।

ইসকো হাতমে হাতকড়া লাগাও।

কেন—কেন—আমার হাতে হাতকড়া পরাবে কেন, আমি কাউকে

খুন করিনি—চন্দ্রকান্ত প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে কিন্তু তার প্রতিবাদে কর্ণপাত করা হয় না। পকেট থেকে একজোড়া হাতকড়া বের করে চন্দ্রকান্তর হাতে পরিয়ে দিল জমাদার রঘুনন্দন।

যাও একে নিয়ে নিচে অফিস ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর রঘুনন্দন, আমরা আসছি—চন্দ্রকান্তকে নিয়ে রঘুনন্দন নীচে চলে গেল।

ভাগ্যে আপনি ছিলেন মিঃ রায়—হেমন্ত সাহু গদ্‌গদ ভাবে বললেন, খুনের ফায়সালা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল—ঐ স্যুটকেশ দেখার কথাটা কখনও আমার মনেই হত না।

কিরীটী বললে, আপনি স্যুটকেশটা ভালো করে লক্ষ্য করেননি, করলে নজরে পড়ত বন্ধ ডালাটার ওপাশ থেকে একটু কাপড়ের অংশ বের হয়ে ছিল—কিরীটী এগিয়ে গিয়ে একটা রক্তমাখা রুমাল তুলে বলল, এই দেখুন, এই রুমালের একটা অংশ আমার নজরে পড়েছিল।

এটা তো দেখছি একটা লেডিজ রুমাল।

কিরীটী রুমালটা পরীক্ষা করতে করতে বলল, হ্যাঁ, লেডিজ রুমাল, দেখুন এর এক কোণে ইংরেজী অক্ষর 'এ' লাল সুতো দিয়ে লেখা আছে।

কার এই রুমালটা বলুন তো?

'এ' অনেকেরই নামের আদ্যাক্ষর হতে পারে। কিরীটী বলল, অনুরাধা দেবীরও হতে পারে, একটা সূক্ষ্ম সেণ্টের গন্ধ এই রুমালটা থেকে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

চলুন তো একবার পাশের ১৬নং ঘরে।

হেমন্ত সাহু ও কিরীটী এসে আবার পাশের ঘরে ঢুকল। ঘরের সামনে একজন সেপাই দাঁড়িয়ে ছিল, সে সরে দাঁড়াল ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের দিকের জানালা খুলে দিতেই এক ঝলক রৌদ্র এসে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বাইরে ইতিমধ্যে মেঘ কেটে গিয়ে যে সূর্যের আলো প্রকাশ পেয়েছে তা ওরা জানতে পারেনি।

কিরীটী আর একবার ঘরের চারপাশে তাকাল।

পাশাপাশি দুটো চামড়ার স্যুটকেশ, দুটোই তালা বন্ধ। একটা সাইজে বেশ বড় অন্যটা মাঝারি সাইজের। ছোট স্যুটকেশটার গা-

তালার সঙ্গে একটা চাবির রিং ঝুলছে। চাবি ঘোরাতে গিয়ে দেখা গেল চাবিটা খোলা। ডালা তুলতেই নজরে পড়ল কিছু দামী দামী শাড়ি, আরো কিছু স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য টুকিটাকি এক পাশে একটা দামী সেণ্টের সুদৃশ্য শিশি। সেটার ছিপি খুলে নাকের কাছে ধরতেই রুমালের গন্ধটা পাওয়া গেল। তার পাশে একটা লেডিজ ব্যাগ। ব্যাগটা খুলল কিরীটী।

একটা কমপ্যাক্টের সুদৃশ্য কৌটো—ছোট মিরার, একটা চিরুনি, একটা লেডিজ রুমাল, বেশ কিছু একশো টাকার নোট, খুচরো কয়েন।

কিরীটী অনুরাধার মৃতদেহটার দিকে তাকাল। বীভৎস, নৃশংস।

ডেড্‌বডিটা এবার মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন মিঃ সাহু।

হ্যাঁ? চলুন, এবারে থানায় যাওয়া যাক। হেমন্ত সাহু বললেন।

সরিৎশেখর আর সলিল দত্ত মজুমদারকে আরো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে মিঃ সাহু—কিরীটী বলল।

চলুন না ওদের থানায় নিয়ে যাই, যা জিজ্ঞাসা করবার সেখানেই করবেন। তারপর না হয় ছেড়ে দেওয়া যাবে—খুনীই যখন ধরা পড়ে গিয়েছে—

আপনার তাহলে ধারণা ঐ চন্দ্রকান্ত ঘাই—

নিশ্চয়ই। ঐ ভদ্রলোকই মার্ডারার। কেন, আপনার কোন সন্দেহ আছে নাকি তাতে? কথাটা বলে হেমন্ত সাহু কিছুটা যেন গর্বিত ও উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে—এখন পর্যন্ত যে সব এভিডেন্স আমরা পেয়েছি, সেটাই কি প্রমাণ করে না।

তা হয়তো করে, কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি মিঃ সাহু, ১৫নং ঘরের মেঝেতে দুটো ধেনোর শূন্য বোতল গড়াগড়ি দিচ্ছিল।

ধেনোর বোতল! কিছুটা যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই মিঃ সাহু তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

দু-বোতল ধেনো গিলে একটা মানুষের অবস্থা কি হতে পারে নিশ্চয়ই আমাদের কথাটা একবার ভাবতে হবে—

নিশ্চয়ই ভেবেছি বৈকি, সাহু জবাব দিলেন, যা তা ব্যাপার তো নয় একটা লোককে মার্ডার করা, মনটাকে সেজন্য প্রস্তুত করবার জন্য হয়তো দু-দুটো বোতলের প্রয়োজন হয়েছিল।

তা বটে—কিরীটী মৃদু হাসল।

বুঝতে পারছেন না মিঃ রায়, লোকটা একটা কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার।

আমার কিন্তু মনে হল—কিরীটী বলল, লোকটা অসম্ভব ভীতু—

ভীতু লোকেরা কি খুন-খারাপি করে না মি রায়? আমি তিন তিনটে কেস জানি—অসম্ভব ভীতু—অথচ নৃশংসভাবে খুন করেছিল।

ঠিক আছে, আপনি লোকটাকে এ্যারেস্ট করুন, তবে একটা কাজ যদি করতে পারেন আপনি, মনে হয় আপনার identification-এর খুব সুবিধা হবে।

বলুন না কি করতে হবে?

একটা নাপিত ডাকিয়ে, থানায় নিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছেঁটে দিতে পারেন।

কয়েকটা মুহূর্ত সাহু হাঁ করে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, মনে হল ব্যাপারটা যেন তিনি আদৌ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দেব! তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনি?

মনে হচ্ছে ওটা ওর স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সযত্নে রক্ষিত ও বর্ধিত, এবং সেই সযত্ন প্রয়াসের মধ্যে কোন বিশেষ অভিসন্ধি—

ঠিক আছে, বলছেন যখন—

কি জানেন মিঃ সাহু, ভালো করে চেয়ে দেখবেন ওর মুখের দিকে, লোকটাকে ঐ দাড়ি গোঁফে যেমন কুৎসিত দেখাচ্ছে ঠিক তেমনটি হয়তো লোকটা দেখতে নয়।

অতঃপর মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থানা থেকে জীপ আনিয়ে চন্দ্রকান্তকে হাতকড়া পরিয়ে হেমন্ত সাহু প্রস্থান করলেন।

কিরীটী এসে অফিস ঘরে ঢুকল। সলিল দত্ত মজুমদার একটা চেয়ারে গুম হয়ে বসে ছিল। সারা মুখে তার বিরক্তি।

ভবেশ অধিকারী তার চেয়ারে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিঃশব্দে টানছিলেন। কিরীটীর পিছনে আট দশজন বোর্ডার এসে ঘরে ঢুকলেন।

একসঙ্গে সবাই বলে ওঠেন, আমাদের বিল দিন, আমরা আর এ হোটেলে এক মুহূর্ত থাকব না।

ভবেশ অধিকারীর ধূমপান সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। জ্বলন্ত ও অর্ধদগ্ধ বিড়িটা মুখে চেপে ধরে থাকেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে তো আপনাদের কারোরই এ হোটেল থেকে যাওয়া হবে না—কথাটা শান্ত গলায় বললে কিরীটী।

যাওয়া হবে না! কেন? অনেকগুলো কণ্ঠস্বর যেন একঝাঁক তীরের মতো কিরীটীর প্রতি বর্ষিত হল।

১৬নং ঘরে একজন ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন, দারোগাবাবুর হুকুম তার এনকোয়ারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত হোটেল ছেড়ে কেউ যেতে পারবেন না—

একজন বলে উঠলেন, দারোগাবাবুর কি ধারণা, আমাদের মধ্যে তাকে কেউ খুন করেছে—

সেটা আপনারা দারোগাবাবুকেই জিজ্ঞাসা করবেন, কিরীটী বললে।

কোথায় দারোগাবাবু?

থানায়।

চল হে, আমরা তাহলে থানায় যাই—একজন আবার বললেন।

কিন্তু এ অন্যায়· বেআইনী জুলুম—বললে সলিল দত্ত মজুমদার।

কিরীটী সলিল দত্ত মজুমদারের কথায় কান না দিয়ে দোরগোড়ার সমাগতদের দিকে তাকিয়ে বললে, থানায় আপনাদের কাউকেই যেতে হবে না। মনে হয় কাল পরশুর মধ্যেই দারোগাবাবুর তদন্ত শেষ হয়ে যাবে, তারপর আর উনি আপনাদের যেতে বাধা দেবেন না। একটা বা দুটো দিন। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, ম্যানেজারবাবু তো কিছু ইচ্ছা করে আপনাদের অসুবিধা সৃষ্টি করছেন না, তাছাড়া দেখছেন তো, উনি নিজেও কম বিব্রত হননি—

সমাগতদের একজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, জানতে পারি কি আপনি কে মশাই এ হোটেলে?

কৃষ্ণকায় এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, চিনতে পারছেন না—উনি কিরীটী রায়।

কিরীটীবাবু! অন্য একজনের প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বিখ্যাত সত্যসন্ধানী—শোনেননি ওর নাম—

ধীরে ধীরে ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

সলিল দত্ত মজুমদার তারই সোনার সিগ্রেট কেসটা পকেট থেকে বের করে একটা লাইটারের সাহায্যে একা সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

সরিৎশেখর ঐ সময় অফিস ঘরে এসে প্রবেশ করল। সলিল দত্ত মজুমদার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সরিৎশেখরের দিকে তাকাল।

বসুন বসুন ডঃ সেন, আপনি এসেছেন ভালোই হল, ভাবছিলাম আপনার ঘরে যাব।

ডঃ সেন একটা চেয়ার টেনে বসল। তারপর বললে, আমিও আপনাকে কিছু বলব বলেই এসেছি মিঃ রায়।

সলিল দত্ত মজুমদার সহসা উঠে দাঁড়াল, ম্যানেজারবাবু, আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিন।

নীচের তলায় সিঁড়ির কাছে ১১নং ঘরটা খালি আছে—

থাকতে যখন হবে যেখানেই হোক থাকবার একটা ব্যবস্থা করুন। আর কলকাতায় আর্জেণ্ট একটা ট্রাংক-কল বুক করুন—বলে নম্বরটা বললেন, সলিল দত্ত মজুমদার।

কিরীটী বললে, উনি তো আই জি.—

হ্যাঁ, মিঃ গুপ্ত আমার বন্ধু—সলিল দত্ত মজুমদার গর্বিত কণ্ঠে বললে, আপনারা আমাকে নিয়ে খেলা করবেন আর আমি তাই সহ্য করে যাব যদি ভেবে থাকেন তো ভুল করেছেন। আমি একটা বিরাট কনসার্নের জি. এম.—

মিথ্যে আপনি রাগ করছেন মিঃ দত্ত মজুমদার। কিরীটী বললে।

মিথ্যে! আমার কোন প্রেসটিজ নেই বলতে চান?

আচ্ছা মিঃ দত্ত মজুমদার, হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করল, আপনাদের কোম্পানীর কাজে আপনি জামসেদপুরে নিশ্চয়ই গিয়েছেন কখনো না কখনো—

বহুবার গিয়েছি, তাছাড়া—আমার বাবা আর এল দত্ত মজুমদার টিসকোর একজন বড় অফিসার ছিলেন। রাঁচিতে আমি আই এস-সি. পড়েছি, তারপর বি. এস-সি. পাশ করে বিলেত যাই, তা হঠাৎ ও কথা কেন—

আপনি ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে জামসেদপুরের কাউকে চেনেন?

ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! কেমন যেন একটু চমক দত্ত মজুমদারের গলার স্বরে। কিন্তু কথায় সেটা প্রকাশ পেল না।

হ্যাঁ, টিসকোতেই কাজ করতেন, পরে রিটায়ার করেন—কিরীটী বললে।

“না, ঠিক মনে করতে পারছি না। কিন্তু, কেন বলুন তো?

না ভাবছিলাম আপনার বাবা তো ওখানেই থাকতেন আর আপনারও সেখানে যাতায়াত ছিল। জামসেদপুর বিহারের কতটুকুই বা একটা টাউন—চিনলেও হয়তো ভদ্রলোককে চিনতে পারেন। আরো একটা কথা, সেই ভদ্রলোক তিন বছর আগে এই হোটেলেই আত্মহত্যা করেছিলেন ঐ দোতলার ১৭নং ঘরে—

গোপী এসে দাঁড়াল দরজার সামনে, বললে, ১১নং ঘর ঠিক করে দিয়েছি ম্যানেজারবাবু।

যান মিঃ দত্ত মজুমদার, গোপীর সঙ্গে যান—ভবেশবাবু বলেন।

সলিল দত্ত মজুমদার আর মুহূর্তও দেরি করে না। গোপীর সঙ্গে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল একটু যেন দ্রুতপদেই।

কিরীটী যেন কেমন অন্যমনস্ক। মনে হল সে যেন কি ভাবছে।

মিঃ রায়—

সরিৎশেখরের ডাকে কিরীটী ফিরে তাকাল।

গতকাল অনুরাধার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল, আমার মনে হচ্ছে আপনার সব কথা জানা প্রয়োজন।

কিরীটী উঠে দাঁড়াল।—চলুন ডঃ সেন, আমার ঘরে চলুন। ভবেশবাবু, দু'কাপ চা পাঠিয়ে দেবেন আমার ঘরে, ১৭ নম্বর।

॥ নয় ॥

১৭নং ঘরে দুটো চেয়ারে কিরীটী আর সরিৎশেখর মুখোমুখি বসে।

অনুরাধার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় ও এক সময়ের ঘনিষ্ঠতার কথা সবিস্তারে বলছিল সরিৎশেখর, আমি এখানে আসবার আগে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি মিঃ রায়, এই ভাবে হঠাৎ এতদিন পরে অনুরাধার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে। সত্যি, অনুরাধার কথা যেন কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না!

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ডঃ সেন, আপনি যেমন অনুরাধা দেবীকে ভুলতে পারেননি অনুরাধা দেবীও ঠিক তেমনি আপনাকে ভুলতে পারেননি।

আরো কি দুঃখ হচ্ছে জানেন আমার, অনুরাধা সেদিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যে ভুলটা করে বসেছিল, এবং যে ভুলটা সে শোধরাবার

জন্য এতখানি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত সে ভুলটা শোধরাবার আর সুযোগ পেল না—

অনুরাধা দেবী সত্যি সত্যিই কি তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয় ডঃ সেন ?

হ্যাঁ। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সে অনুতপ্ত হয়েছিল, আর তাই ঐ মানুষটার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য একপ্রকার মরিয়া হয়ে উঠেছিল। শেষটায় হয়তো আর কোন পথ না খুঁজে পেয়েই আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যা নয় ডঃ সেন, তাকে নৃশসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু কে—কে তাকে অমন করে হত্যা করল ?

একজন কেউ তাকে হত্যা করেছে নিশ্চয়ই।

শুনলাম চন্দ্রকান্তবাবুর স্যুটকেশে একটা রক্তমাখা ভোজালী পাওয়া গিয়েছে—তাই কি দারোগাবাবু ওকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেলেন ?

ঠিক তাই।

আপনি কি মনে করেন চন্দ্রকান্তবাবুই—

মনে হওয়াটা তো আশ্চর্য না, উনি তো গতরাত্রে ঠিক ওর পাশের ঘরেই ছিলেন। সে যাক, আপনি কি কাউকে ঐ ব্যাপারে সন্দেহ করেন ডঃ সেন ?

না, কাকেই বা সন্দেহ করব ?

আচ্ছা আপনি আমার একটা কথার জবাব দিন তো—গতকাল ঐ সকালের পর অনুরাধা দেবীর সঙ্গে আর আপনার সাক্ষাৎ হয়নি বা তার সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি ?

ডঃ সেন চুপ করে রইলেন।

মনে হয় হয়েছিল, তাই নয় কি ড. সেন ?

হয়েছিল। ম্লান কণ্ঠে ডঃ সেন বললে, কাল রাত্রে যখন খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তখন আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম।

রাত তখন ক'টা হবে ?

বোধ করি সোয়া আটটা।

কতক্ষণ ছিলেন সেখানে ?

অনেকক্ষণ। ঘণ্টা দু-তিন তো হবেই—

যদি আপত্তি না থাকে আপনাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল বলবেন ?

অনুরাধা গত রাত্রে সরিৎশেখরের বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দু' হাতে আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—

সরিৎ প্রথমটায় কি করবে বুঝে উঠতে পারেনি, তারপর এক সময় বললে, কেঁদো না অনু, কেঁদো না, শোন—

আমাকে তুমি বাঁচাও সরিৎ—

শোন আমার কথা—

না না, আগে বল এই যন্ত্রণা থেকে তুমি আমায় মুক্ত করবে।

শোন—সরিৎ সযত্নে অনুরাধার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, মুক্তি আজ তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে অনু। বাইরের কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে ! অনুরাধা বললে, জানো না ঐ মানুষটাকে তুমি ? চেনো না ?

একটা মিথ্যাকে মেনে নিতে নিতে তুমি আজ দুর্বল হয়ে গিয়েছ রাধা ! এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠ, দেখবে মুক্তির পথটা তখন খুঁজে পেতে তোমার কষ্ট হবে না। মিথ্যে জুজুর ভয় মন থেকে যত দিন না দূর করতে পারবে—

চল—তুমি আমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে চল।

তাতে করে তো তোমার এই প্রবলেমের কোন সমাধান হবে না।

তবে কি আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই ?

ছিঃ রাধা, ও কথা ভাবাও অন্যায়।

তাহলে বল, কি করতে হবে আমাকে ?

কাল যখন দত্ত মজুমদার ফিরে আসবেন, তাকে সবকিছু স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে তুমি কলকাতায় চলে যাও—

তারপর ?

আমি এখনো সেই বাসাতেই আছি। ভানুকে তুমি চেনোই, আমার সেই পুরাতন চাকর, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। সেখানেই উঠ।

তুমি ?

পরশু বা তার পরের দিন ফিরে যাব।

ঠিক তো?

ঠিক। আমি এবার চলি, কেমন। তুমি ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়—

কিরীটী শুধাল, তারপর?

সরিৎশেখর বললে, আমি তার ঘর থেকে বের হয়ে চলে এলাম। বাইরে তখনো প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি। আমি সোজা আমার ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিলাম।

রাত তখন ক'টা হবে?

জানি না। ঘড়ি দেখিনি, তবে মনে হয় রাত সোয়া দশটা কি সাড়ে দশটা—

অনুরাধা দেবী কি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, আমি দরজার কবাট দুটো টেনে দিতে ভিতর থেকে দরজার লকটা পড়বার শব্দ পেয়েছিলাম।

অনেক ধন্যবাদ। আপনার স্টেটমেণ্ট থেকে অন্তত এটা প্রমাণিত হল যে গত রাত্রে সোয়া দশটা পর্যন্ত অনুরাধা দেবী জীবিতই ছিলেন। যা ঘটেছে, ঘটেছে তারপর। রাত সাড়ে দশটার পর কোন এক সময় হত্যাকারী তাকে হত্যা করেছে। এবং অনুরাধা দেবী নিজেই হত্যাকারীকে তার ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। অথচ তিনি জানতেও পারেননি, সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তিনি ঘরে ঢুকিয়েছিলেন। অবিশ্যি তাতে করে এও প্রমাণ হচ্ছে যে হত্যাকারী তার অপরিচিত কেউ ছিল না। নচেৎ নিশ্চয়ই তিনি তাকে দেখে চেঁচামেচি শুরু করতেন, লোক ডাকতেন। আর ঘরেও আলো জ্বলছিল—

সরিৎশেখর কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল এবং বললে, আপনি কি অনুমান করতে পেরেছেন মিঃ রায়, কাল রাতে অনুকে কে হত্যা করেছে?

কিরীটী শান্ত গলায় বললে, এতক্ষণ সেটা অস্পষ্ট থাকলেও এখন আর নেই। দু একদিনের মধ্যেই সেটা জানতে পারবেন। আচ্ছা ডঃ সেন, আপনি এবারে আসুন, আমি একটু বেরুব।

সরিৎশেখর ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিরীটীও উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী হোটেল থেকে বের হয়ে একটা সাইকেল রিক্শা নিল।

সকাল থেকে যে সন্দেহটা তার মনের মধ্যে ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট ছিল এখন সেটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কৌন্টি যিবে ?—রিক্‌শাওয়ালা শুধায়।

থানায় চল।

সাইকেল রিক্‌শা থানার দিকে চলল।

গত রাত্রের ঝড়-বৃষ্টির পর শহর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আকাশে এখানে ওখানে সামান্য ভাসমান মেঘ থাকলেও মোটামুটি পরিষ্কার।

থানার অফিস ঘরেই হেমন্ত সাহু বসে ছিলেন। কিরীটী ঘরে ঢুকতেই বললেন, এই যে আসুন মিঃ রায়। একটু আগেই এস-পি সাহেব চলে গেলেন।

চলে গিয়েছেন ?

হ্যাঁ, তবে বারবার করে বলে গিয়েছেন, আজকের কেসটার ব্যাপারে আমি যেন আপনার পরামর্শ নিই। এদিকেও মহা ঝামেলা—

কি আবার ঝামেলা ?

ঐ যে, আমাদের চন্দ্রকান্ত ঘাই—দাড়ি গোঁফ কামাবে না কিছুতেই—

কামায়নি ?

কামিয়ে দিয়েছি।

কোথায় সে ?

হাজত ঘরে—

এখানে আনান লোকটাকে।

সাহু একজন সেপাইকে আদেশ করলেন চন্দ্রকান্তকে অফিস ঘরে আনবার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন সেপাই চন্দ্রকান্তকে ধরে নিয়ে এলো।

কিরীটী তাকাল চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে—আর তার কোন সন্দেহ নেই। তার অনুমান মিথ্যা নয়, মন তার মিথ্যা বলেনি। তবু কিরীটী পকেট থেকে একটা ফটো বের করে একবার মিলিয়ে নিল।

ওটা কার ফটো মিঃ রায় ? হেমন্ত সাহু শুধালেন।

দেখুন না, চিনতে পারেন কিনা। কিরীটী ফটোটা এগিয়ে দিল সাহুর হাতে।

সাহু দেখতে দেখতে বললেন, আশ্চর্য ! এ যে—

ঠিক তাই। দিন ফটোটা—

কিরীটী ফটোটা নিয়ে আবার পকেটে রাখল।

এবার একটা কাজ করতে হবে মিঃ সাহু—কিরীটী বললে।

কি করতে হবে ?

একটা ঠিকানা দিচ্ছি—বলে একটা কাগজে নাম ধাম লিখে কাগজটা সাহুর হাতে তুলে দিল কিরীটী, এই ঠিকানায় একে একটা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করে দিন, আর বিষ্ণুপুরের থানা অফিসারকেও একটা কেবল পাঠান যেন অবিলম্বে এখানে তিনি চলে আসেন। মানে ওর এখানে আসার ব্যবস্থা করে দেন।

এখুনি দিচ্ছি—উঠে পড়লেন হেমন্ত সাহু।

হেমন্ত সাহু বের হয়ে যাবার পর কিরীটী আবার চন্দ্রকান্তর দিকে তাকাল।

এবার বলুন আপনাকে কোন নামে ডাকব। কিরীটী চন্দ্রকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে।

মানে ? ভ্রূকুটি করে চন্দ্রকান্ত তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

মানে চন্দ্রকান্ত ঘাই তো আর আপনার আসল নাম নয়।

আপনি বলতে চান আমি আমার নাম ভাঁড়িয়েছি ? চন্দ্রকান্তর গলার স্বর রুক্ষ।

ক্ষিতীশবাবু—

সঙ্গে সঙ্গে যেন চন্দ্রকান্ত চমকে কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

খুব আশ্চর্য হচ্ছেন না ? আপনি যে ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেটা আজ আর আমার কাছে অজ্ঞাত নেই—

কি বলছেন যা তা—

যা বললাম আমি জানি তার চাইতে বড় সত্য আর নেই। কিন্তু এবারে বলবেন কি—এই তিন তিনটে বছর ঐ ছদ্মবেশের কি প্রয়োজন ছিল ?

আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন, কিন্তু স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু এটা তো বুঝেছেন দারোগা সাহেব কেন আপনাকে এখানে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে এসেছেন অনুরাধা দেবীর হত্যার অভিযোগ থেকে যদি নিজেকে এখনো বাঁচাতে চান তো সব কথা আমাকে খুলে বলুন—

আমি অনুরাধা দেবীকে হত্যা করিনি।

সাহুর পক্ষে খুব একটা কঠিন হবে না আপনার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করতে—ঐ রক্তমাখা ভোজালী যেটা আপনারই ঘরে আপনারই স্যুটকেশের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, তার চাইতে আর মোক্ষম প্রমাণ কি হতে পারে এবং আরো একটা কথা, অনুরাধা দেবী কাল রাত্রে ছিলেন ১৬নং ঘরে এবং আপনি ছিলেন ঠিক তার পাশেই অর্থাৎ ১৫ নম্বরে।

না না, আমি বলছি—আমি এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানি না। অনুরাধা দেবীকে আমি হত্যা করিনি, তাকে আমি চিনি না, কখনো আগে দেখিওনি।

কিন্তু Circumstantial evidences যে আপনাকে কোণ ঠাসা করে ফেলবে, আদালতে কোন ক্রমেই তো আপনি benefit of doubt পাবেন না। আমি—একমাত্র কিরীটী রায়ই আপনাকে বাঁচাতে পারে—

দোহাই আপনার কিরীটীবাবু, আপনি আমাকে বাঁচান। বলতে বলতে ক্ষিতীন্দ্র হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

হেমন্ত সাহু এসে ঘরে ঢুকলেন, পাঠিয়ে দিলাম কেব্‌ল দুটো।

কিরীটী বললে, এখন ক্ষিতীন্দ্রবাবুকে নিয়ে কি করবেন মিঃ সাহু?

হেমন্ত সাহু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন কিরীটির মুখের দিকে, ক্ষিতীন্দ্রবাবু!

ওর আসল নাম চন্দ্রকান্ত ঘাই নয়, উনি আপনাকে একটা ধোঁকা দিয়েছিলেন—

কি বলছেন কি?

হ্যাঁ মিঃ সাহু, ওর আসল নাম ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তিন বছর আগে ঐ হোটেলে যিনি নিহত হয়েছিলেন, এবং আপনাদের রিপোর্ট অনুযায়ী গলায় ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, ইনি তিনিই—আদি ও অকৃত্রিম ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জামসেদপুর নিবাসী মালতী দেবীর স্বামী—গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব আপনার মিঃ সাহু বুঝতে পারছি—its a long story!

ক্ষিতীন্দ্রবাবু তবে আত্মহত্যা করেননি! তাহলে—

তাহলে তিন বছর আগে ঐ হোটেলে কে খুন হয়েছিল, তাই তো? না, সেটা এখনো—মানে সে রহস্য এখনো ধোঁয়া। সম্ভবত সেই তিন বছর আগেকার এক হত্যার জেরই—অনুরাধা দেবীকে হত্যা।

সত্যিই মিঃ রায়, আমার সব কিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। হেমন্ত সাহু বললেন।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে হেসে বললে, তবে মনে হচ্ছে আমাদের হাতে যতটুকু প্রমাণাদি এসেছে, তার মধ্যে কিছু সূত্র আছে, যে সূত্র ধরে এগুলেই হয়তো আমরা সমস্ত রহস্যের মীমাংসা খুঁজে পেয়ে যাব—ছুটো দিন অপেক্ষা করুন।

তবে কি অনুরাধা দেবীকে উনি হত্যা করেননি?

যদি বলি, ও না।

তাহলে ঐ ভোজালী, ঐ রুমাল—

বললাম তো, ছুটো দিন অপেক্ষা করুন, আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব পাবেন।

ওর কি ব্যবস্থা করব? হেমন্ত সাহু শুধালেন।

কেন—যেমন হাজতে আছেন তেমনিই থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে ক্ষিতীন্দ্রবাবু গত রাত্রে অনুরাধা দেবীকে হত্যা করেননি। আচ্ছা আমি এখন উঠব মিঃ সাহু—উঠে দাঁড়াল কিরীটী।

আপনি—

ভয় নেই, হোটেলেই থাকব, মালতী দেবী না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত। বলে থানা থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল কিরীটী।

কিছুটা পথ হেঁটে আসার পর কিরীটী একটা খালি সাইকেল রিক্‌শা দেখে তাকে হাত ইশারায় ডেকে উঠে বসল।

কৌটি যিবে বাবু?

স্বর্গদ্বার হোটেলে চল।

চলন্ত রিক্‌শাতে বসে কিরীটীর হঠাৎ মনে পড়ল বিশেষ একটা জরুরী কথা হেমন্ত সাহুকে বলে আসা হয়নি। আবার ফিরে গেল কিরীটী থানায়।

থানার সামনে পৌঁছে দেখল, হেমন্ত সাহু বেরুচ্ছেন একটা সাইকেল চেপে।

কি—আবার ফিরে এলেন যে? হেমন্ত সাহু শুধালেন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার জগন্নাথ পাণ্ডাকে চেনেন মিঃ সাহু।

হ্যাঁ, তার নিজেরই একটা ট্যাক্সি আছে, নিজেই চালায়।

তাকে একটিবার আপনার থানায় বিকেলে ডাকিয়ে আনতে পারেন?

ভাড়া খাটতে যদি না বের হয়ে থাকে তো ডেকে পাঠাব।

আমি তো হোটেলেই আছি, এলে খবর পাঠাবেন।

ঠিক আছে।

কিরীটী আবার ফিরে চলল। হোটেলের সামনে নামতেই হোটেলের মুলিয়া আড়িয়ার সঙ্গে দেখা হল। তাকে ডেকে কিরীটী কি যেন বলল। সে ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝেছি। কিরীটী বললে, ২০ টাকা বকশিশ পাবি, যা।

আড়িয়া চলে গেল।

রিক্‌শার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কিরীটী এসে তার নিজের ঘরে ঢুকতেই দরজার বাইরে সলিল দত্ত মজুমদারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি মিঃ রায়?

আসুন, আসুন—

সলিল দত্ত মজুমদার ঘরে এসে ঢুকল। পরনে তার পায়জামা পাঞ্জাবী। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, বোঝা গেল স্নান-পর্ব শেষ হয়েছে।

বসুন মিঃ দত্ত মজুমদার—

সলিল দত্ত মজুমদার একটা চেয়ারে উপবেশন করল।

তারপর মিঃ দত্ত মজুমদার—I. G. মিঃ গুপ্তর সঙ্গে ট্রাংকলে কথা হল?

না। তাকে এখনো ফোনে কনটাক্ট করতে পারিনি। এদিকে পরশু দুপুরে আমার একটা জরুরী মিটিং এ্যাটেণ্ড করবার কথা, মিটিংটা এ্যাটেণ্ড না করতে পারলে ভীষণ ক্ষতি হবে।

এখানকার ব্যাপারটাও তো কম জরুরী নয় মিঃ দত্ত মজুমদার।

আপনাদের কি ধারণা মিঃ রায়, অনুরাধাকে আমি হত্যা করেছি?

ব্যাপারটা ঠিক তা নয় মিঃ দত্ত মজুমদার, কিরীটী বলল, এমন কিছু সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স আমাদের হাতে এসেছে যাতে করে আপনিও সন্দেহের তালিকার বাইরে যেতে পারছেন না।

ননসেন্স! আমি কেন অনুরাধাকে হত্যা করতে যাব?

আপনার দিক থেকে হত্যা করবার কারণ যেমন ছিল তেমনি প্রভোকেসানও ছিল। আপনি নিশ্চয়ই চাইতেন না অনুরাধা দেবী আপনার মুঠোর বাইরে চলে যাক।

সে চলে যেতে চাইলে নিশ্চয়ই আমি আটকাতাম না।

আমার প্রশ্নটার ঠিক জবাব নয় ওটা। আমি আপনার মনের ইচ্ছার কথাটা বলেছি—কি, আপনি তা চাইতেন ?

বললাম তো, আটকাতাম না।

কিরীটী মৃদু হাসল। তারপর বলল, গতকাল আপনি ভুবনেশ্বরে যাবার আগে অনুরাধা দেবীর সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তাই না ?

কে বললে ?

যেই বলে থাকুক—কথাটা সত্যি কিনা তাই বলুন।

না।

ভুবনেশ্বরে কখন গিয়ে পৌঁছে ছিলেন ?

বেশীক্ষণ লাগেনি, ঘণ্টা দুই পরেই।

তারপর ফিরলেন কখন ?

আজ সকালে প্রায় দশটা নাগাদ—

আচ্ছা মিঃ দত্ত মজুমদার, আপনার ওয়াটারপ্রুফটা কি আসার সময় এখানে সঙ্গে করে এনেছিলেন ?

এনেছিলাম। বৃষ্টির সময় এটা—ওয়াটারপ্রুফটা তাই সঙ্গেই এনেছিলাম।

কাল বেরুবার সময় সেটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

নিয়েছিলাম বৈ কি।

কিন্তু আজ সকালে যখন ফিরলেন ওয়াটারপ্রুফটা তো আপনার সঙ্গে ছিল না ?

সলিল দত্ত মজুমদার যেন একেবারে বোবা।

ভুবনেশ্বরে ফেলে আসেননি তো ভুল-টুল করে—

না, না—

তবে কোথায় ফেলে এলেন, মনে করবার চেষ্টা করুন।

মনে হচ্ছে ট্যাক্সিতে ফেলে আসতে পারি—

ট্যাক্সিতে ফেলে আসলে কি আর সেটা পাবেন ?

কেন পাব না, নিশ্চয়ই পাব। জগন্নাথ পাণ্ডা সেরকম লোক নয়।

তা বেশ। কিন্তু আপনি যে চলে যেতে চাইছেন, অনুরাধা দেবীর শেষ কাজটুকু কে করবে ?

চুলোয় যাক অনুরাধা, I do'nt care ?

সে কি! এতকাল ভদ্রমহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন—

স্ত্রী না ছাই! একটা লোক দেখানো বিয়ে না করলে—

ওকে ধরে রাখতে পারতেন না, তাই কি?

অফিসের মাইনে ছাড়াও কম টাকা ওকে আমি মাসে মাসে দিইনি। নেমকহারাম, ছোটলোক—

মিথ্যে রাগ করছেন মিঃ দত্ত মজুমদার, রক্ষিতা রাখতে হলে টাকা খরচ করতে হয় বৈকি। যাক্ সে কথা—মুকুল দেবী তো ছিলেন আপনার স্ত্রী, তাই না?

নিশ্চয়ই, রীতিমত রেজেস্ট্রি করে বিবাহ করেছিলাম তাকে।

তবে যে সরিৎশেখরবাবুর কাছে অনুরাধা দেবী বলেছিলেন তিনিও আপনার বিবাহিত স্ত্রী নন, মানে আইনসঙ্গত স্ত্রী ছিলেন না।

বাজে কথা। মুকুলকে আমি রেজেস্ট্রি করে বিবাহ করেছিলাম!

তা হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশটা হলেন কেন? এমন কিছু আপনাদের মধ্যে ঘটেছিল কি?

না, কিছুই ঘটেনি।

আচ্ছা, মুকুল দেবীর দাদার নাম জীমূতবাহন রায়, না?

হ্যাঁ।

সেই যে একদিন অফিসে এসে তিনি আপনাকে থ্রেট্‌ন করে গিয়েছিলেন তারপরে আর তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?

না।

আমি যদি বলি আপনি ঠিক সত্য কথাটা বলছেন না—

মিথ্যা কিসের জন্য বলতে যাব।

কারণ একটা মিথ্যা ঢাকতে গেলে আর একটা মিথ্যা এসে পড়ে। তারপর আর একটা—মিথ্যার পাহাড় জমে ওঠে ক্রমশঃ। আর তখন সবটাই মিথ্যা হয়ে যায়। তাছাড়া ভুলে যাবেন না, মিথ্যাকে চিরদিন সত্য বলে চালানো যায় না, একদিন না একদিন অনিবার্য ভাবেই সত্য যা, তা প্রকাশ হয়ে পড়ে—

সলিল দত্ত মজুমদার আর কিছু বলল না, নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে। কলকাতায় ট্রাংকলে কার সঙ্গে যেন কথা

বলে সবে এসে নিজের ঘরে ঢুকছে কিরীটী। চোরের মতো এদিক ওদিক চাইতে চাইতে প্রৌঢ় মুলিয়া আঁড়িয়া এসে ঘরে ঢুকল কাপড়ের তলায় কি যেন একটা বস্তু সযত্নে আড়াল করে—সাহাব।

কে, আঁড়িয়া আয়—পেয়েছিস ?

হ্যাঁ, পেয়েছি সাহেব। দেখ—সযত্নে কাপড়ের আড়াল থেকে একটা ওয়াটারপ্রুফ বের করে কিরীটীর সামনে ধরল।

কিরীটীর চোখের দৃষ্টি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ওয়াটারপ্রুফটা উলটে পালটে দেখে হৃষ্টচিত্তে বললে, কোথায় পেলি এটা ?

স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে আরো এক মাইল দূরে—বালুর চরায় কাঁটা ঝোপের মধ্যে।

কিরীটী ব্যাগ থেকে দশ টাকার দুটো নোট বের করে আঁড়িয়াকে দিল। আঁড়িয়া হৃষ্টচিত্তে টাকাটা ট্যাঁকে গুজতে গুজতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে থানা থেকে সাহু লোক পাঠালেন। জগন্নাথ পাণ্ডা থানায় বসে আছে। থানায় গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিরীটী যখন ফিরে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘন হয়ে এসেছে তখন।

॥ দশ ॥

পরের দিনই রাত আটটা নাগাদ মালতী দেবী স্বর্গদ্বার হোটেলে এসে পৌঁছালেন। কলকাতা থেকে প্লেনে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পুলিসের লোকই।

কিরীটী তার ঘরেই ছিল। বোধ করি মালতীর আগমন প্রতীক্ষাতেই ছিল।

মালতী দেবী একজন সাধারণ পোশাকের পুলিস অফিসারের সঙ্গে অফিসে এসে কিরীটীর খোঁজ করতেই ভবেশ অধিকারী নিজে এসে মালতীকে কিরীটীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

এই ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজ করছিলেন মিঃ রায়।

মালতী দেবী, আসুন—আসুন—বসুন।

কি ব্যাপার—মালতী বললেন, এত জরুরী তলব দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন ?

আপনার স্বামীর সন্ধান পেয়েছি—

পেয়েছেন ?

হ্যাঁ।

মালতী কিছুক্ষণ অতঃপর গুম হয়ে বসে রইলেন, তারপর ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করলেন, কোথায় সে ?

এখানেই আছেন। থানার হাজতে—

থানায় ? কেন ?

তার মাথার ওপর একটা খুনের চার্জ ঝুলছে।

সে কি ! কাকে আবার সে খুন করল ?

অনুরাধা দেবীকে।

সে কে ?

সব বলব, তার আগে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে—আপনার স্বামীর কি আর কোন ভাই ছিলেন ?

কিরীটীর আচমকা প্রশ্নটা যেন মালতী দেবীকে একেবারে পাথরে পরিণত করে, কেমন যেন বোবা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মালতী দেবী।

মালতী দেবী, আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তো—

আছে, তার এক সৎ ভাই—

সৎ ভাই—

হ্যাঁ, আমার শ্বশুরের দুই বিয়ে, প্রথম যাকে বিয়ে করেছিলেন তার একটি ছেলে ছিল, তারপর তার হঠাৎ সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তারও একটি মাত্র ছেলে, এবং বিবাহের দুই বছরের মধ্যে সেই স্ত্রীরও সর্পদংশনেই মৃত্যু হয়—

দুজনারই সর্পদংশনে মৃত্যু ! কিরীটী প্রশ্ন করল, আশ্চর্য তো !

এর সবটাই পরবর্তীকালে আমার স্বামীর মুখ থেকে শোনা। প্রথমবারের ছেলেকে আমার স্বামীর কাছ থেকে তার দিদিমা নিয়ে যান। কখনো আর তিনি তার বাপের কাছে আসেননি। শ্বশুরমশাইও যত দিন জীবিত ছিলেন সে ছেলের আর কোন সন্ধান নেননি তিনি। সে ছেলে দেখতে কেমন, কি করতেন, এখনো বেঁচে আছেন কিনা কিছুই জানি না।

কিরীটী ধীরে ধীরে বললে, মস্ত বড় একটা জট আমার খুলে গেল মিসেস চ্যাটার্জী। আমি যেন এখন সবকিছু অনুমান করতে পারছি ?

কি অনুমান করতে পারছেন কিরীটীবাবু? প্রশ্ন করলেন মালতী।

বর্তমান রহস্যের গতিবিধি। ঠিক আছে, চলুন এবারে আমার সঙ্গে।

কোথায়?

থানায়। যেখানে আপনার স্বামী ক্ষিতীন্দ্রবাবু আছেন।

মালতী যেন নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তাদের আর বেরুনো হল না।

ঝড়ের মতোই থানা অফিসার হেমন্ত সাহু এসে ঘরে ঢুকলেন।

মিঃ রায়—

কি খবর—এই যে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী মালতী দেবী জামসেদপুর থেকে এখানে এসে পৌঁচেছেন। ওকে নিয়ে আমি থানাতেই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

ক্ষিতীন্দ্রবাবু তো নেই—শুকনো গলায় উচ্চারণ করলেন হেমন্ত সাহু।

নেই—নেই মানে কি?

থানা থেকে পালিয়েছেন—

পালিয়েছেন! কেমন করে? তাকে তো হাজতে রাখা হয়েছিল।

বেলা চারটে নাগাদ হঠাৎ উনি পেটের ব্যথায় ছটফট করতে থাকেন। ক্রমশ ব্যথা নাকি বাড়তে থাকে, আমি থানায় ছিলাম না। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে সব শুনে সিভিল সার্জেনকে কল দিই! ডাক্তার চৌধুরী এসে হাজত ঘরে ঢুকে তাকে পরীক্ষা করছেন, হঠাৎ এক লাফে আমাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে খোলা দরজা পথে ছুটে বের হয়ে গেলেন।

তারপর?

তারপর এই ঘণ্টা তিনেক আশে পাশে সর্বত্র খুঁজেছি, আমি নিজে ও সেপাইরা চার পাঁচজন—কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলাম না—তাই হোটেলে দেখতে এলাম, আপনাকেও কথাটা জানাতে এসেছি—

পাগল নাকি! পালিয়েই যদি থাকেন তো হোটেলে আসতে যাবেন কেন?

এখন বুঝতে পারছেন তো মিঃ রায়, অনুরাধা দেবীর হত্যাকারী আর কেউ নয়, ঐ ক্ষিতীন্দ্রবাবুই—

না—

এখনো বলবেন, ক্ষিতীন্দ্রবাবু অনুরাধা দেবীর হত্যাকারী নন?

হ্যাঁ তিনি নন। কিরীটীর কণ্ঠস্বরে একটা সুস্পষ্ট দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

তবে তিনি পালালেন কেন ?

মনে হচ্ছে মৃত্যুই তাকে টেনেছে, কি জানেন মিঃ সাহু, এই রকম কিছু যে একটা ঘটতে পারে সেটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পেরেছিলাম বলেই তাকে এ্যারেস্ট করে হাজতে রাখায় কোন বাধা দিইনি। আপত্তি জানাইনি। কিন্তু ভাবছি কোথায় যেতে পারেন তিনি ?

কিন্তু সে যদি হত্যাকারী না-ই হবে, তবে—

কিরীটী বললে, ভদ্রলোক কেবল নির্বোধই নন—প্রচণ্ড ভীতুও—

কিরীটীর কথায় হেমন্ত সাহু যেন একটু বিরক্তই হলেন। বললেন, কি জানি মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। তার ঐ ভাবে থানার হাজত ঘর থেকে পালানোটাই প্রমাণ করে দিয়েছে অনুরাধা দেবীর হত্যাকারী তিনিই। আর কেউ নয়। খুঁজে তাকে আমি বের করবই, পালাবে কোথায় সে, সর্বত্র তার চেহারার একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে ওয়ারলেসে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। চললাম।

বের হয়ে গেলেন হেমন্ত সাহু ঘর থেকে একটু দ্রুত পদেই। আর একটু পরেই নীচে জীপের শব্দ পাওয়া গেল, বোঝা গেল হেমন্ত সাহু প্রস্থান করলেন।

মালতী দেবী এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। চুপচাপ বসে সব শুনছিলেন। এবার তিনি কিরীটীকে প্রশ্ন করলেন, সত্যিই আপনার ধারণা কিরীটীবাবু ও খুন করেনি ?

তাই। ক্ষিতীন্দ্রবাবু খুন করেননি।

তবে কে খুন করল মেয়েটিকে ?

দুটি হত্যাই একই সূত্রে বাঁধা, তিন বছর পূর্বে এই হোটেলেই জীমূতবাহনকে যে হত্যা করে ছিল, তিন বছর পরে সে-ই আবার ঘটনাচক্রে অনুরাধাকেও হত্যা করেছে। কেবল দুটি ঘটনার মধ্যে অলক্ষ্যে যে যোগসূত্রটা রয়ে গিয়েছে সেটা খুঁজে বের করতে পারলেই সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে।

কিরীটীর কথাগুলো শুনে মনে হল মালতী দেবীর মুখের পরে যেন একটা হতাশা ফুটে উঠেছে।

কিরীটী বললে, একটা কথা বলব মালতী দেবী মনে কিছু করবেন

না, আপনি বারবার আমাকে বলেছেন আপনার স্বামী একান্ত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, নিজের সুবিধা ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না, নিজেকে ছাড়া দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসেন না। নিঃসন্দেহে তার চরিত্রের ওটা একটা দিক, কিন্তু তার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে তার নির্বুদ্ধিতা। বুদ্ধি বলে কোন কিছুই তার মধ্যে নেই, একের নম্বরের নির্বোধ। তাই সর্বদা বড় বড় কথা বলে নিজের বিরাটত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে সকলের কাছে আরো হাস্যাস্পদ হয়ে যান, আর এ সব কিছুর জন্যে দায়ী আপনিই।

আমি?

তাই। যে বিরাটত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি বারবার চরম নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে এসেছেন, অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন, সে বিরাটত্ব তার পরে আরোপ করেছেন আপনিই,এবং কার্যক্ষেত্রে তার জীবনের ব্যর্থতার জন্য আপনিও বহুলাংশে দায়ী আর তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল তার প্রতি আপনার বিরাগ। আপনাদের পরস্পরের মধ্যে অশান্তির অংকুর। আপনি যদি সত্যিকারের স্ত্রীর মতো স্বামীর ঐ নির্বুদ্ধিতাকে শোধরাবার চেষ্টা করতেন, তবে হয়তো আপনাদের জীবনের আজকের ট্রাজেডিটাকে এড়াতে পারতেন।

মালতী দেবী মাথা নীচু করে বসে থাকেন।

যাক। অবশ্যম্ভাবীর গতি রোধ কেউ করতে পারে না।

কিন্তু লোকটা কোথায় গেল? ক্ষীণ স্বরে বললেন মালতী।

আমার মনে হয় এখনো তিনি পুরীতেই আছেন। আপনি কিন্তু হুট করে পুরী ছেড়ে চলে যাবেন না।

কিন্তু থাকব কোথায়?

এই হোটেলেই থাকুন, ম্যানেজারবাবুকে আমি বলে দেব।

পরের দিন প্রত্যুষে ক্ষিতীন্দ্রর মৃতদেহ পাওয়া গেল সমুদ্রের ধারে বালির উপরে, স্বর্গদ্বার থেকে মাইল খানেক দূরে, পৃষ্ঠদেশে তার গুলির চিহ্ন।

বোঝা গেল কেউ তাকে পশ্চাৎ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে। একদল বায়ুসেবী তরুণ মৃতদেহটা আবিষ্কার করে। এবং তারাই থানায় সংবাদ দেয়।

ক্ষিতীন্দ্রর মৃতদেহটার আইডেনটিফিকেশনের জন্য থানা থেকে ডাক এলো মালতী দেবীর।

কিরীটী থানাতেই ছিল। তারই পরামর্শানুযায়ী হেমন্ত সাহু মালতী দেবীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন হোটেল থেকে থানায়। অবিশ্যি মালতী তখনো জানেন না কেন তাকে থানায় যেতে বলা হয়েছে।

স্বভাবতই হেমন্ত সাহু বিশেষ চিন্তিত। সমস্ত ঘটনাটা যে ঐভাবে অকস্মাৎ মোড় নেবে হেমন্ত সাহুর কল্পনারও যেন বাইরে ছিল এবং উভয়ের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রর মৃত্যুকে নিয়েই আলোচনা চলছিল।

মৃতদেহর হাত পাঁচেক দূরে একটা ছোট কাঁটাঝোপের মধ্যে একটা ছোট জার্মান মেক পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। তার ছয়টি চেম্বারের একটি চেম্বারে গুলি নেই। পিস্তলটা খুঁজে বের করেছে একজন সেপাই।

পিস্তলটা সামনের টেবিলের ওপরেই ছিল। কিরীটী বলল, ঐ পিস্তলটির সাহায্যেই হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পারবেন মিঃ সাহু।

কেমন করে? বিরস বদনে প্রশ্ন করেন হেমন্ত সাহু।

ঐ পিস্তলে একটা নম্বর আছে—ঐ নম্বরের পিস্তলের লাইসেন্স যার নামে আছে, সেটা আলিপুরের লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্টে খুঁজলেই তো পেয়ে যাবেন।

যদি অন্য কোথায়ও লাইসেন্সটা করানো হয়ে থাকে?

কিরীটী বললে, না। সম্ভবত আলিপুরের কোর্টেই লাইসেন্স করানো হয়েছিল। আমার অনুমান, হত্যাকারী এবং ঐ পিস্তলের যিনি অধিকারী, ওনার—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, মালতী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আসুন মালতী দেবী। কিরীটী বললে।

আমাকে ডেকেছেন কেন? মালতী বললেন।

একটা মৃতদেহ সনাক্ত করবার জন্য।

মৃতদেহ! কার?

পাশের ঘরেই আছে, চলুন।

কিরীটী, হেমন্ত সাহু ও মালতী এসে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন।

মেঝের উপরে আগাগোড়া বস্ত্রাবৃত একটা মৃতদেহ পড়ে ছিল।

হেমন্ত সাহুই নীচু হয়ে মৃতদেহের মুখের উপর থেকে বস্ত্রখণ্ড টেনে নিতেই মালতীর কণ্ঠ হতে একটা অস্ফুট চীৎকার নির্গত হল।

কিরীটী শান্ত গলায় মালতীর দিকে তাকিয়ে বললে, এবারে আর মিথ্যা' নয়, সত্যি সত্যিই ক্ষিতীন্দ্রবাবু এবারে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে গিয়েছেন তিনি আর বেঁচে নেই, সত্যি সত্যিই মারা গেছেন।

মালতী পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে।

কি—আপনার স্বামী ক্ষিতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই তো ? হেমন্ত সাহু প্রশ্ন করলেন।

মালতী দেবী পূর্ববৎ পাথরের মতোই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঐ সময় একজন সেপাই এসে ঘরে প্রবেশ করল। স্যার—

কি খবর বৈজুপ্রসাদ, সেই ভদ্রলোক কোথায় ? আসেননি ?

তাকে হোটেলে পাওয়া গেল না।

সে কি ! হোটেলে নেই ?

না। দরজার লকটা বন্ধ ছিল, ডুপলিকেট চাবি দিয়ে লক খুলে দেখা গেল ঘরের মধ্যে কেউ নেই। ঘর খালি।

কিরীটী বললে, মিঃ সাহু, এখুনি সর্বত্র ওয়ারলেস মেসেজ পাঠান, চেহারার একটা ডেসক্রিপসন দিয়ে, কুইক, আর দেরি করবেন না। প্রত্যেক স্টেশনে, ভুবনেশ্বর এয়ার পোর্ট, সিকিউরিটি পুলিসকে।

হেমন্ত সাহু সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

আপনার মনের মধ্যে আজ আর কোন সন্দেহ নেই তো মিসেস চ্যাটার্জী, উনিই আপনার স্বামী ক্ষিতীন্দ্রবাবু ?

মালতী মাথা তুলে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করলেন।

এবার বলবেন কি, তিন বছর আগে যে মৃতদেহটা সনাক্ত করবার জন্য এখানে এসেছিলেন সে মৃতদেহটা যে আপনার স্বামীর নয় তা বুঝতে পেরেও কেন আপনার স্বামীর মৃতদেহ বলেই সনাক্ত করেছিলেন ?

মালতী দেবী নীরব।

একটা মিথ্যার ভিতর দিয়ে মুক্তি পেয়ে গেছেন বলেই বোধ হয়, তাই নয় কি ?

মালতী পূর্ববৎ নীরব।

সেদিন যদি মিথ্যাটাকে সত্য বলে না মেনে নিতেন তবে হয়তো আজ এমনি করে মৃত্যু বরণ করতে হত না ক্ষিতীন্দ্রবাবুকে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আপনিই আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী মালতী দেবী।

মালতী তখনো নীরব।

আপনি হয়তো ছেলে মেয়ে ও অন্যান্য সকলের দিক থেকে বেঁচে গেলেন, কিন্তু নিজের মনের কাছে জবাব দেবার মতো কিছুই তো রইল না। আপনার স্বামীর কোন দোষ ছিল না, তা আমি বলছি না। ছিল, তার অনেক দোষ ত্রুটিই ছিল, এবং সব কিছুর উপরে ছিল তার নির্বুদ্ধিতা, তবু বলব, আপনার কাছ থেকে একটু সহানুভূতি পেলে হয়তো আপনাদের দুজনারই জীবনটা এইভাবে নষ্ট হয়ে যেত না।

কিরীটী লক্ষ্য করল, মালতী দেবীর দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

হেমন্ত সাহু ঘরে ঢুকলেন।

সিগন্যাল মেসেজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম মিঃ রায়।

ঠিক আছে, চলুন, এবারে হোটেলের দিকে যাওয়া যাক। কিরীটী বললে।

আপনি কি মনে করেন মিঃ রায়, দত্ত মজুমদার হোটেলে ফিরে আসবেন?

কিরীটী মৃদু হাসল, বললে, তার জন্য ভাববেন না। পালিয়ে আর কোথায় যাবেন দত্ত মজুমদার, ধরা তাকে পড়তেই হবে। একবার ক্ষিতীন্দ্রবাবুর—মানে—আপনাদের মৃত চন্দ্রকান্তবাবুর স্যুটকেশটা ভালো করে উল্টেপাল্টে সবকিছু দেখতে হবে—

কিরীটী উঠে দাঁড়াল।

চলুন মালতী দেবী—

কোথায়?

হোটেলে।

কেন?

ডেডবডির ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আর ডেডবডি পাচ্ছেন না। পেতে পেতে হয়তো কাল পরশু—

আমি কিন্তু আজই ফিরে যেতে চাই, অবশ্যই আপনাদের অনুমতি পেলে—মালতী বললেন।

স্বামীর মৃতদেহের সৎকার না করেই চলে যাবেন ?

মালতী মাথা নীচু করলেন।

ভদ্রলোক সত্যিই হতভাগ্য, ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছেন, বাপের স্নেহ কোন দিন পাননি, আপনিও সারাটা জীবন বিমুখ হয়ে ছিলেন, অন্তত শেষ কাজটুকু করুন। পরলোক বলে যদি কিছু থাকে তো, হয়তো একটু শান্তি পাবেন—

॥ এগারো ॥

ক্ষিতীন্দ্রর স্যুটকেশের মধ্যেই একটা দীর্ঘ চিঠি পাওয়া গেল।

চিঠিটা দিন দশেক আগে তার স্ত্রী মালতী দেবীকেই লেখা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোস্ট করা হয়নি।

মালতী,

“আমি বেঁচে আছি। তিন বছর পূর্বে পুরীর হোটেলে যে মৃতদেহকে তুমি তোমার স্বামীর বলে সনাক্ত করেছিলে পুলিসের সামনে, সে আমি নই। আমার বৈমাত্রেয় ভাই জাগৃতবাহন চট্টোপাধ্যায়।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দেখ, আমরা দু'ভাই একই রকম দেখতে হয়েছিলাম। দুই মায়ের গর্ভে জন্মালেও। তুমি তো তাকে কোন দিন দেখইনি, আমিও ছোটবেলায় মাত্র একবার দেখেছিলাম তাকে।

দাদাকে তার মামারা আসতে দেননি কোন দিন বাবার কাছে, দাদাও আসেননি, মনের মধ্যে একটা ঘৃণা তার মামারা বাবার প্রতি সঞ্চার করেছিল।

আর তুমি হয়তো জানো না দাদার এক বোনও ছিল।

তার নাম মুকুল। দাদার থেকে ১৮ মাসের ছোট, তার জন্মের পরই আমাদের সেই মা মারা যান। সেই মার জীবনের শেষের একটা বছর বাবার কাছ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন, ছোট বোন মুকুল তখন মার গর্ভে। বাবাও জানতেন না কথাটা, মা তো তাকে কথাটা জানতেই দেননি।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় দুজনে পৃথক হয়ে যান। মনোমালিন্যের কারণ যত দূর জানা যায়, বাবার অত্যধিক মদ্যপানের অভ্যাস !

আমি তোমাকে অতীতের সব কথা জানাচ্ছি, কারণ তাহলেই তুমি

বুঝতে পারবে, যেন তিন বছর পূর্বে জীবিত থেকেও আমাকে মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদকে মেনে নিতে হয়েছিল। কেন এই দীর্ঘ তিন বছর আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে আমাকে।

আমি আবার সংসারে তোমাদের সকলের মাঝখানে ফিরে যেতে চাই মালতী। নতুন করে আবার তোমাদের নিয়ে বাঁচতে চাই। তাই কিছুই গোপন করব না, সব বলব আজ অকপটে।

সলিল দত্ত মজুমদার নামে এক ভদ্রলোককে মুকুল ভালোবাসে, এবং তাদের বিয়েও হয় মুকুলের সঙ্গে সলিলের বিবাহে অবিশ্যি দাদার পূর্ণ মত ও সহযোগিতা ছিল। দাদা আর সলিল উভয়ে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু! সেই সূত্রেই মুকুলের সঙ্গে সলিলের আলাপ।

দাদা আমারই মতো ম্যাট্রিক পাস করে আই এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। মামারা তখন তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, কারণ ঐ বয়সেই দাদা স্মাগলারদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল।

আর ওই স্মাগলিয়ের সূত্রেই সলিল দত্ত মজুমদারের সঙ্গে দাদার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। সলিল দত্ত মজুমদার বিলাত ফেরত ও একজন বড় অফিসার হওয়া সত্ত্বেও স্মাগলিংয়ে জড়িত ছিল।

লোকটার টাকার নেশা ছিল প্রচণ্ড। মুখোশ ছিল তার বড় একটা কোম্পানিতে বড় একটা পোস্টের চাকরি। তার অন্ধকারের জীবনটা বোধ করি ঐ চাকরি ও পজিশনের দরুনই সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল।

বিবাহের পর মুকুল যখন তার ঘরে এলো সে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এই সবকিছু না জেনেই এসেছিল।

আগেই বলেছি মুকুল ছিল সত্যিই সুন্দরী। দলের একজন হোমরা চোমরা ছিল ইসমাইল খান, লোকটা জাতিতে পাঠান, একদিন মুকুলকে দেখে সে পাগল হয়ে উঠল।

সোজাসুজিই সে সলিলকে কথাটা বললে! সলিল দত্ত মজুমদারকে ইসমাইলের প্রস্তাবে রাজী হতে হল, কারণ তা ছাড়া তার উপায় ছিল না। এক রাত্রে ঘুমন্ত মুকুলের শয়ন কক্ষে ইসমাইলকে ঢুকিয়ে দিল সলিল।

কিন্তু ইসমাইল খান জানত না মুকুল কি প্রকৃতির মেয়ে, সে ধর্ষিতা হল বটে কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত মুকুলের হাতেই প্রাণ দিতে হল পিস্তলের গুলিতে।

তারপর সেই পিস্তলের সাহায্যেই মুকুল আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। অবশেষে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। সব ব্যাপারটা ঘটে সলিল দত্ত মজুমদারের দেওঘরের বাড়িতে।

রাতারাতি ইসমাইলের মৃতদেহটা সলিল দত্ত মজুমদার পাচার করে দিল। আর মুকুলকে পাঠিয়ে দিল রাঁচীর পাগলা গারদে। সে এখন বদ্ধ উন্মাদ।

কোন প্রমাণই ছিল না। সলিল দত্ত মজুমদার রটিয়ে দিল মুকুল নিরুদ্দিষ্টা।

দাদা কিন্তু খুঁজে বেড়াতে লাগল মুকুলকে।

ঐ সময় অনুরাধা এলো আকস্মিক ভাবে সলিল দত্ত মজুমদারের জীবনে। অনুরাধা একজনকে ভালোবাসত, কিন্তু সলিল দত্তর চাতুরিতে কিছুটা এবং কিছুটা একটা সাচ্ছল্যের জীবনের জন্য সে ভুলে গেল সব কিছু।

দাদা বরাবরই সলিল দত্তর উপরে নজর রেখেছিল, হঠাৎ সে সংবাদ পেল সলিল দত্ত পুরীতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দাদা স্থির করে সে পুরীতেই যাবে এবং তার সঙ্গে শেষ বারের মতো দেখা করবে।

মুকুলের ব্যাপারে একটা হেস্ত-নেস্ত করবে। কিন্তু একা সম্ভব নয় তাই সে জামসেদপুরে গিয়েছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি সে রাত্রে বঙ্কিমের গৃহে তাকে চিনেও না চেনবার ভান করলাম। দাদা সেখান থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উঠে পড়লাম। আমি বুঝেছিলাম আমার সঙ্গে দেখা না করে ও কথা না বলে দাদা যাবে না। ঠিক তাই হল, মাঝপথেই তার সঙ্গে আমার দেখা হল।

ক্ষিতী—

কে? দাঁড়ালাম আমি। থমথমে অন্ধকার রাত পথে জনমনিষ্যি নেই।

দাঁড়া। আমি জীমূত—

কি চাই? কেন এসেছ? আমি শুধালাম।

মুকুলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

কোথায় সে? বেঁচে আছে তাহলে?

হ্যাঁ, বদ্ধ উন্মাদ। আছে রাঁচীর পাগলা গারদে।

কি করে জানলে?

ইসমাইল খানের ব্যাপারটা আমাকে বলে গেল জীমূতবাহন।

শুধালাম, কি করে এ সব কথা জানলে ?

দলের লোকেদের কাছ থেকেই জেনেছি। শোন যে জন্য এসেছি, আজ শুক্রবার, সামনের বুধবার তুই চলে আয় পুরী। আমিও ঐদিনই পুরী পৌঁছাব। সলিল পুরীতে যাচ্ছে, মুখোমুখি একটা মুকাবিলা করতে হবে ঐ শয়তানটার সঙ্গে। আমি একা থাকলে হবে না তুইও আসবি।

আমি রাজী হয়ে গেলাম। আর তিন দিন বাদেই পুরী রওনা হলাম।

হোটেলে পাশাপাশি ঘরে আমরা ছিলাম। আমি ও দাদা ১৭নং ঘরে, আর ১৮নং ঘরে সলিল দত্ত মজুমদার। যে রাত্রে পুরীতে পৌঁছাই সেই রাত্রেই ঘটনাটা ঘটল।

সলিলের হাতে ঘুমের মধ্যে জীমূতবাহন নিহত হল।

পিছন থেকে তার গলায় ধারালো অস্ত্র চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়।

সে রাত্রে খুব বেশী মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, দুই ভাইয়ে মিলে দু'বোতল প্রায় শেষ করেছিলাম। তখনো জানি না, সলিল পাশের ঘরেই আছে। আমি জানতাম সে তখনো হোটেলে এসে পৌঁছায়নি।

শেষ রাত্রের দিকে ঘুমটা ভেঙে যেতে দেখি ঐ বীভৎস দৃশ্য। দাদা নিহত।

ভয়ে পালালাম আমি। পাছে আমাকেই পুলিস খুনী বলে ধরে।

দাদার কথা শুনে পুরীতে এসে ভুল করেছিলাম, আবারও ভুল করলাম পালিয়ে গিয়ে, সেই শুরু হল আমার অজ্ঞাতবাস। এই তিনটে বছর যে আমার কি ভাবে কেটেছে। বেঁচেও মরে আছি আমি।

শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারের একটা হেস্ত নেস্ত—

ব্যাস ঐখানেই চিঠি শেষ। চিঠিটা ঐ পর্যন্তই লেখা। আর লেখা হয়নি।

চিঠিটা হাতে করে কিরীটী বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর একসময় চিঠিটা পকেটে নিয়ে বের হয়ে এলো। রাত তখন প্রায় সোয়া নয়টা।

১৭নং ঘরে মালতী ছিলেন। কিরীটী তার ঘরেই থাকবার ব্যবস্থা করেছিল মালতীর এবং নিজে নিচের একটা ঘরে সিফ্‌ট করেছিল।

দরজা বন্ধ—দরজার গায়ে টোকা দিতেই সাড়া এলো।

কে?

মালতী দেবী, আমি কিরীটী রায়, দরজাটা খুলুন।

মালতী দরজা খুলে দিলেন।

ঘরে আসতে পারি?

আসুন। ঘরে বসতে দিলেন মালতী।

এই চিঠিটা পড়ে দেখুন।

কার চিঠি? কিসের চিঠি? মালতী শুধালেন।

চিঠিটা আপনার স্বামীর লেখা আর আপনাকেই লেখা—চিঠিটা শেষ করতে পারেননি তাই হয়তো পোস্ট করেননি।

কোথায় পেলেন এটা—

আপনার স্বামীর স্যুটকেশে। পড়ে দেখুন আপনার সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর এর মধ্যে পাবেন।

মালতী হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন।

মালতী কিরীটীর হাত থেকে চিঠিটা নিলেন বটে কিন্তু মনে হল তার জন্য যেন মনের মধ্যে কোন তাগিদ ছিল না। কোন ইচ্ছা বা আগ্রহও না।

কিরীটী আর দাঁড়াল না।

কিরীটী স্থির করেছিল পরের দিনই সে চলে যাবে। মালতী দেবীর কাজটুকু যখন শেষ হয়ে গিয়েছে পুরীতে থাকা তো আর প্রয়োজন নেই।

কেবল একটা কাজ বাকী। হোটেলের বোর্ডারদের গতিবিধির উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল হেমন্ত সাহুকে বলে তার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া। হোটেল থেকে এখনো কেউ যাননি।

রাত্রে আহারাদির পর নিজের ঘরে বসে বসে কিরীটী সেই কথাটাই ভাবছিল। রাত তখন গোটা দশেক হবে।

থানা থেকে হেমন্ত সাহুর লোক এলো তার একটা চিঠি নিয়ে।

সাব্, হুজুর আপনাকে একবার থানায় যেতে বলেছেন?

কিরীটী আর দেরী করে না। উঠে পড়ল। লোকটা একটা সাইকেল রিক্‌শা এনেছিল। উঠে বসল কিরীটী সাইকেল রিক্‌শায়।

শ্রাবণের আকাশটা আজ পরিষ্কার কোথাও কোন মেঘের চিহ্নমাত্রও নেই। ঝক ঝক করছে আকাশ ভরা একরাশ তারা।

সমুদ্রের একটানা গর্জন, বাতাস হু হু করে ভেসে আসছে। কালো কালো ঢেউগুলো শুভ্র ফেনার মুকুট মাথায় বালুবেলার ওপরে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

থানার অফিস ঘরেই হেমন্ত সাহু বসে ছিলেন, আর তার সামনে মুখোমুখি বসে ছিল যে লোকটা তাকে দেখে কিরীটীর ওষ্ঠ প্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা জেগে ওঠে। সলিল দত্ত মজুমদার।

এই যে আসুন মিঃ রায়, হেমন্ত সাহু বললেন।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আমি জানতে চাই দারোগাবাবু—সলিল দত্ত মজুমদার বললে,ভুবনেশ্বরের হোটেল থেকে আমাকে এখানে এভাবে ধরে আনা হল কেন?

জবাব দিল কিরীটীই, দারোগাবাবুর কঠিন নির্দেশ সত্ত্বেও আপনি গতকাল কাউকে কিছু না বলে হোটেল থেকে পালিয়ে ছিলেন কেন?

পালিয়ে ছিলাম! কে আপনাকে বললে?

যেভাবে চলে গিয়েছিলেন সেটা পালানো ছাড়া আর কি।

আমি কারো হুকুমের চাকর নই।

কিন্তু আইন যে কোন সময় আপনার গতি রুখতে পারে।

অন্যায় আইন।

ন্যায় অন্যায়ের বিচারটা পরে হবে, আপনি পালিয়েছিলেন কেন তাই বলুন।

আবারও বলছি আমি পালাইনি। চলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আপনার বোঝা উচিত ছিল ঐভাবে চলে গেলেই আইনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। শুনুন, আপনাকে এ্যারেস্ট করে আনা হয়েছে।

এ্যারেস্ট! শুনতে পারি কি—কি জন্য?

আপনার বিরুদ্ধে তিন তিনটি হত্যার অভিযোগ।

কি পাগলের মতো আবোল তাবোল বকছেন!

তিন বছর আগে পুরীর হোটেলে এক রাত্রে জীমূতবাহন রায়কে হত্যা করেন আপনি, এবং তিন বছর পরে আরো তুজনকে পর পর হত্যা করেন, প্রথমে অনুরাধা দেবী ও পরে ক্ষিতীন্দ্রবাবুকে—

মশাই গাঁজা টাজা সেবন করেন নাকি?

আপনি বলতে চান আপনি ঐ হত্যাগুলো করেননি ?

নিশ্চয়ই না—সলিল দত্ত মজুমদারের কণ্ঠস্বরে এতটুকু কোন দ্বিধা বা সংকোচ মাত্রও নেই, শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন—তা ঐ অদ্ভুত আজগুবী চিন্তাটা আপনাদের উর্বর মস্তিষ্কে কি করে এবং কেনই বা এলো জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই—কিরীটীও অনুরূপ শান্ত গলায় জবাব দিল, জানতে পারেন বৈকি।

বক্র হাসি দেখা গেল সলিল দত্ত মজুমদারের ওষ্ঠ প্রান্তে, আমিই যে তাদের হত্যা করেছি তার কোন প্রমাণ কি আপনাদের কাছে আছে ?

প্রমাণ ছাড়া কি দারোগাবাবু আপনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন ?

তাই নাকি ! তা কি প্রমাণ আছে আপনাদের হাতে বলুন তো।

মোটামুটি যে চারটি প্রমাণ—

চারটি প্রমাণ।

হ্যাঁ—কিরীটী শান্ত গলায় বললে, যে রাত্রে অনুরাধা দেবীকে হত্যা করা হয়—

সে রাত্রে তো হোটেলের ত্রিসীমানায়ও আমি ছিলাম না। আমি ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলাম, ম্যানেজার ভবেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতেন—

সে এ্যালিবাইটা আপনার ধোপে টিকবে না, কারণ সে রাত্রে আপনি আদৌ ভুবনেশ্বরে যাননি। আর জগন্নাথ পাণ্ডাই সে সাক্ষ্য দেবে। মনে হল আপনি যেন একটু চমকে উঠলেন মিঃ দত্ত মজুমদার, আপনার একটা কথা জানা প্রয়োজন, জগন্নাথ পাণ্ডা আপাতত নিরাপদ জায়গাতেই অবস্থান করছে, আদালতেই যা বলবার সে বলবে, তারপর ২নং প্রমাণ আপনার ব্যবহৃত বিলেত থেকে আনা রেইন-কোট, মানে ওয়াটার প্রুফটা—যেটা আপনি সে রাত্রে জল ঝড়ের মধ্যে ব্যবহার করেছিলেন তারপর আপনার কাজকর্ম চুকে যাবার পর হোটেল থেকে বের হয়ে গিয়ে সমুদ্রতীরে একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। সেটার স্থানে স্থানে এখনো যথেষ্ট রক্ত চিহ্ন আছে, যে রক্ত কেমিক্যাল এ্যানালিসিসে প্রমাণ করবে অনুরাধা দেবীরই রক্ত—সেটা এখন সে রাত্রের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রমাণ হিসাবে থানায়ই আছে—

শেষের কথাগুলো শুনতে শুনতে কিরীটীর মনে হল যেন সলিল দত্ত মজুমদারের মুখের চেহারাটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে।

এবার আসা যাক তৃতীয় প্রমাণে—আপনার পিস্তলটা, যেটার

সাহায্যে তৃতীয় দিন রাত্রে আপনি আপনার হতভাগ্য নির্বোধ সম্বন্ধী ক্ষিতীন্দ্রবাবুকে হত্যা করেছিলেন, সেই পিস্তলটা আজ শেষ রাত্রে একজন জেলে সমুদ্রের কাছে কুড়িয়ে পেয়েছে—ঐ পিস্তলের নম্বরটাই প্রমাণ দেবে ঐ পিস্তলের লাইসেন্স হোল্ডার কে ?

কিরীটীর মনে হল সলিল দত্ত মজুমদারের থুতনীটা যেন ঝুলে পড়েছে।

বলছিলাম না চারটি প্রমাণ আপাতত আমাদের হাতে আছে, চতুর্থ প্রমাণ হল ক্ষিতীন্দ্রবাবুর অসামপ্ত একখানা চিঠি। সারাটা জীবন ধরে নির্বুদ্ধিতা করে করে বোধ হয় মৃত্যুর আগে ঐ একটিমাত্র বুদ্ধির কাজ করতে উদ্যত হয়েছিলেন ক্ষিতীন্দ্রবাবু তার স্ত্রী মালতী দেবীকে ঐ চিঠিটা লিখতে বসে—এখন বুঝতে পারছেন দত্ত মজুমদার সাহেব, গরল আর পাপ কখনো চাপা থাকে না, তিন বছর আগেকার চাপা পাপও আজ এতদিন পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সলিল দত্ত মজুমদার একেবারে চুপ। কেমন যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কিরীটীর মুখের দিকে।

সেই দিনই হয়তো আপনি ধরা পড়তেন যদি না নির্বোধ ক্ষিতীন্দ্রবাবু প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকতেন। অবিশ্যি আপনাকে পরোক্ষভাবে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর অতি চালাক ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী মালতী দেবীও কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। তার নিজের স্বামী বলে জীমূতবাহনের দেহটা identify করে। যাক গে সে কথা, সে রাত্রে জীমূতবাহনেব মুখ বন্ধ করবার জন্য তাকে কি ভাবে হত্যা করেছিলেন তা আমরা জানতে চাই না, জানবার আর প্রয়োজনও নেই, যে দুটি হত্যার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাই যথেষ্ট। কিন্তু আমার প্রশ্ন : আপনি তো ভালো করেই জানতেন অনুরাধা দেবীকে ডঃ সেন ভালোবাসেন। তা জানা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের কাছ থেকে অনুরাধাকে অমন করে ছিনিয়ে এনেছিলেন কেন ?

হঠাৎ ঐ সময় সলিল দত্ত মজুমদার হাঃ-হাঃ-হাঃ করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

মিঃ দত্ত মজুমদার—কিরীটী ডাকল।

কিন্তু দত্ত মজুমদার তখনো হাসছে হাঃ-হাঃ-হাঃ ! থানার ঘরের দেওয়ালগুলোতে যেন সেই হাসির শব্দ প্রতিহত হয়ে ঠিকরে ঠিকরে যেতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books